فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّينَ، ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ، ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ

অতএব, দুর্ভোগ সেইসব নামাজীর যাহারা তাহাদের নামাজ সম্বন্ধেবে-খবর; যাহারা তাহা লোক-দেখানোর জন্য করে (অর্থাৎ রিয়া করে)।

لا يقبل الله عز و جل عملا فيه مثقال ذرة من ريا

"আল্লাহ পাক এমন কোন আমল কবুল করেন না, যাহাতে বিন্দু পরিমাণও রিয়া আছে।"

রিয়া

(লোকদেখানো ইবাদত)

মূল

ইমাম গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদ

মোহাম্মদ খালেদ

প্রধান শিক্ষক, মদীনাতুল উলুম মাদ্রাসা

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

সূচীপত্র

বিষয় ঃ **পৃষ্ঠা ঃ**

প্রথম অধ্যায়

বিষয় ঃ **পৃষ্ঠা ঃ**

দ্বিতীয় অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده و نصلى على رسوله الكريم *

প্রথম অধ্যায়

খ্যাতি ও রিয়ার নিন্দা

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ "আমার উম্মতের জন্য আমি যেই বিষয়টির সর্বাধিক আশংকা করিতেছি, তাহা হইল রিয়া ও গোপন খাহেশ। অন্ধকার রাতে কঠিন পাথরের উপর কাল পিপীলিকা চলাচল করিলে যেমন টের পাওয়া যায় না, তদ্রূপ ইহাও অনুভব করা যায় না।"

এই কারণেই মানুষের চরম শত্রু এই রিয়া ও গোপন খাহেশের উপস্থিতি সম্পর্কে বড় বড় আলেমগণও অনুভব করিতে পারেন না। সুতরাং যাহারা আলেম নহে, এমন মূর্খ আবেদ ও মোত্তাকীদের পক্ষে তো উহা সম্পর্কে ওয়াকেফ হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। এই রিয়া হইল মানুষের জন্য চরম ক্ষতিকারক এক গোপন প্রতারণা। এই ক্ষতিতে আলেম, আবেদ, সাধক ও পরকালের পথিকগণ লিপ্ত। কারণ এই শ্রেণীর লোকেরা রিয়াজত-মোজাহাদা ও সাধনার মাধ্যমে নিজেদের নফসকে পরাভূত করতঃ উহাকে যাবতীয় আত্মিক ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদতের প্রতি নিবিষ্ট করিয়া রাখেন। এমতাবস্থায় তাহাদের আত্মা বাহ্যিক অঙ্গ-অবয়ব দ্বারা কোনরূপ গোনাহ করিতে পারে না। তো রিয়াজত-মোজাহাদা ও আত্মার উপর ক্রমাগত যাতনার পর উহা হইতে মুক্তির একমাত্র যেই পথটি তাহাদের সম্মুখে খোলা থাকে তাহা হইল– নিজেদের নেক আমলসমূহ প্রকাশ করিয়া সাধারণ মানুষের ভক্তি–শ্রদ্ধা আকর্ষণ। সাধারণ মানুষের এই ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের ফলে আত্মার উপর রিয়াজত-মোজাহাদার যাতনা লাঘব হইয়া তদস্থলে এক অনাবিল আত্মসুখ অনুভূত হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের এবাদত ও নেক আমলসমূহ প্রকাশ করিয়া বেড়ায় এবং এইরূপ কামনা করে যেন মানুষ আমাদের রিয়াজত ও এবাদত সম্পর্কে অবগত হয়। অর্থাৎ নিজেদের এবাদত

সম্পর্কে আল্লাহর অবগতিকে তাহারা যথেষ্ট মনে করে না। এই কারণেই মানুষের প্রশংসা লাভ করিয়া তাহারা তুষ্ট হয় আর আল্লাহর প্রশংসা করিয়া তাহাদের তৃপ্তি হয় না। তাহারা এই কথা ভাল করিয়া জানে যে, আমরা যদি এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত হইয়া যাবতীয় কামনা-বাসনা বর্জনপূর্বক সন্দেহযুক্ত বিষয় হইতেও পরহেজ করিয়া চলি, তবে মানুষ আমাদের বুজুর্গীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিবে এবং লোক সমাজে আমাদের ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি পাইবে। লোকেরা আসিয়া আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করিবে এবং আমাদের দর্শন লাভকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় মনে করিবে। দোয়া ও ফয়েজ লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের শরণাপন্ন হইবে এবং কোন বিষয়ে আমরা যাহা সিদ্ধান্ত দিব তাহা মানিয়া লইবে। দেখিবামাত্র আমাদের খেদমত করিবে। মজলিসে সম্মানজনক আসন দিবে, বিনয়-বিনম্র আচরণ করিবে এবং আমাদের চাহিদার প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে।

অর্থাৎ এই সব অবস্থায় তাহারা এমনই আত্মসুখ লাভ করে যে, উহার ফলে গোনাহ ও পাপাচার ত্যাগ করা তাহাদের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর হয় না এবং পাবন্দির সহিত এবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকা খুব সহজ হইয়া যায়। কেননা, এই ক্ষেত্রে তাহাদের আত্মা যেই সুখ লাভ করিতেছে তাহা সমস্ত সুখের সার নির্যাস বটে। এমতাবস্থায় তাহারা মনে করে, আমাদের জীবন আল্লাহর জন্য নিবেদিত এবং আমরা অনুক্ষণ আল্লাহর এবাদত করিতেছি। অথচ তাহারা এমন গোপন খাহেশাত ও কামনা-বাসনার জালে আবদ্ধ যে, উহা কেবল প্রকৃত গুণীজনই উপলব্ধি করিতে পারেন। তাহারা মনে করে, আমরা এখলাসের সহিত আল্লাহর আনুগত্য করিতেছি এবং আল্লাহ পাক যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা বর্জন করিয়া চলিতেছি। কিন্তু দুষ্ট নফস তাহাদের অন্তরে এমন গোপন খাহেশ স্থাপন করিয়া দেয় যেন উহার ফলে তাহারা নিজেদের এবাদত সমূহ মানুষের নিকট প্রকাশ করিয়া তাহাদের মিথ্যা প্রশংসায় পরিতুষ্ট হয়। অতঃপর এই গোপন খাহেশের কারণেই তাহাদের এবাদতের ছাওয়াব বিনষ্ট হয় এবং তাহারা নিজেদেরকে নেক আমলের ফজিলত হইতে বঞ্চিত করে। এই পর্যায়ে তাহাদের নাম মোনাফেকদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়– অথচ তাহারা নিজেদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা মনে করিয়া থাকে। ইহা নফসের এক সূক্ষ্ম প্রতারণা। আল্লাহর নৈকট্যশীল ছিদ্দীকগণের পক্ষেই এই প্রতারণার জাল হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

উপরের আলোচনা দ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, রিয়া হইল, মানবাত্মার এক সর্বনাশ ব্যাধি এবং শয়তানের মস্ত বড় জাল। নিম্নে পর্যায় ক্রমে এই রিয়ার পরিচয়, উহার উৎপত্তি, উপকরণ, স্তর, প্রকার ভেদ এবং উহা হইতে আত্মরক্ষার উপায় বর্ণনা করা হইবে। তবে এই আলোচনার সূচনাপর্বে

আমরা 'জাহ্' তথা সুনাম-সুখ্যাতির উপর আলোকপাত করিতেছি।

সুনাম ও সুখ্যাতিকে বলা হয় জাহ্। এই সুনাম নিন্দনীয় ও ক্ষতিকর এবং অখ্যাত থাকা নিরাপদ ও কল্যাণকর। অবশ্য কোনরূপ চেষ্টা-তদ্বির ও চাহিদা ছাড়াই যদি আল্লাহ পাক কোন ব্যক্তি বিশেষকে দ্বীন প্রচারের স্বার্থে সুখ্যাতি দান করেন, তবে এইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত সুখ্যাতি ক্ষতিকর নহে।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

حب المرء من الشر إلا من عصمه الله ان يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه

অর্থঃ "মানুষের অনিষ্টের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, কাহারো দ্বীন বা দুনিয়া বিষয়ে মানুষ তাহার দিকে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিবে। তবে আল্লাহ পাক যাহাকে হেফাজত করেন তাহার কথা ভিন্ন।" (বায়হাকী)

সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) অনুরূপ এক বর্ণনা উল্লেখ করিয়া বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

يحسب المرء من الشر إلا من عصمه الله من السوء ان يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه . ان الله لا ينظر الى صوركم و لكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم

অর্থঃ মানুষের অনিষ্টের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, মানুষ কাহারো দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে তাহার দিকে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিবে। তবে আল্লাহ পাক যাহাকে রক্ষা করেন তাহার কথা আলাদা। আল্লাহ তোমাদের ছুরত দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর এবং তোমাদের আমল দেখেন। (তাবারানী আওসাত)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু সাঈদ! আপনি যখন পথ অতিক্রম করেন, তখন তো লোকেরা আপনার দিকেও ইশারা করে। তিনি বলিলেন, বর্ণিত হাদীসে এই ইশারার কথা বলা হয় নাই; বরং উহার অর্থ হইল, দ্বীনের মধ্যে কোন বেদআত জারী করার কারণে যদি মানুষ তাহার দিকে ইশারা করে কিংবা পার্থিব বিষয়ে কোন পাপাচার আবিষ্কার করার কারণে যদি সে ইশারার পাত্রে পরিণত হয়, তবে তাহা ক্ষতিকর।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হাদীষটির এমন ব্যাখ্যা দিলেন যে, অতঃপর

এই বিষয়ে আর কাহারো কোন প্রশ্ন রহিল না।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ব্যয় কর কিন্তু নিজের দানশীলতার কথা প্রচার করিও না। নিজের ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে তুলিয়া ধরিও না যে, উহার ফলে মানুষের নিকট তোমার সম্পর্কে জানাজানি হয় এবং তোমাকে লইয়া লোকেরা আলোচনা করে। তুমি বরং নীরবে-নিভৃতে বসবাস কর যেন গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার। ধার্মিক লোকদিগকে সন্তুষ্ট কর এবং পাপী লোকদিগকে অসন্তুষ্ট কর।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতি পছন্দ করে, সে যেন আল্লাহকে সত্যায়ন করে না। হযরত আইউব সাখতিয়াবী (রহঃ) বলেন, যেই পর্যন্ত তুমি ইহা পছন্দ না করিবে যে, মানুষ যেন তোমার ঠিকানা ও পরিচয় জানিতে না পারে; সেই পর্যন্ত তুমি যেন আল্লাহর সত্যায়ন করিলে না।

হযরত খালেদ ইবনে মে'দানের মজলিসে যখন অধিক লোক সমাগম হইত, তখন তিনি খ্যাতির ভয়ে মজলিস হইতে উঠিয়া যাইতেন। হযরত আবুল আলিয়ার নিকট তিন জনের বেশী লোক জড়ো হইলে তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিতেন।

একবার হযরত তালহা দেখিতে পাইলেন, প্রায় দশজন লোক তাহার পিছনে পিছনে আসিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন, ইহারা লালসার মক্ষিকা এবং দোজখের ফড়িং। হযরত সোলাইমান ইবনে হানজালা বলেন, একবার আমরা হযরত উবাই ইবনে কাবের পিছনে পিছনে চলিতেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) এই দৃশ্য দেখিয়া চাবুক হাতে আগাইয়া আসিলেন। হযরত উবাই আরজ করিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি কি করিতেছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি যেইভাবে আড়ম্বরের সহিত চলিতেছ, ইহা তোমার অনুসারীদের জন্য জিল্লতী এবং তোমার জন্য ফেৎনা।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ঘর হইতে বাহির হইয়া কোথাও রওনা হইলেন। কতক লোক তাহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা আমার পিছনে আসিতেছ কেন? আল্লাহর কসম! তোমরা যদি জানিতে পারিতে যে, আমি কি কারণে আমার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাখি, তবে কেহই আমার পিছনে আসিতে না। তিনি আরো বলেন, আহাম্মক লোকেরাই নিজেদের পিছনে জুতার আওয়াজ শুনিয়া গর্বিত হয়। একবার কতক লোক হযরত হাসান (রাঃ)-কে অনুসরণ করিতেছিল। তিনি পিছনের দিকে তাকাইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আমার সঙ্গে যদি তোমাদের কোন কাজ থাকে, তবে আসিতে পার। অন্যথায় ইহা অসম্ভব নহে যে, এইভাবে পিছনে পিছনে চলার ফলে মোমেনের অন্তরে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

এক ব্যক্তি প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত মুহাইরিজের সঙ্গে সফরে রওনা হইল। এক পর্যায়ে তাহার সঙ্গ হইতে পৃথক হওয়ার সময় সে হযরত মুহাইরিজের নিকট আরজ করিল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। হযরত মুহাইরিজ বলিলেন, এমনভাবে জীবনযাপন করিবে যেন তুমি মানুষকে চিনিবে বটে কিন্তু মানুষ যেন তোমাকে চিনিতে না পারে। পথ চলার সময় কাহাকেও সঙ্গে রাখিবে না। তুমি মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে কিন্তু মানুষ যেন তোমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা না করে।

হযরত আইউব (রহঃ) একবার সফরে বাহির হইলেন। এই সময় একদল মানুষ তাহার পিছনে পিছনে চলিতেছিল। এক পর্যায়ে তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি যদি এই কথা না জানিতাম যে, আল্লাহ তায়ালা আমার দিলের অবস্থা সম্পর্কে অবগত এবং আমার পিছনে পিছনে তোমাদের এইভাবের আগমন আমি অপছন্দ করি, তবে আমি আল্লাহর আজাবের আশংকা করিতাম। মা'মার বলেন, একবার আমি হযরত আইউব (রহঃ)-কে তাহার লম্বা জামা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আগের যুগে লম্বা জামা পরিলে সুখ্যাতি অর্জন হইত বটে, কিন্তু বর্তমানে খাট জামা পরিলেই বুজুর্গী জাহির হইতে থাকে (এই কারণেই আমি লম্বা জামা ব্যবহার করি)।

জনৈক বুজুর্গ বলেন, একবার আমি আবু কেলাবের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বেশ মূল্যবান পোশাক পরিয়া সেখানে আগমন করিল। আবু কেলাব সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত লোকজনকে বলিলেন, তোমরা এই বাকশক্তিসম্পন্ন গাধা হইতে বাঁচিয়া থাক। (অর্থাৎ- বাহ্যিক চাক্‌চিক্যের মাধ্যমে তোমরা সুনাম ও খ্যতি অন্বেষণ করিও না।) হযরত ছাওরী (রহঃ) বলেন, আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ দুইটি খ্যাতি হইতে বাঁচিয়া থাকিতেন। একটি হইল উৎকৃষ্ট পোশাকের খ্যাতি এবং অপরটি পুরাতন ও ছিন্ন পোশাকের খ্যাতি। কেননা, এই দুইটি পোশাকের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি সমানভাবে আকৃষ্ট হয়।

এক ব্যক্তি হযরত বিশর ইবনে হারিসের নিকট কিছু নসীহত প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, নিজেকে গোপন রাখ এবং হালাল খাদ্য গ্রহণ কর। শোয়াব (রহঃ) এই কথা বলিয়া ক্রন্দন করিতেন যে, হায়! জামে' মসজিদের লোকেরা পর্যন্ত আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। হযরত বিশর বলেন, আমি এমন কোন ব্যক্তির কথা জানি না, যেই ব্যক্তি সুখ্যাতি পছন্দ করে অথচ তাহার দ্বীন বরবাদ হয় নাই এবং মানুষের নিকট সে অপমানিত হয় নাই। তিনি আরো বলেন, যেই ব্যক্তি খ্যাতি কামনা করে সে পরকালের স্বাদ পায় না।

অখ্যাত থাকার ফজিলত

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

رب اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لا بره منهم البراء بن مالك

অর্থঃ এলোমেলো কেশধারী, ধূলিধূসরিত, দুই চাদরওয়ালা এমন অনেক লোক আছে যাহাদের প্রতি মানুষ কোন গুরুত্ব দেয় না। অথচ তাহারা যদি আল্লাহর নামে শপথ করিয়া কোন কথা বলিয়া ফেলে তবে আল্লাহ পাক তাহা অবশ্যই বাস্তবায়িত করেন– বারা ইবনে মালেক এমন লোকদের মধ্যে গণ্য। (মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

رب ذي طمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لابره لو قال : اللهم انى اسئلك الجنة لاعطاه الجنة و لم يعطه من الدنيا شيئا

অর্থঃ দুই চাদরওয়ালা এমন অনেক লোক আছে যাহাদের প্রতি মানুষ কোন ভ্রূক্ষেপ করে না। অথচ তাহারা যদি কোন বিষয়ে আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বসে, তবে আল্লাহ পাক তাহা পূরণ করেন। তাহারা যদি এইরূপ দোয়া করে– "আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করিতেছি" তবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই জান্নাত দান করিবেন। যদিও দুনিয়াতে তাহাদিগকে কিছুই দেওয়া হয় না।" (ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

الا ادلكم على اهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو اقسم على الله لابره و اهل النار كل مستكبر جواظ

অর্থঃ আমি কি তোমাদিগকে বেহেশতবাসীদের পরিচয় বলিব না? জান্নাতবাসী হইল এমন প্রত্যেক দুর্বল ও কমজোর মানুষ যে, তাহারা যদি আল্লাহর নামে কোন শপথ করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাহাদের শপথ পূরণ করিবেন। আর জাহান্নামবাসী হইল প্রত্যেক অহংকারী ও গোঁয়ার লোক। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ان اهل الجنة كل اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له الذين اذا استأذنوا على الامراء لم يؤذن لهم و اذا خطبوا النساء لم ينكحوا و اذا قالوا لم ينصت لقولهم حوائج احدهم تتخلخل في صدره لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم .

অর্থঃ তাহারাই জান্নাতবাসী, যাহাদের কেশ এলোমেলো, ধূলিধুসরিত এবং পোশাক মাত্র দুইটি চাদর। তাহাদের প্রতি কেহ ভ্রূক্ষেপ করে না, শাসকদের নিকট যাইতে চাইলে উহার অনুমতি দেওয়া হয় না, কোন নারীকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে সেই বিবাহ হয় না। তাহারা কোন কথা বলিলে গুরুত্বের সহিত তাহা কেহ শোনে না এবং তাহাদের অভাব-অনটন তাহাদের বুকের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরে। কিন্তু রোজ কেয়ামতে তাহাদের নূর যদি বন্টন করিয়া দেওয়া হয়, তবে সমস্ত মানুষের জন্য তাহা যথেষ্ট হইবে।

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ان من امتى من لو اتى احدكم يسأله دينارا لم يعطه اياه و لو سأله درهما لم يعطه اياه و لو سأله فلسا لم يعطه اياه و لو سأل الله تعالى الجنة لأعطاه اياها و لو سأله الدنيا لم يعطه اياها و منعها اياه الا لهوانها عليه رب ذى طمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لا بره

অর্থঃ আমার উম্মতের মধ্যে কতক লোক এমন আছে, তাহারা কাহারো নিকট এক দেরহাম, এক দিনার বা একটি পয়সা চাহিলে কেহই তাহা দিবে না। কিন্তু তাহারা যদি আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করে, তবে তাহাদিগকে তাহা প্রদান করা হইবে। কিন্তু দুনিয়াতে কিছু চাহিলে দেওয়া হইবে না। দুনিয়াতে না দেওয়ার কারণ হইল– দুনিয়া মৃত্তিকাতুল্য। অনেক দুই চাদরওয়ালা এমন আছে, লোকেরা যাহাদিগকে কোন গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু তাহারা যদি আল্লাহর নমে কোন শপথ করে, তবে আল্লাহ তাহা অবশ্যই পূরণ করিবেন। (তাবরানী আওসাত)

একদিন হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, হযরত মোয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাস করিলেন, হে মোয়াজ! তুমি কাঁদিতেছ কেন?

হযরত মোয়াজ (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

ان اليسير من الريا شرك و ان الله يحب الا تقياء الا خفياء الذين ان غابوا لم يفتقدوا و ان حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة

অর্থঃ সামান্য রিয়াও শিরক। আল্লাহ তায়ালা এমন আত্মগোপনকারী মোত্তাকীগণকে পছন্দ করেন যাহারা উধাও হইয়া গেলে কেহই তাহাদিগকে খোঁজ করে না এবং উপস্থিত থাকিলেও কেহ তাহাদিগকে চিনে না। তাহাদের অন্তর হেদায়েতের নূর। সেই নূরের আলোকে তাহারা ধুলাবালি ও অন্ধকার অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয়। (তাবরানী, হাকিম)

মোহাম্মদ ইবনে সুয়াইদ বর্ণনা করেন, একবার মদীনা শরীফে প্রচণ্ড খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই সময় জনৈক অখ্যাত দরবেশ মসজিদে নববীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি দিনরাত সেখানেই এবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকিতেন। এক দিন সকলে দোয়া কালামে লিপ্ত ছিল। এমন সময় অতি সাধারণ বেশভূষায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিল। লোকটি সংক্ষেপে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া এইভাবে দোয়া করিতে লাগিল– আয় পরওয়ারদিগার! আমি তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, এই মুহূর্তে বৃষ্টি বর্ষণ কর। লোকটি দোয়া শেষ করিয়া হাত নামাইবার পূর্বেই গোটা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া এমন ভারী বর্ষণ শুরু হইল যে, অবশেষে মদীনাবাসীগণ পানিতে তলাইয়া যাওয়ার আশংকায় ফরিয়াদ করিতে লাগিল। তখন সেই লোকটি পুনরায় দোয়া করিল– পরওয়ারদিগার! তুমি যদি মনে কর, এই পরিমাণ পানিই তাহাদের জন্য যথেষ্ট, তবে বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দাও। লোকটির এই দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দিলেন। অতঃপর এই লোকটি মসজিদে এবাদতরত সেই দরবেশের শরণাপন্ন হইল। দরবেশ তখন মসজিদ হইতে বাহির হইয়া নিজের বাড়ীতে যাইতেছিলেন। লোকটি তাহার পিছনে পিছনে গিয়া তাহার বাড়ীটি চিনিয়া আসিল। পর দিন সকালে দরবেশের বাড়ীতে গিয়া তাহার নিকট আরজ করিল, আমি আপনার নিকট এই আরজি লইয়া আসিয়াছি যে, আপনি দোয়ার সময় খাসভাবে আমার কথা স্মরণ করিবেন। দরবেশ লোকটিকে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি আমাকে দোয়া করিতে বলিতেছ? তোমার অবস্থা তো আমি গতকালই স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তুমি বরং এই কথা বল যে, এই মর্তবা তুমি কেমন করিয়া হাসিল করিলে। লোকটি বলিল, আমি আল্লাহ পাকের আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলি। উহার ফলেই আল্লাহ পাক আমাকে এই সৌভাগ্য দান করিয়াছেন যে, আমি যাহা দোয়া করি তাহাই কবুল হয়।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, হে লোকসকল! তোমরা এলেমের ঝরণা এবং হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হও। রাতের প্রদীপ এবং স্বতেজ অন্তরের অধিকারী হও। তোমরা পুরাতন বস্ত্র ব্যবহার কর এবং নিজ গৃহে অবস্থান কর। আকাশের অধিবাসীগণ যেন তোমাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করে এবং জমিনের অধিবাসীগণ যেন তোমাদিগকে চিনিতে না পারে।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

يقول الله تعالى ان اغبط اوليائى عبد مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة احسن عبادة ربه و اطاعة في السر و كان غامضا في الناس لا يشار إليه بالاصابع ثم صبر على ذالك

আল্লাহ পাক বলেন, আমার ওলীদের মধ্যে সে-ই ঈর্ষণীয় মোমেন যে নিজের উপর পরিবারের বোঝা কম রাখে, নামাজে অংশ গ্রহণ করে, উত্তমরূপে স্বীয় পালনকর্তার এবাদত করে এবং গোপনে আল্লাহর আনুগত্য করে। সে মানুষের দৃষ্টি হইতে এমন গোপন থাকে যে, মানুষ তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে না। অতঃপর সে এই অবস্থার উপর সবর করে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয় বান্দা হইল পরদেশীগন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, 'পরদেশী' দ্বারা আপনি কাহাদের কথা বুঝাইতেছেন? তিনি বলিলেন, যাহারা দ্বীনের জন্য নিজেদের আবাস ত্যাগ করে, তাহারাই পরদেশী। রোজ কেয়ামতে এই পরদেশীগণ হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট জমায়েত হইবে।

হযরত ফোজায়েল ইবনে আয়াজ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়েত পৌঁছিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা নিজের কোন কোন পুরস্কারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন, আমি কি তোমাদিগকে এইরূপ পুরস্কার দেই নাই? আমি কি তোমাদের অপরাধ ঢাকিয়া রাখি নাই? আমি কি তোমাদিগকে অখ্যাত রাখি নাই?

খলীল ইবনে আহ্‌মাদ এইরূপ দোয়া করিতেন– আয় আল্লাহ! তোমার নিকট আমার মর্যাদা বৃদ্ধি কর, আমার নজরে আমাকে একেবারে হীন কর, আর মানুষের নিকট আমাকে মধ্যম স্তরের মর্যাদা দান কর। প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, আমার প্রত্যাশা– আমার অন্তর যেন মক্কা ও

মদীনার সেই পরদেশী ছালেহীনগণের সঙ্গে লাগিয়া থাকে, যাহারা অন্তহীন কষ্টেসৃষ্টে জীবন যাপন করে।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম বলেন, জীবনে একদিনই আমার চক্ষু শীতল হইয়াছিল। সেই দিনের ঘটনা হইল– এক রাতে আমি সিরিয়ার কোন এক মসজিদে রাত্রি যাপন করিতেছিলাম। ঘটনাক্রমে সেই রাতে আমার ভয়ানক দাস্ত হইতে লাগিল। পরে মুয়াজ্জিন আমার অবস্থা টের পাইয়া সে আমার পা ধরিয়া টানাহেঁচড়া করিয়া আমাকে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিল।

হযরত ফোজায়েল (রহঃ) বলেন, তোমার পক্ষে যদি অপ্রসিদ্ধ থাকা সম্ভব হয়, তবে তাহাই করিও। কেননা, মানুষের প্রশংসা ও প্রসিদ্ধি লাভ কোন কল্যাণকর বিষয় নহে। তুমি যদি আল্লাহ পাকের নিকট প্রিয় হও, আর মানুষ তোমাকে খারাপ জানে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

উপরের আলোচনা দ্বারা খ্যাতির নিন্দা এবং অখ্যাত থাকার ফজিলত জানা গেল। বস্তুতঃ মানুষের মূল উদ্দেশ্য 'খ্যাতি' ও 'সুনাম' নহে। বরং এই খ্যাতির মাধ্যমে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সম্মান পাইতে চাহে। তো এই খ্যাতিই হইল যত অনিষ্টের মূল। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, সুনাম ও খ্যাতি যদি অনিষ্টকর হইবে, তবে পয়গম্বর আলাইহিস্ সালাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং শরীয়তের ইমামগণ কি কারণে এমন খ্যাতির অধিকারী হইয়াছিলেন? পৃথিবীতে তাহাদের যেই খ্যাতি অর্জিত হইয়াছে, উহার কোন তুলনা হইতে পারে কি? আর কি কারণেইবা তাহারা খ্যাতিহীনতার ফজিলত হইতে বঞ্চিত রহিলেন? এই প্রশ্নের জবাব হইল– আসলে সত্তাগতভাবে 'খ্যাতি' কোন নিন্দনীয় বিষয় নহে। বরং এই খ্যাতি অর্জন করা বা উহার জন্য চেষ্টা-তদ্বির করাই নিন্দনীয়। সুতরাং আল্লাহ পাক যদি নিজ ফজল ও করমে কোন ব্যক্তিবিশেষকে তাহার কোনরূপ চেষ্টা-তদ্বির ও প্রার্থনা ছাড়াই তাহাকে খ্যাতি দান করেন, তবে এই খ্যাতি অনিষ্টকর নহে। অবশ্য দুর্বল ব্যক্তিদের পক্ষে এই খ্যাতি অনিষ্টকর হইতে পারে। উহার উদাহরণ এইরূপ– মনে কর, একদল মানুষ পানিতে ডুবিয়া তলাইয়া যাইতেছে। এই বিপন্ন মানুষদের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তি সাতার জানে। এখন তাহার এই সাতার জানার বিষয়টি অপরাপরদের মধ্যে খ্যাত না হওয়াই নিরাপদ। কেননা, তাহার সাতার জানার বিষয়টি যদি সকলের জানা থাকে, তবে সকলে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজেরাও ডুবিবে এবং তাহাকেও ডুবাইয়া মারিবে। অবশ্য এই ব্যক্তি যদি শক্তিশালী হয়, তবে তাহার সাতারের খ্যাতি তাহার জন্য অনিষ্টকর নহে। বরং ভাল সাঁতারু সম্পর্কে জানা থাকাই উত্তম, যেন বিপদের সময় তাহার সহায়তায় প্রাণে রক্ষা পাওয়া যায়।

খ্যাতিপ্রীতির নিন্দা

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَ لَا فَسَادًا

অর্থঃ এই পরকাল আমি তাহাদের জন্য নির্ধারিত করি, যাহারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে ও অনর্থ সৃষ্টি করিতে চাহে না।

(সূরা কাসাস ঃ আয়াত ৮৩)

উপরোক্ত আয়াতে দুইটি বিষয় একত্রিত করা হইয়াছে। একটি হইল জাহ তথা ইজ্জত-প্রভাব ও খ্যাতি লাভের ইচ্ছা এবং অপরটি হইতেছে ফাসাদ সৃষ্টি করার ইচ্ছা। অতঃপর বলা হইয়াছে পরকাল এমন ব্যক্তিদের জন্য যাহারা এই দুইটি ইচ্ছা হইতে মুক্ত।

এরশাদ হইয়াছে–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَ هُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ * اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ * وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ *

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাহাদের দুনিয়াতেই তাহাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করাইয়া দিব এবং তাহাতে তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। ইহারাই হইল সেইসব লোক আখেরাতে যাহাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছু নাই। তাহারা এখানে যাহাকিছু করিয়াছিল সবই বরবাদ করিয়াছে, আর যাহাকিছু উপার্জন করিয়াছিল, সবই বিনষ্ট হইল।" (সূরা হূদঃ আয়াত– ১৫-১৬)

আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

حب المال و الجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل

অর্থঃ "মাল ও জাহ্ এর মোহ অন্তরে এমনভাবে নেফাক সৃষ্টি করে যেমন বৃষ্টির পানি সজি উৎপন্ন করে।" অন্য হাদীসে আছে–

ما ذئبان ضاريان ارسلا في زريبة غنم بأسرع افسادا من حب الشرف و المال في دين الرجل المسلم

অর্থঃ "ছাগপালের মধ্যে দুইটি নেকড়ে ছাড়িয়া দিলে উহারা এত দ্রুত ছাগপালের ক্ষতি করে না– সম্পদ ও গৌরবের মোহ মুসলমানদের দ্বীনকে যতটা দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত করে।"

জাহ্ এর অর্থ এবং উহার হাকীকত

প্রকাশ থাকে যে, জাহ ও মাল হইতেছে দুনিয়ার দুইটি স্তম্ভ। মাল বা সম্পদের অর্থ– পার্থিব জীবনে উপকারী ও প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহের মালিক হওয়া। আর জাহ্ বলা হয় সেইসব অন্তর সমূহের মালিক হওয়াকে, যাহাদের নিকট হইতে সম্মান ও আনুগত্য প্রত্যাশা করা হয়। মালদার ও বিত্তবান ব্যক্তি যেমন টাকা-পয়সার মাধ্যমে নিজের যাবতীয় খাহেশাত ও কামনা-বাসনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়; তদ্রূপ জাহ্ এর মালিক তথা সম্পদ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিও মানুষের অন্তরের মালিক হইয়া তাহাদিগকে নিজের প্রয়োজন ও স্বার্থ উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করিতে সক্ষম হয়। অর্থবিত্ত যেমন বিভিন্ন পেশা, কর্ম ও কারিগরির মাধ্যমে সঞ্চয় করা হয়, তদ্রূপ মানুষের অন্তরও উন্নত চরিত্র, উদারতা ও মহানুভবতা– ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জন করা হয়। মানুষের অন্তর বশীভূত হয় বিশ্বাসের মাধ্যমে। যেন কোন মানুষের অন্তর যদি এই কথা বিশ্বাস করে যে, অমুক ব্যক্তির মধ্যে অমুক গুণটি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, তখন এই বিশ্বাসের কারণেই অন্তর তাহার প্রতি আকৃষ্ট ও বশীভূত হইয়া পড়িবে। এই বিশ্বাস যত মজবুত ও দৃঢ় হইবে, সেই অনুপাতেই অন্তর তাহার প্রতি অনুগত হইবে। এখন বাস্তবেও আলোচ্য গুণটি সেই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান হওয়া জরুরী নহে; বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশ্বাসমতে গুণটি সেই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান হওয়াই যথেষ্ট। এই কারণেই অনেক সময় দেখা যায় মানুষের অন্তর হয়ত এমন কোন বিষয়কে পরিপূর্ণ গুণ ও কীর্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে, বাস্তবে যাহা আদৌ কোন গুণ বা কীর্তি নহে। কিন্তু অন্তর এই অমূলক বিশ্বাসের কারণেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছে। কারণ, আনুগত্য হইতেছে অন্তরের একটি হালাত যাহা বিশ্বাসের অনুগামী হইয়া থাকে।

সম্পদের অভিলাষী ব্যক্তি যেমন ইহা কামনা করে যে, সে যেন অনেক গোলাম-বাঁদীর মালিক হইতে পারে, তদ্রূপ যশ-প্রভাব ও সম্মানের অভিলাষী ব্যক্তিও ইহা কামনা করে, স্বাধীন ও মুক্ত মানুষেরা যেন তাহার আনুগত্য ও গোলামী করিতে থাকে এবং সকল মানুষের অন্তরে যেন তাহার সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এইভাবেই সে অনুগত লোকজনকে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করিতে চাহে।

সম্পদশালী ব্যক্তি যেমন মানুষের আনুগত্য ও গোলামী কামনা করে, তদ্রুপ যশ-খ্যাতি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিও মানুষের আনুগত্য কামনা করে। তবে এই ক্ষেত্রে যশ ও প্রভাবপ্রিয় ব্যক্তির কামনা প্রবল ও নিরঙ্কুশ। কারণ, সম্পদশালী ব্যক্তি জোরপূর্বক মানুষকে গোলাম বানাইয়া তাহাদের আনুগত্য আদায় করে। অর্থাৎ এই সকল লোক স্বেচ্ছায় মনিবের গোলামী মানিয়া লয় না। এই ক্ষেত্রে যদি তাহাদিগকে এখতিয়ার দেওয়া হয়, তবে এক মুহূর্তের জন্যও তাহারা সেই সম্পদশালী ব্যক্তির আনুগত্য করিতে রাজী হইবে না। পক্ষান্তরে মানুষ স্বেচ্ছায় প্রভাবশালী ব্যক্তির আনুগত্য গ্রহণ করে এবং এই আনুগত্যকে তাহারা গৌরবের বিষয় মনে করে। প্রভাবশালী ব্যক্তিটিও এইরূপ কামনা করে যেন মানুষ সন্তুষ্টচিত্তে তাহার আনুগত্য গ্রহণ করে এবং এই আনুগত্য যেন তাহাদের স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, 'জাহ্' অর্থ হইতেছে মানুষের কোন গুণ ও কীর্তি সম্পর্কে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হওয়া এবং এই বিশ্বাসের আলোকেই অন্তরে সেই ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই বিশ্বাস যত মজবুত হইবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যও সেই অনুপাতেই প্রবল হইবে। মানুষের আনুগত্য যত বেশী পাওয়া যাইবে সেই অনুপাতেই অধিক লাভবান হওয়া যাইবে।

খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির ফল হইল, যেই ব্যক্তির আনুগত্য করা হয় সেই ব্যক্তির প্রশংসা ও গুণ-বর্ণনা করা হয়। আর মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসও অনেকটা এইরূপ যে, মানুষ যাহার আনুগত্য করে তাহার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন না করিয়া থাকিতে পারে না। জাহ্ এর আরেক ফল হইল, খেদমত ও সাহায্য-সহযোগিতা করা। কারণ, অনুগত ব্যক্তি তাহার বিশ্বাস ও ভক্তি অনুযায়ী সেই ব্যক্তির খেদমত ও সাহায্য-সহযোগিতা করিতে পারাকে নিজের জন্য গৌরবের বিষয় মনে করে। এই পর্যায়ে সেই ব্যক্তিও তাহাদের পক্ষ হইতে নিরঙ্কুশ আনুগত্য আদায় করিতে সক্ষম হয় এবং নিজের স্বার্থ উদ্ধারের কাজে তাহাদিগকে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে। তাহারাও সেই ব্যক্তির আনুগত্য ও সেবাযত্ন করিয়া এক অনাবিল আত্মসুখ অনুভব করে। সকল কাজে তাহাকে আগে আগে রাখে এবং কোন বিষয়েই তাহার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে না। সর্বদা তাহাকে ইজ্জত করে এবং দেখিবামাত্র আগে ছালাম করে। মজলিসের শ্রেষ্ঠ আসনটি দিয়া তাহাকে বরণ করে এবং সকল কাজেই তাহার সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেয়।

তো মানুষের প্রতি এই আনুগত্য ও ভক্তি তখনই পয়দা হয় যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন গুণ ও কীর্তির বিশ্বাস অন্তরে স্থাপিত হয়। মানুষের সেই গুণ কীর্তি বিভিন্ন রকম হইতে পারে। যেমন সেই লোকটি হয়ত ভাল আলেম-আবেদ বা উন্নত চরিত্রের অধিকারী কিংবা সে আকর্ষণীয় রূপের অধিকারী, ভাল বংশের লোক, সরকারী ক্ষমতা বা শারীরিক শক্তির অধিকারী– ইত্যাদি। অর্থাৎ এই সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইলে উহা দ্বারা মানুষের অন্তর জয় করা যায়।

জাহ্ পছন্দনীয় হওয়ার কারণ

জাহ্ অর্থ মানুষের অন্তরের মালিক হওয়া। অর্থাৎ নিজের কোন কম বা কীর্তির খ্যাতির মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক তাহাদের অন্তর জয় করিয়া লওয়া। এখন আমরা আলোচনা করিব এই জাহ্ মানুষের নিকট এত প্রিয় কেন? জাহ পছন্দ করে না এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাইবে। যদি কাহারো অন্তর উহার প্রতি একেবারেই নির্লিপ্ত হয়, তবে মনে করিতে হইবে- প্রচুর মোজাহাদা ও সাধনার পরই তাহা সম্ভব হইয়াছে।

বস্তুতঃ মানুষ যেই কারণে স্বর্ণ ও রৌপ্যকে মোহাব্বত করে, ঐ একই কারণে 'জাহ্' এর প্রতিও আকৃষ্ট হয়। বরং সোনা-রূপার চাইতে জাহ্ এর প্রতিই মানুষের আকর্ষণ বেশী। স্বর্ণ ও রৌপ্য যদি ওজনে বরাবর হয়, তবে স্বর্ণের প্রতিই মানুষের আকর্ষণ বেশী হইবে। কেননা, একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, সত্তাগতভাবে টাকা পয়সা মানুষের মূল উদ্দেশ্য নহে। কারণ, এই টাকা পয়সা না খাওয়া যায়, না পরিধান করা যায়, না উহাকে বিবাহ শাদী করা যায়। সুতরাং এই মুদ্রা ও পাথরের মধ্যে দৃশ্যতঃ কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু উহার পরও টাকা পয়সা মানুষের নিকট প্রিয় হওয়ার কারণ হইল উহা দ্বারা মানুষের যাবতীয় কার্য উদ্ধার হয় এবং মনের সর্ববিধ কামনা-বাসনা এই টাকা পয়সা দ্বারাই পূরণ হয়। জাহ্ এর অবস্থাও অনুরূপ। কেননা, আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, জাহ্ এর অর্থ হইতেছে মানুষের অন্তরের মালিক হওয়া। সোনারূপার মালিক হওয়ার ফলে যেমন যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের শক্তি অর্জন করা যায়; তদ্রূপ মানুষের অন্তরের মালিক হইতে পারিলে এবং তাহাদিগকে অনুগত করিতে পারিলেও নিজের যাবতীয় কার্যোদ্ধারের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জাহ্ ও মালের মোহাব্বতের কারণ অভিন্ন। এই কারণেই মানুষ জাহ্ ও মাল এই উভয়টিকেই মোহাব্বত করে। কিন্তু তবুও মাল অপেক্ষা জাহ্ এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ প্রবল। সুতরাং মানুষ মাল বা সম্পদ অপেক্ষা জাহকেই অধিক মোহাব্বত করে।

মাল অপেক্ষা জাহ্ অধিক কাম্য হওয়ার কারণ

মোটামুটি তিনটি কারণে মাল অপেক্ষা জাহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়-

প্রথম কারণ

প্রথমতঃ মাল দ্বারা জাহ্ অর্জন করা অপেক্ষা জাহ্ দ্বারা মাল অর্জন করা অনেক সহজ। অর্থাৎ ধনসম্পদ ও টাকা-পয়সা দ্বারা সুনাম-সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করা কঠিন বটে, কিন্তু সেই তুলনায় সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা সম্পদ অর্জন করা অনেক সহজ। সুতরাং দেখা যাইতেছে- এমন কোন আলেম বা আবেদ যিনি নিজের বুজুর্গী বা উন্নত আখলাকের মাধ্যমে মানুষের অন্তর জয় করিতে পারিয়াছেন, তিনি খুব সহজে সম্পদও সঞ্চয় করিতে পারেন। কেননা, সাধারণতঃ মানুষ যাহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তাহার জন্য অকাতরে সম্পদ ব্যয় করিতে কিছু মাত্র দ্বিধাবোধ করে না। তবে জাহ্ বঞ্চিত কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক কোন উপায়ে বিপুল সম্পদের অধিকারী হইলেও তাহার পক্ষে এই সম্পদ দ্বারা জাহ্ তথা সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করা সহজ হয় না।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, মানুষ জাহ্ দ্বারা মাল কামাইতে পারে বটে, কিন্তু মাল দ্বারা জাহ্ কামাইতে পারে না। এই কারণেই মানুষের নিকট জাহ্ অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয় হয়।

দ্বিতীয় কারণ

মাল বা সম্পদ বিভিন্ন কারণেই বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যেমন চুরি হওয়া, ছিনতাই হওয়া বা সরকার কর্তৃক ক্রোক করা- ইত্যাদি। সুতরাং উহার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অন্তহীন দুশ্চিন্তা ও বিপুল শ্রম ব্যয় করিতে হয়। পক্ষান্তরে মানুষের অন্তরের মালিক হইলে এই জাতীয় কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় না। মানুষের অন্তর এমন এক গোপন ভাণ্ডার যাহা কোন মানুষের পক্ষে বিনষ্ট করা সম্ভব হয় না এবং কোন চোর-ডাকাতও তথা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে না। সম্পদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক স্থাবর সম্পদ হইল জমিন ও বাড়ী-ঘর। কিন্তু উহাও বেদখল হইয়া যাওয়ার আশংকা হইতে মুক্ত নহে। সুতরাং উহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তৎপর থাকিতে হয়। কিন্তু আত্মিক সম্পদের জন্য কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয় না। সত্তাগতভাবেই উহা নিরাপদ। অর্থাৎ 'জাহ' চুরি-ডাকাতি ও বেদখল হইয়া যাওয়ার আশংকা হইতে নিরাপদ। অবশ্য এই আত্মিক সম্পদের ক্ষেত্রে যেই আশংকা সতত বিদ্যমান থাকিতে পারে তাহা হইল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গোমরাহ করিয়া দেওয়া কিংবা তাহার সমালোচনা ও বদনাম করিয়া তাহার উপর হইতে মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া। অবশ্য এইরূপ সম্ভাবনা খুবই কম এবং এইরূপ হইলেও উহার মোকাবেলা করা খুব কঠিন নহে। তাহা ছাড়া এইসব ক্ষেত্রে ভক্তি-শ্রদ্ধা এমনই প্রবল হয় যে, দুষ্ট লোকদের নিছক সমালোচনার কারণেই তাহা নষ্ট হইয়া যায় না।

তৃতীয় কারণ

প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পদের উপর প্রবল ও প্রাধান্য হওয়ার তৃতীয় কারণ হইল- মানুষের অন্তরের মালিকানা বা প্রভাব-প্রতিপত্তি একটি সংক্রামক ও ক্রমঃগতিশীল বিষয়। কোনরূপ চেষ্টা-তদ্বির ও পরিশ্রম ছাড়াই উহার

ক্রমবিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। কারণ মানুষের অন্তর যখন কাহারো ব্যাপারে ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং তাহার এলেম ও আমল দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন মুখ সেই ব্যক্তির গুণাবলী প্রশংসা করিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস হইল- সে যখন আন্তরিকতার সহিত কোন বিষয়ে আস্থাশীল ও বিশ্বাসী হয়, তখন উহা অপরের নিকটও প্রকাশ করিয়া বেড়ায়। এইভাবেই উহা ক্রমে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং যাহারা শোনে তাহারাও সেই ব্যক্তির প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ মানুষের সুনাম ও প্রভাব এই প্রক্রিয়ায় গ্রাম, শহর ও দেশের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কত দূর পর্যন্ত যে ছড়াইয়া পড়ে উহার কোন ইয়ত্তা নাই। পক্ষান্তরে সম্পদের ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা বিদ্যমান নহে। সম্পদের মালিক যথাযথভাবে চেষ্টা করিলেই উহার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। অন্যথায় দিনে দিনে উহা বিনষ্ট ও নিঃশেষ হইয়া যাইতে বাধ্য। অর্থাৎ সম্পদ হইল এমন স্থবির বস্তু যাহা স্বতস্ফূর্তভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। উহার পিছনে কেহ মেহনত করিলেই উহার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। কিন্তু জাহ্ এর অবস্থা সম্পূর্ণ উহার বিপরীত। জাহ্ সতত বর্ধনশীল এবং উহা কোথাও স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে না। এই কারণেই জাহ্ তথা সম্মান ও প্রতিপত্তির তুলনায় মাল বা ধনসম্পদের গুরুত্ব অতি নগন্য।

জাহ্ ও মালের মোহাব্বতে আধিক্যের উপকরণ

প্রকাশ থাকে যে, জাহ্ ও মালকে মানুষ এই কারনে মোহাব্বত করে যে, এই দুইটি বস্তু দ্বারা জীবনের সর্ববিধ উপকারী বিষয় হাসিল করা যায় এবং ক্ষতিকারক বিষয় হইতেও আত্মরক্ষা করা যায়। আরো সোজা কথায়- জীবনের কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ হইতে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যেই জাহ্ ও মালকে মোহাব্বত করা হয়। এখানে হয়ত কেহ প্রশ্ন করিতে পারে- আমরা তো এমন অনেক বিত্তবানের কথা জানি, যাহারা পর্যাপ্ত সম্পদের মালিক হওয়ার পরও কেমন করিয়া আরো বিপুল সম্পদের পাহাড় গড়িয়া তোলা যায় কেবল উহার ফিকিরেই লাগিয়া আছে। অর্থাৎ তাহারা যেন একটি সোনার খনির মালিক হওয়ার পর কেমন করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় খনিটি হস্তগত করা যাইবে উহারই চেষ্টা করিতেছে। জাহ্ ও প্রভাব প্রতিপত্তির ক্ষেত্রেও ঐ একই অবস্থা। কেমন করিয়া ইজ্জত-সম্মান ও সুনাম দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িবে- এই ফিকির ও চেষ্টায় তাহাদের কোন বিরাম নাই। তাহারা কামনা করে যেন দূর দেশগুলিতেও তাহাদের সুনাম-সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে, অথচ এই বিষয়ে সে নিশ্চিত যে, সেইসব দেশে গমন করা হয়ত কোন দিনই তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। সেইসব দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে হয়ত তাহার কোন দিন সাক্ষাতও হইবে না। তাহাদের পক্ষ হইতে কোনরূপ ইজ্জত-সম্মান পাওয়ারও কোন

সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ তাহাদের পক্ষ হইতে কোন ভাবেই সে উপকৃত হইতে পারিবে না। কিন্তু তবুও এই অহেতুক চাহিদায় মানুষের আগ্রহের কোন অন্ত নাই। এই কথা সকলেই স্বীকার করিবে যে, জাহ্ ও মালের এই অতিরিক্ত চাহিদার পিছনে না মানুষের ধর্মীয় কোন ফায়দা আছে, না পার্থিব। কিন্তু তবুও কি কারণে মানুষ এই অনাবশ্যক সম্পদ ও সম্মানের প্রতি এতটা আগ্রহী হয়?

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব হইল- মানুষ প্রকৃত অর্থেই জাহ্ ও মাল তথা প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্পদকে মোহাব্বত করে। উহার কারণ দুইটি। প্রথম কারণটি প্রকাশ্য ও সর্বজন বিদিত। দ্বিতীয় কারণটি গোপন। এই দুইটি কারণের মধ্যে দ্বিতীয় কারণটি বড় ও মুখ্য। এই দ্বিতীয় কারণটি এমনই সূক্ষ্ম যে, সাধারণ লোকেরা তো বটেই বরং শিক্ষিত ও বিচক্ষণ লোকেরাও উহার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকেফ নহে। কেননা, এই কারণটি নফসের আভ্যন্তরীণ শিরা উপশিরা ও স্বভাবের গোপন চাহিদার সাহায্যে অন্তরে অবস্থান করে। তো এই বাতেনী বিষয়টির খবর কেবল সেই সব লোকেরাই বলিতে পারিবে, যাহারা বাতেনী জগতের সহিত পরিচিত।

প্রথম কারণঃ ভয় দূর করা

মানুষের স্বভাব হইল- নিজের নিকট পর্যাপ্ত সম্পদ থাকিবার পরও ভবিষ্যতে আর্থিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকায় অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করিতে থাকা। মানুষের আশার যেহেতু কোন শেষ নাই, সেহেতু সে কি পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করিবে উহারও কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। আর তাহার অন্তরে অনুক্ষণ এই আশংকা লাগিয়াই থাকে যে, আমার সম্পদ নিঃশেষ হইয়া আমি আবার সম্বলহীন হইয়া যাই কি-না। মনের ভিতর এই আশংকা সৃষ্টি হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে পূর্বানুরূপ সম্পদ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত সেই আশংকা দূর হয় না। সে মনে করে, কোন কারণে প্রথমোক্ত সম্পদ বিনষ্ট হইয়া গেলে যেন দ্বিতীয় সম্পদ উহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে। দুনিয়ার মোহাব্বত মানুষকে এই ধারণা দিয়া রাখে যে, আমি এই পৃথিবীতে সুদীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকিব। আমার জীবন যত দীর্ঘ হইবে, জীবনের প্রয়োজনও সেই অনুপাতেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আর যে কোন সময় কোন দুর্ঘটনা ও দুর্বিপাকে আমার সঞ্চিত সমুদয় সম্পদ বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এই ধারণা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সর্বদা উৎকণ্ঠিত ও ভীত করিয়া রাখে এবং এই আশংকা হইতে নিজেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সর্বদা সে টাকা-পয়সা রোজগারের ফিকিরে পেরেশান থাকে। সে মনে করে, কোন দুর্ঘটনায় আমার কিছু সম্পদ নষ্ট হইয়া গেলেও যেন অবশিষ্ট সম্পদ আমাকে রক্ষা করিতে পারে- এই পরিমাণ সম্পদ অবশ্যই আমার সঞ্চয়ে থাকিতে হইবে। এই আশংকার কারণেই সম্পদের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণকে সে নিজের

জন্য যথেষ্ট মনে করিতে পারে না। এই কারণেই এই শ্রেণীর লোকদের সম্পদের চাহিদার কোন সীমা থাকে না এবং গোটা দুনিয়ার মালিক হইয়া যাওয়ার পরও যেন তাহাদের সম্পদের খাহেশ মিটে না।

জাহ্ তথা সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহাব্বতের কারণও মোটামুটি অনুরূপ। যেই ব্যক্তি ইহা কামনা করে যে, বিদেশ ও দূরদেশের লোকদের অন্তরেও যেন আমার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পয়দা হয়, বস্তুতঃ এই ব্যক্তিও সর্বদা এমন আশংকায় শঙ্কিত থাকে যে, জীবন যাত্রার কোন অশুভ ক্ষণে যদি আমাকে দেশান্তরিত হইয়া সেই দেশে বসবাস করিতে হয় কিংবা সেই দেশের লোকেরা যদি এই দেশে আসিয়া বসবাস শুরু করে, তবে এই ক্ষেত্রে আমার পক্ষেও তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের অন্তরে যদি আমার প্রভাব ও শ্রদ্ধা না থাকে, তবে আমি কেমন করিয়া তাহাদের সাহায্য লাভ করিব? যাহাই হউক, এইরূপ আশংকা একেবারে অমূলক নহে এবং দূরে অবস্থানকারীদের সাহায্যের প্রয়োজন ও তাহা প্রাপ্তি সম্ভব হইতেও পারে।

দ্বিতীয় কারণ

জাহ্ ও মালের মোহাব্বতের আধিক্যের এই দ্বিতীয় কারণটিই অধিক প্রবল ও মজবুত। উহার মূল কথা হইল– রূহ একটি আমরে রাব্বানী বা আল্লাহর হুকুম। যেমন কালামে পাকে রূহ সম্পর্কে এরশাদ হইয়াছে–

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ، قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ =

অর্থঃ "তাহারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলিয়া দিন, রূহ্ আমার পালনকর্তার হুকুম বিশেষ।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ আয়াত ৮৫)

মানুষের রূহ আত্মা রব্বানী হওয়ার তাৎপর্য হইল, উহার সম্পর্ক আধ্যাত্মিক জগতের গোপন রহস্যাবলির সহিত সংশ্লিষ্ট। এইসব গোপন ভেদ প্রকাশ করার অনুমতি নাই। কেননা, উহা প্রকাশ করার অনুমতি থাকিলে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূহ এর হাকীকত এবং উহার গোপন রহস্যাবলী অবশ্যই প্রকাশ করিতেন। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে ইহার অধিক কিছু আলোচনার পূর্বে এতটুকু জানা আবশ্যক যে, মানুষের আত্মা ও কৃলব চারি প্রকার স্বভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়–

১. পাশবিক স্বভাব, যেমন– আহারাদি গ্রহণ ও সহবাস ইত্যাদি।
২. হিংস্র স্বভাব, যেমন– হত্যা খুনখারাবী ও মারামারি ইত্যাদি।
৩. শয়তানী স্বভাব, যেমন– ধোঁকা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ইত্যাদি।
৪. রাব্বানী স্বভাব, যেমন– ইজ্জত, সম্মান, অহংকার ও বড়ত্ব ইত্যাদি।

উপরে বর্ণিত স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য সমূহের সহিত মানবাত্মার সংশ্লিষ্টতার কারণ

হইল– মানব স্বভাব কয়েকটি উসূল ও নীতিমালার সমন্বয়ে গঠিত। এইসব সূক্ষ্ম বিষয়ের হাকীকত বর্ণনা করিতে হইলে দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করিতে হয়। আমরা এখানে কেবল উহার একটি বিষয়ের উপরই আলোচনা করিব যে, মানবের স্বভাব-প্রকৃতিতে রাব্বানী স্বভাব বিদ্যমান। এই কারণেই মানুষ রবুবিয়ত ও কর্তৃত্ব পছন্দ করে। এখানে রবুবিয়ত অর্থ কর্তৃত্ব ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে অনন্যতা এবং অস্তিত্বের ক্ষেত্রে স্থিতি ও নিরঙ্কুশ অধিপত্য। কারণ, অস্তিত্ব ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অপর কাহারো অংশীদারিত্ব বিদ্যমান হইলে নিরঙ্কুশ অধিপত্য খর্ব হইতে বাধ্য। যেমন সূর্যের কৃতিত্ব হইল নিজের অস্তিত্ব এবং আপন ভুবনে সে একক ও অনন্য সত্তার অধিকারী। তাহার সঙ্গে যদি অপর কোন সূর্যও থাকিত, তবে ইহা তাহার একক সত্তাকে খর্ব করিত এবং ইহাকে তাহার জন্য মর্যাদাহানীকরও মনে করা হইত। কেননা, তখন আর এইরূপ বলা যাইত না যে, সূর্য তাহার কৃতিত্বের ক্ষেত্রে একক ও অনন্য। তো অস্তিত্বের ক্ষেত্রে একক ও অনন্য হইলেন আল্লাহ পাক। কেননা, তিনি একক, অভিন্ন এবং তাঁহার কোন শরীক নাই। আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের বাহিরে আর যাহাকিছু বিদ্যমান, উহা আল্লাহ পাকের কুদরতেরই নিদর্শন মাত্র।

মোটকথা, রবুবিয়তের অর্থ হইল, আপন অস্তিত্বের ক্ষেত্রে একক ও অনন্য সত্তার অধিকারী হওয়া। স্বভাবগতভাবে প্রতিটি মানুষই চায় আপন কর্তৃত্ব ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে একক ও অনন্য হইতে। কিন্তু সে তাহা হইতে পারে না। মানুষ চায় কামেল হইতে, কিন্তু পরিপূর্ণ কামেল হওয়ার তাহার শক্তি নাই। উবুদিয়াত ও দাসত্ত মানুষের কাম্য নহে; স্বভাবগতভাবেই সে রবুবিয়াতে আকৃষ্ট। মানুষের রূহ যেহেতু একটি আমরে রাব্বানী বা আল্লাহ পাকের হুকুম বিশেষ, সুতরাং এই নেসবত ও সূত্র ধারার কারণেই রবুবিয়তের প্রতি মানুষের এই আগ্রহ। তো মানুষ কামালিয়াতের শীর্ষ শিখরে পৌঁছাইতে না পারিলেও কামালকে সে পছন্দ করে এবং উহার প্রতি তাহার আগ্রহ কখনো লুপ্ত হয় না। মানুষ বরং সেই কামালিয়াতের কল্পনাতেও এক প্রকার আত্মসুখ অনুভব করে। পৃথিবীর বিদ্যমান প্রতিটি বস্তুই নিজের সত্তা ও বৈশিষ্ট্য সত্তাকে মোহাব্বত করে এবং ধ্বংস ও বিনাশকে ঘৃণা করে। সুতরাং স্বভাবগত ভাবেই মানুষ নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্যকে ভালবাসে। বিদ্যমান বস্তুসমূহে মানুষের প্রাধান্য তখনই প্রমাণিত হইবে, যখন নিজের ইচ্ছামত ঐগুলিকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবে। সুতরাং ইহাও প্রমাণিত হইল যে, বস্তু সমূহের উপর প্রাধান্য লাভ মানুষের নিকট প্রিয়।

মওজুদাতের প্রকার ভেদ

মওজুদাত তথা বিদ্যমান বস্তু সমূহ কয়েক প্রকার। কতক এইরূপ যাহা

কোনরূপ বিবর্তন ও পরিবর্তন মানিয়া লইতে সম্মত নহে। যেমন আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাত। আবার কতক এইরূপ যে, উহারা পরিবর্তন মানিয়া লয় বটে, কিন্তু কোন মানুষের কর্তৃত্ব উহাদের উপর চলে না। যেমন আসমান, তারকা, জ্বিন, ফেরেশতা, পাহাড় পর্বত ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকারের মধ্যে এমনসব বস্তু অন্তর্ভুক্ত যেইগুলিতে মানুষ প্রভাব খাটাইতে পারে। যেমন– জমিন, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ, জীব-জন্তু ইত্যাদি। মানুষের ক্বলব বা অন্তরও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

বিদ্যাগত প্রাধান্যের বাসনা

মোটকথা, উপরের আলোচনা দ্বারা ইহা জানা গেল যে, মওজুদাত ও বিদ্যমান বস্তু সমূহের মধ্যে কতক এইরূপ যে, উহাতে মানুষের শক্তি প্রয়োগের কোন সুযোগ নাই। যেমন আল্লাহ পাকের জাত, ফেরেশতা, আসমান ইত্যাদি। আবার কতক এইরূপও আছে যেইগুলির উপর মানুষ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে। যেমন– জমিনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিবিধ পদার্থ ও জীব-যন্তু ইত্যাদি। এই কারণেই মানুষ এইরূপ কামনা করে যে, আমরা যখন কোন ভাবেই আসমানের উপর নিজেদের প্রভাব খাটাইতে পারিব না, তবে অন্ততঃ সৌর তথ্যাবলি এবং আকাশ সম্পর্কিত এলেম এবং উহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য ও তথ্যাবলীর এলেম হাসিল করিয়া হইলেও আকাশের উপর আমাদের একটা দখল ও প্রাধান্য থাকিতে হইবে। কেননা, কোন বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করাকেও সেই বিষয়ের উপর প্রাধান্য লাভের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। এই প্রাধান্য লাভের বাসনাই মানুষকে আল্লাহ, ফেরেশতা, আকাশ, তারকা, পাহাড় ও সমূদ্র ইত্যাদির রহস্যাবলী সম্পর্কে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান করিতে বাধ্য করিয়াছে। অর্থাৎ এই প্রসঙ্গটির সার কথা হইল– মানুষ যখন কোন শিল্প ও সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর প্রাধান্য বিস্তার ও শক্তি প্রয়োগে অক্ষম হয় তখন সে ঐ বিষয়ের তথ্যাদি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হইয়া এলমী প্রাধান্য অর্জন করিতে আগ্রহী হয়।

এদিকে ভূপৃষ্ঠের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষ কেবল এলমী প্রাধান্য অর্জন করাকেই যথেষ্ট মনে করে না। বরং এই ক্ষেত্রে সে শক্তি ও প্রভাব খাটানোর প্রাধান্য অর্জন করিতে চায়। যেন নিজের ইচ্ছামত উহাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারে। জমিনের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ দুই প্রকার। প্রথমতঃ আজসাম এবং দ্বিতীয়তঃ আরওয়াহ। আজসামের উদাহরণ যেমন– টাকা পয়সা ও অপরাপর বস্তুসমূহ। এইসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে মানুষের কামনা হইল, যেন নিজের ইচ্ছামত ও কার্যকরভাবেই উহাতে নিজের ক্ষমতা খাটাইতে পারে এবং যেইভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই উহা ব্যবহার করিতে পারে। অর্থাৎ যেখানে ইচ্ছা সেখানে লইয়া যাইবে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিয়া দিবে,

যাহাকে ইচ্ছা না দিবে– ইত্যাদি। কোন বস্তুর উপর এই ধরনের এখতিয়ার অর্জন করাকে বলা হয়, সেই বিষয়ের উপর তাহার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। আর এই ক্ষমতাই হইল কামাল বা কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

কামাল রবুবিয়াতেরই একটি সিফাত। মানুষ স্বভাবগতভাবেই এই রবুবিয়াত ও কর্তৃত্বের অভিলাষী। এই কারণেই মানুষ মাল ও ধনসম্পদকে মোহাব্বত করে। চাই সেই সম্পদ তাহার লেবাস-পোশাক, আহারাদি ও নফসের খাহেশাত পূরণের কাজে আবশ্যক নাই বা হউক। একই কারণে সে গোলাম-বাঁদীকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে এবং স্বাধীন মানুষকে নিজের অনুগত বানাইতে চাহে– যদিও বল প্রয়োগের মাধ্যমেই তাহাদের দ্বারা কাজ আদায় করিতে হউক না কেন। অনেক সময় মানুষ নিজের মতই অপরাপর মানুষের উপর প্রভাব খাটায়। কিন্তু এইভাবে জোর করিয়া মানুষের আত্মাকে বশ করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। কেননা, মানুষের স্বভাব হইল, সে অপর কাহারো বিশেষ কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের কারণে আকৃষ্ট না হইলে তাহার অনুগত হয় না। অবশ্য এই ক্ষেত্রে ক্রোধ ও জাঁকজমক কৃতিত্বের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে বটে। কেননা, ক্রোধ ও জাঁকজমকের মাধ্যমেও মানুষকে সাময়িকভাবে বশ করা যায় এবং উহার ফলেও ক্ষমতার স্বাদ কিছুটা অনুভূত হয়।

এখন অবশিষ্ট রহিল মানুষের আত্মা ও ক্বলব। এই পৃথিবীতে আত্মা ও ক্বলবের মত মূল্যবান বস্তু আর কিছু নাই। মানুষ এই আত্মা ও ক্বলবের উপরও প্রাধান্য বিস্তারের বাসনা করে। সে চায় আত্মার আনুগত্য এবং উহার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ যেন নিজের ইচ্ছামত উহাকে ব্যবহার করিতে পারে। মানুষের এই চাহিদার মাঝেই রবুবিয়াতের সিফাতের সহিত এক প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। আমরা আগেই বলিয়াছি, মানুষের অন্তর কাহারো প্রতি ভক্তি ও মোহাব্বত ব্যতীত কখনো তাহার অনুগত হয় না। আর মানুষের কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের উপর বিশ্বাস ব্যতীত এই ভক্তি ও মোহাব্বতও পয়দা হয় না। মানুষের যে কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বই সকলের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে। কেননা, এই কৃতিত্বের সম্পর্ক খোদায়ী সিফাতের সহিত। আর খোদায়ী সিফাত স্বভাবতই মানুষের নিকট গ্রহণীয় ও প্রিয় হইয়া থাকে। কেননা, ইহা "আমরে রাব্বানী" বা খোদায়ী বিধানের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই খোদায়ী বিধান মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান– যাহা মৃত্যু দ্বারাও বিনাশ হয় না এবং মাটিও যাহাকে নিঃশেষ করিতে পারে না। ইহাই ঈমান ও মা'রেফাতের স্তর যাহা মানুষকে আল্লাহতে পৌঁছাইয়া দেয় এবং আল্লাহর দীদার লাভের উসিলা হয়।

উপরের দীর্ঘ আলোচনার সার কথা হইল, জাহ্ এর অর্থ হইতেছে–

মানুষের অন্তর অনুগত হওয়া। মানুষের আত্মা কাহারো অনুগত হইলে সেই আত্মার উপর তাহার প্রাধান্য ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা রবুবিয়াতেরই একটি সিফাত। এই কারণেই মানব স্বভাব উৎকর্ষ পর্যায়ের এলেম ও ক্ষমতাকে মোহাব্বত করে। জাহ্ ও মাল হইল সেই ক্ষমতার উপকরণ। যেহেতু এলেম-অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার কোন অন্ত নাই; সেহেতু যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তু মানুষের এলেম ও ক্ষমতার বাহিরে থাকে, ততক্ষণ এই বিষয়ে সে নিজেকে অসম্পূর্ণ মনে করে এবং উহার ফলে তাহার অনুসন্ধিৎসার ও বিরাম হয় না। এই কারণেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেম পিপাসু ও সম্পদ লোভী সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ইহারা কখনো তৃপ্ত হয় না। তো বক্ষমান আলোচনা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হইয়া গেল যে, মানবাত্মার চাহিদা হইল কামাল বা কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। এই কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব হাসিল হয় এলেম ও ক্ষমতা দ্বারা।

প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্ব

উপরের আলোচনা দ্বারা এই বিষয়ে ধারণা পাওয়া গেল যে, অস্তিত্বের ক্ষেত্রে একক ও অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ অসম্ভব হওয়ার পর কেবল এলেম ও ক্ষমতাই এমন দুইটি বিষয় অবশিষ্ট থাকে, যাহার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব সাফল্য ও কৃতিত্ব হাসিল হইতে পারে, কিন্তু এই দুইটির মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য কাল্পনিক সাফল্যের সহিত বিমিশ্রিত। ইহার ব্যাখ্যা হইল- এলেম কেবল আল্লাহ পাকের নিকটই বিদ্যমান। আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো নিকট পূর্ণাঙ্গ এলেম নাই। উহার কারণ তিনটি-

১. প্রথমতঃ এলেম ও অভিজ্ঞতার আধিক্য ও ব্যাপকতা, কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এলেম ও অভিজ্ঞতা সমস্ত এলেমকে বেষ্টন করিয়া আছে। সুতরাং যেই ব্যক্তির এলেম যত ব্যাপক হইবে সেই ব্যক্তি সেই অনুপাতেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিবে।

২. দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাকের এলেম হইল প্রকৃত অভিজ্ঞতার এলেম। অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় অভিজ্ঞতার আসল হাকীকত তাঁহার সম্মুখে অতীব সুস্পষ্ট ও প্রতিভাত। সুতরাং যেই ব্যক্তির এলেম যত সুস্পষ্ট, ত্রুটিমুক্ত, বাস্তবানুগ ও সত্য হইবে, সেই অনুপাতেই সে আল্লাহর কুরবত ও নৈকট্য হাসিল করিবে।

৩. তৃতীয় কারণ হইল, আল্লাহ পাকের এলেমের কোন বিনাশ নাই। তিনি অনন্ত কাল যাবৎ এইভাবেই থাকিবেন। তাঁহার এলেমের মধ্যে কোনরূপ হেরফের ও পরিবর্তন কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং বান্দার এলেম যত পাকা ও মজবুত হইবে, আল্লাহ পাকের নৈকট্যও সেই অনুপাতেই হাসিল হইবে।

এলেমের প্রকার ভেদ

এলেম দুই প্রকার- ১. পরিবর্তনযোগ্য এবং ২. অনাদি ও অপরিবর্তনীয়। পরিবর্তনযোগ্য এলেমের উদাহরণ যেমন- জায়েদ ঘরে থাকার এলেম। অর্থাৎ এক ব্যক্তি মনে করিতেছে, জায়েদ ঘরে আছে। এখন এমনও হইতে পারে যে, জায়েদ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল আর সেই ব্যক্তি মনে করিতেছে জায়েদ এখনো ঘরেই আছে। এমতাবস্থায় জায়েদ ঘরে থাকা সংক্রান্ত তাহার এলেম ত্রুটিপূর্ণ হইবে এবং এই বিষয়ে তাহার এলেমকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা হইবে না। আরেক প্রকার এলেম হইল যাহা অলংঘনীয় এবং কখনো পরিবর্তন হইবার নহে। আল্লাহ পাকের জাত সিফাত, তাঁহার যাবতীয় কার্যক্রম, আসমান ও জমিনে তাঁহার হেকমত এবং দুনিয়া ও আখেরাতের শাশ্বত বিন্যাসের এলেমই হইল উৎকর্ষ পর্যায়ের এলেম ও প্রকৃত সাফল্য। যেই ব্যক্তি এই সাফল্যের অধিকারী হইবে, সেই ব্যক্তিই আল্লাহ পাকের নৈকট্য হাসিল করিতে সক্ষম হইবে। আত্মার এই কৃতিত্ব ও সাফল্য মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকিবে এবং আরেফগণের জন্য ইহা নূরের মিনারে পরিণত হইবে। এই প্রসঙ্গে কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا =

অর্থঃ "তাহাদের নূর তাহাদের সামনে ও ডান দিকে ছুটাছুটি করিবে। তাহারা বলিবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নূরকে পূর্ণ করিয়া দিন।"

(সূরা তাহরীমঃ আয়াত ৮)

অর্থাৎ এই মা'রেফাত এমন এক সম্পদে পরিণত হইবে যে, দুনিয়াতে যেই সমস্ত বিষয় নিগুঢ় রহস্যের অন্তরালে আচ্ছাদিত ছিল এবং যেই সব এলেম সুস্পষ্ট ছিল না, তখন সেইগুলিও পরিষ্কার হইয়া যাইবে। উহার উদাহরণ এইরূপ- কোন মানুষের নিকট হয়ত একটি অতি সাধারণ প্রদীপ আছে। এখন সে হয়ত এই টিমটিমে প্রদীপের আলো বাড়াইবার ব্যবস্থা করিবে কিংবা ইহা দ্বারা অন্য কোন প্রদীপ জ্বালাইয়া লইবে। অর্থাৎ তাহার প্রদীপটি যত মন্দই হউক এবং উহার আলো যত স্বল্পই হউক- একটি প্রদীপ যখন তাহার হাতে আছে, উহার সাহায্যেই সে উজ্জ্বল আলো ও ভাল প্রদীপের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। কিন্তু যেই ব্যক্তির নিকট কোন প্রদীপই নাই, সেই ব্যক্তি না অন্য কোন প্রদীপ জ্বালাইতে পারিবে, না আলো ও নূর বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করিতে পারিবে। তো আল্লাহর মা'রেফাত হইতে বঞ্চিত ব্যক্তির অবস্থাও সেই প্রদীপহীন ব্যক্তির মত। উহার উদাহরণ এইরূপ-

كَمَنْ مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا =

অর্থঃ "সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হইতে পারে, যে অন্ধকারে রহিয়াছে– তথা হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না"? (সূরা আন্‌আম ঃ আয়াত ১২৩)

বরং তাহাদের নূরহীন অন্ধকারের উদাহরণ যেন এইরূপ–

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ، ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ

অর্থঃ "অথবা (তাহাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাহাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যাহার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার।" (সূরা নূরঃ আয়াত ৪০)

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ পাকের মা'রেফাতই হইল যাবতীয় কল্যাণ ও সৌভাগ্যের জলাধার। কিছু কিছু বিষয়ের এলেম ও মা'রেফাত তো এমন আছে যে, ঐগুলি দ্বারা দুনিয়াতেও কোন ফায়দা হয় না। যেমন কাব্য ও বংশ পরম্পরার এলেম। আবার কতক এলেম ও মা'রেফাতের অবস্থা হইল, ঐ এলেম ও মা'রেফাত দ্বারা আল্লাহর মা'রেফাত হাসিলের ক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়া যায়। যেমন আরবী ভাষা, তাফসীর, ফেকাহ ও হাদীসের এলেম। অর্থাৎ আরবী ভাষা জানা থাকিলে তাহা কোরআনের তাফসীর শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। তাফসীর জানা থাকিলে এবাদত ও আমলের বিবরণ সমূহ ভালভাবে উপলব্ধি করা সহজ হয়। এবাদত ও আমলের ফলে আত্মশুদ্ধির পথ সুগম হয়। আত্মশুদ্ধি বা নফসের এসলাহের পর্যায় অতিক্রম করিতে পারিলে হেদায়েত নসীব হয় এবং এই হেদায়েতের ফলে আল্লাহর মা'রেফাত হাসিলের যোগ্যতা পয়দা হয়। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

অর্থঃ "যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সে-ই সফলকাম হয়।" (সূরা শামসঃ আয়াত ৯)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ *

অর্থঃ "যাহারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে আমার পথে পরিচালিত করিব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎ কর্মপরায়নদের সঙ্গে আছেন।" (সূরা আনকাবুতঃ আয়াত ৬৯)

এই সমস্ত এলেম হইল আল্লাহর মা'রেফাত হাসিলের উসিলা স্বরূপ। প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য আল্লাহর মা'রেফাত এবং তাঁহার সিফাত ও কার্যক্রম সমূহের মা'রেফাতের মধ্যে নিহিত। ইহার মধ্যে যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর মা'রেফাতও অন্তর্ভুক্ত। কেননা, যাবতীয় সৃষ্টবস্তু তো আল্লাহ পাকেরই কর্ম বটে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যখন দুনিয়ার কোন বস্তুর উপর এই দৃষ্টিকোণ হইতে নজর দিবে যে, ইহা আল্লাহ পাকেরই কর্ম ও তাঁহার কুদরতের নিদর্শন এবং এই বস্তুটির সহিত আল্লাহর ইচ্ছা, শক্তি ও তাঁহার হেকমত জড়িত; তখন এইসবের মাঝেই সে আল্লাহর মা'রেফাতের সন্ধান খুঁজিয়া পাইবে। আর ইহাই হইল উৎকর্ষ পর্যায়ের এলেম।

এতক্ষণ আমরা এলেম প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। এইবার আমরা কুদরত বা ক্ষমতা প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। আসলে কুদরত বা ক্ষমতার ক্ষেত্রে মানুষ প্রকৃত সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে অক্ষম। প্রকৃত ক্ষমতা কেবল আল্লাহ পাকেরই হাতে এবং তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তবে বান্দার ইচ্ছা, শক্তি ও কর্মতৎপরতার ফলে যাহাকিছু সৃষ্টি হয়, উহা আসলে আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেন। এই বিষয়ে আমি "সবর ও শোকর" শীর্ষক কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

সারকথা হইল, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কেবল আল্লাহ পাকেরই হাতে এবং এই ক্ষেত্রে বান্দার অবস্থা নেহায়েতই দুর্বল। তবে বান্দার উৎকর্ষ পর্যায়ের যেই এলেম হাসিল করিবে, তাহা মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকিয়া বান্দাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে। অবশ্য মানুষের প্রাপ্ত কুদরত ও ক্ষমতা এলেমেরই উসিলা বটে। এই ক্ষমতার অর্থ– মানুষের অঙ্গ-অবয়ব সুস্থ থাকা। যেমন হাত সুস্থ থাকিলে উহা ধারণ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। পা সুস্থ থাকিলে উহা পথ চলার শক্তি পায়। অনুভূতির সুস্থতার ফলে মানুষ উপলব্ধির শক্তি পায়। ইত্যাদি। এইসব শক্তিই মানুষকে এলেমের পূর্ণতার হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। এই শক্তি অর্জনের জন্য জাহ্ ও মালের যগপৎ সাহায্য আবশ্যক হয়। উহার ফলে আহারাদি, লেবাস-পোশাক এবং জীবন ধারণের অপরাপর আবশ্যকীয় উপকরণসমূহ লাভ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই সব জীবনোপকরণ দ্বারা মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উপকৃত হইতে পারে। এখন কোন ব্যক্তি যদি এইসব উপকরণসমূহ আল্লাহর মা'রেফাত হাসিলের কাজে ব্যবহার না করে, তবে উহা দ্বারা যেন সে কোনভাবেই উপকৃত হইতে পারিল না। সে হয়ত কিছু দিন উহার স্বাদ ভোগ করিতে পারিবে বটে কিন্তু অচিরেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। এই সাময়িক উপকারকে যাহারা পূর্ণতা ও চূড়ান্ত সাফল্য মনে করিবে, তাহারা প্রকৃত অর্থেই জাহেল ও মূর্খ। অধিকাংশ মানুষই এই জেহালাতের অতল গহবরে নিপতিত হইয়া বরবাদ হইতেছে। তাহারা মনে করে শারীরিক সামর্থ্য, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা আদায় করার নামই পূর্ণতা ও সাফল্য। এই অলীক ধারণা যখন বিশ্বাসে পরিণত হয় তখন তাহারা উহাকে মোহাব্বত করিতে থাকে এবং উহার

পিছনেই মেহনত শুরু করে। এইভাবেই তাহারা একটি অলীক ও অবাস্তব অবস্থার পিছনে পড়িয়া বরবাদ হয় এবং প্রকৃত সাফল্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আল্লাহর নৈকট্য হইতে বঞ্চিত হয়। এই প্রকৃত সাফল্যই হইল উৎকর্ষ পর্যায়ের এলেম ও আজাদী। এলেম সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা 'আজাদী' প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

আজাদী বা মুক্তির মর্ম হইল– যাবতীয় কামনা-বাসনা ও পার্থিব বালা-মুসীবতের পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া ফেরেশতাদের মত সেইসবের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করিয়া উহা বশে আনা। অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে যেমন কোনরূপ কামনা-বাসনা ও কাম ক্রোধ ইত্যাদির কোন কিছুই বিভ্রান্ত করিতে পারে না, তদ্রূপ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেকেও সেই অবস্থায় উন্নীত করা। বস্তুতঃ কাম ও ক্রোধ হইতে নিজকে মুক্ত করার নামই প্রকৃত পূর্ণতা ও সাফল্য এবং ইহাই ফেরেশতাসুলভ বৈশিষ্ট্য। খোদায়ী সিফাতের বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহার উপর কোনরূপ তাগাইউর ও পরিবর্তন আরোপিত করা যায় না এবং কোন বস্তুও তাঁহার উপর কোনরূপ ক্রিয়া করিতে পারে না। সুতরাং যেই ব্যক্তি যাবতীয় উপসর্গের প্রভাব এবং সতত পরিবর্তন ও অস্থিতিশীলতা হইতে যেই পরিমাণ বিমুক্ত থাকিবে, সেই পরিমাণেই সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিবে এবং ফেরেশতাদের সহিত সাদৃশ্যতা অর্জন করিতে পারিবে। ইতিপূর্বে আলোচিত এলেম ও ক্ষমতার পূর্ণতার বাহিরে ইহা এক তৃতীয় সাফল্য ও পূর্ণতা।

কাম-প্রবৃত্তির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা এবং উহার আনুগত্য না করাকে যদি পূর্ণতা বলা হয়, তবে উহাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইবে। ১. কামালে এলম বা এলমী পূর্ণতা। ২. কামালে হুরমত বা কামনা-বাসনা এবং পার্থিব উপসর্গের গোলামী না করা। ৩. কামালে কুদরত বা ক্ষমতার পূর্ণতা। তো বান্দার পক্ষে কামালে এলম ও কামালে হুরমত অর্জন করা সম্ভব বটে কিন্তু কামালে কুদরত বা ক্ষমতার ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জন করা বান্দার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নহে। কেননা, সাময়িক জীবন শেষে মৃত্যুর পর তাহার কোন ক্ষমতাই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এলেম ও হুরমতের ধারা এবং উহার সুফল মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষমতাও নিঃশেষ হইয়া যায়। সেই ক্ষমতা চাই আর্থিক, শারীরিক বা জনবল সংক্রান্তই হউক। অথচ জাহেল লোকেরা জাহ্ ও মালের পিছনে অবিরাম মেহ্নত করিতেছে এবং উহার মাধ্যমে কামালে কুদরত বা ক্ষমতার পূর্ণতা অর্জন করিতে চাহিতেছে। কিন্তু তাহারা কোন দিনই এইরূপ ক্ষমতার নাগাল পাইবে না এবং ইহা কোন দিন স্থায়ীও হইবে না। অথচ তাহারা যেই এলেম ও হুরমতকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে এই এলেম ও হুরমতই হইতে পারিত তাহাদের স্থায়ী সম্পদ এবং মৃত্যুর পরও উহা তাহাদের সঙ্গে অব্যাহত

থাকিত। ইহারা যেন নিম্নোক্ত আয়াতেরই প্রতিচ্ছবি–

أولئك الذين اشتروا الحيوة الدنيا بالاخرة، فلا يخفف عنهم العذاب و لا هم ينصرون =

অর্থঃ "ইহারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করিয়াছে। অতএব, ইহাদের শাস্তি লঘু হইবে না এবং ইহারা সাহায্যও পাইবে না।"

(সূরা বাকারাঃ আয়াত ৮৬)

এই শ্রেণীর লোকেরা নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করে নাই–

المال و البنون زينة الحيوة الدنيا، و البقيت الصلحت خير عند ربك ثوابا و خير املا =

অর্থঃ "ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার নিকট প্রতিদানপ্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম।" (সূরা কাহ্ফঃ আয়াত ৪৬)

বস্তুতঃ এলেম ও হুরমতই হইল "বাক্বিয়াতুস্ সালিহাত" বা স্থায়ী সৎকর্ম যাহা মানবাত্মায় স্থায়ী হয়। আর জাহ্ ও মাল হইল এমন দ্রুত বিলিয়মান বস্তু যাহা মানুষের কোন কল্যাণ করিতে পারে না। নিম্নোক্ত আয়াতে উহার যথার্থ উদাহরণ বিবৃত হইয়াছে–

انما مثل الحيوة الدنيا كماء انزلنه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس و الانعام، حتى اذا اخذت الارض زخرفها و ازينت و ظن اهلها انهم قادرون عليها، اتها امرنا ليلا او نهارا فجعلنها حصيدا كان لم تغن بالامس، كذلك نفصل الايت لقوم يتفكرون *

অর্থঃ "পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমন আমি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিলাম, পরে তাহা মিলিত-সংমিশ্রিত হইয়া তাহা হইতে জমিনের শ্যামল উদ্ভিদ বাহির হইয়া আসিল যাহা মানুষ ও জীব-জন্তুরা খাইয়া থাকে। এমনকি জমিন যখন সৌন্দর্য-সুষমায় ভরিয়া উঠিল আর জমিনের অধিকর্তাগণ ভাবিতে লাগিল, এইগুলি আমাদের হাতে আসিবে, হঠাৎ করিয়া তাহার উপর আমার নির্দেশ আসিল রাতে কিংবা দিনে, তখন সেইগুলিকে কাটিয়া স্তুপাকার করিয়া দিল যেন কালও এখানে কোন আবাদ ছিল না, এমনিভাবে আমি খোলাখুলি বর্ণনা করিয়া থাকি নিদর্শনসমূহ সেই সমস্ত লোকদের জন্য যাহারা

লক্ষ্য করে।" (সূরা ইউনুসঃ আয়াত ২৪) অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ، وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

অর্থঃ "তাহাদের নিকট পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তাহা পানির ন্যায়, যাহা আমি আকাশ হইতে নাজিল করি। অতঃপর ইহার সংমিশ্রণে শ্যামল-সবুজ ভূমিজ লতাপাতা নির্গত হয়, অতঃপর তাহা এমন শুষ্ক চুর্ণ-বিচুর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়িয়া যায়। আল্লাহ পাক এই সবকিছুর উপর শক্তিমান।" (সূরা কাহ্‌ফঃ আয়াত ৪৫)

যেই সকল বস্তু মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, উহাই ভোগের সামগ্রী। আর মৃত্যুর পরও যাহা মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না, উহা হইল 'বাক্বিয়াতুস্ সালিহাত' বা স্থায়ী সৎ কর্ম। এই আলোচনা দ্বারা এই বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, জাহ্ ও মাল দ্বারা উপার্জিত ক্ষমতাকে পূর্ণতা ও সাফল্য মনে করা একেবারেই অর্থহীন। যেই ব্যক্তি উহাকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক উহার পিছনে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করে, সে যথার্থই জাহেল।

অবশ্য এই ক্ষেত্রে সেই সকল ব্যক্তিদের কথা আলাদা, যাহারা জাহ্ ও মালকে কেবল প্রয়োজন পরিমাণ ব্যবহার করিয়াছে এবং প্রকৃত সাফল্যের পথে ঐগুলিকে একটা অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। আয় আল্লাহ! আপনি নিজ ফজল ও করমে আমাদিগকে খায়ের ও হেদায়েত দান করুন। আমীন!

জাহ প্রিয়তার মন্দ দিক ও ভাল দিক

ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে, জাহ্ শব্দের অর্থ হইতেছে, মানুষের অন্তরের মালিক হওয়া বা নিজের কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব দ্বারা মানুষের অন্তরকে জয় করিয়া লওয়া। সুতরাং এই জাহ্ এর হুকুমও ধন-সম্পদের হুকুমের মতই হইবে। কেননা, মাল বা সম্পদ দ্বারা যেমন পার্থিব উদ্দেশ্য সমূহ পূরণ করা হয়, তদ্রূপ জাহ্ দ্বারাও পার্থিব চাহিদা মিটানো হয় এবং মালের মত ইহাও মৃত্যুর মাধ্যমে নিঃশেষ হইয়া যায়।

দুনিয়া হইল আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং দুনিয়াতে উৎপন্ন বস্তু হইতেই আখেরাতের পাথেয় গ্রহণ করিতে হইবে। দুনিয়াতে খানাপিনা ও লেবাস-পোশাকের জন্য যেমন মাল বা অর্থের প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ সমাজে ইজ্জতের সহিত বসবাসের জন্যও কিছু জাহ বা সুনাম-সুখ্যাতি ও সম্মানের প্রয়োজন হয়।

জীবন ধারণের জন্য খাদ্য গ্রহণ একটি অপরিহার্য কর্ম। এই কারণে মানুষ

খাদ্যকে মোহাব্বত করে বা যেই অর্থ দ্বারা খাদ্য ক্রয় করা হয় উহাকে মোহাব্বত করে। তো জীবনে চলার পথে অপরাপর মানুষের সাহায্যও দরকার হয়। যেমন খেদমতের জন্য একজন খাদেম, সাহায্যের জন্য একজন বন্ধু, পথপ্রদর্শনের জন্য একজন উস্তাদ এবং নিরাপত্তার জন্য একজন শাসক– ইত্যাদি। এখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি এইরূপ কামনা করে যে, খাদেমের মনে তাহার প্রতি কিছুটা ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকুক যেন সে মন দিয়া সেবা করে, বন্ধুর মনে তাহার প্রতি মোহাব্বত ও ভালবাসা থাকুক যেন সে প্রয়োজনের সময় আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে, তবে ইহাকে খারাপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। অনুরূপভাবে উস্তাদের মনে শিষ্যের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহবোধ বিদ্যমান থাকা যেন তিনি উত্তমরূপে তা'লীম-তরবিয়ত করেন বা দুষ্ট লোকের অনিষ্ট হইতে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে শাসকের অন্তরে কিছুটা স্থান করিয়া লওয়া– ইত্যাদি বিষয়গুলিও ক্ষতিকারক নহে। এই আলোচনা দ্বারা দেখা যাইতেছে, জাহ্ ও মাল হইল পার্থিব উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম এবং এই হিসাবে এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

তবে এই ক্ষেত্রে যেই অবস্থাটি একান্তই বাস্তব তাহা হইল, জাহ্ ও মাল তথা যশ-খ্যাতি ও ধন-সম্পদ সরাসরি কাম্য হওয়া উচিৎ নহে। বরং উহাকে মূল উদ্দেশ্যের সহায়ক হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। উহার উদাহরণ যেন এইরূপ– এক ব্যক্তি মল ত্যাগের উদ্দেশ্যে ঘরে একটি শৌচাগার নির্মাণ করা উত্তম মনে করিতেছে। তাহার মনোভাব হইল, যদি মল ত্যাগের প্রয়োজন না হয়, তবে ঘরে শৌচাগার রাখিবে না। এমতাবস্থায় তাহার সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করা যাইবে না যে, লোকটি শৌচাগারকে মোহাব্বত করে। বরং লোকটির প্রকৃত অবস্থা হইল– মল ত্যাগ করা তাহার মূল লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হিসাবেই সে শৌচাগার নির্মাণ উত্তম মনে করিয়াছে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তাহার প্রার্থিত ও প্রিয় বস্তুর মাধ্যমকে মোহাব্বত করিলেই এমন মনে করা যাইবে না যে, সে ঐ মাধ্যমকে মোহাব্বত করিতেছে। বরং তাহার প্রিয় বস্তুর মাধ্যম হওয়ার কারণেই সে উহাকে মোহাব্বত করিতেছে– যাহা প্রকারান্তরে সেই প্রিয় বস্তুর মোহাব্বতই বটে। নিম্নের উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি আরো ভালভাবে উপলব্ধি করা যাইবে–

মনে কর, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে এই কারণে মোহাব্বত করে যে, কাম-উত্তেজনার সময় সে তাহার খাহেশ পূরণ করিয়া দেয়– যেমন শৌচাগার মল ত্যাগের চাহিদা পূরণ করে। এই ব্যক্তির যদি যৌন উত্তেজনা না থাকিত, তবে সে তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া দিত। যেমন পায়খানার হাজত না হইলে সে ঘরে শৌচাগার রাখিত না। অর্থাৎ স্ত্রীকে মোহাব্বত করে কাম-চাহিদার জন্য এবং শৌচাগারকে মোহাব্বত করে মল ত্যাগের জন্য। আবার কতক

লোক এমনও আছে যাহারা স্ত্রীর রূপ-লাবণ্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাহার জন্য এমনভাবে পাগলপরা হইয়া থাকে যে, কাম-চাহিদা না থাকিলেও কখনো তাহারা স্ত্রীকে তালাক দেয় না। তো স্ত্রীর জন্য এই দ্বিতীয় প্রকারের মোহাব্বতই হইল প্রকৃত মোহাব্বত– প্রথম প্রকারের মোহাব্বতকে প্রকৃত মোহাব্বত বলা যাইবে না। জাহ্ ও মাল তথা যশ-খ্যাতি ও ধন সম্পদের অবস্থা ও তদ্রূপ। ঐগুলিকেও অনুরূপ দুই অবস্থায় মোহাব্বত করা হয়। সেমতে জাহ্ ও মালকে যদি দৈহিক চাহিদা পূরণের মাধ্যম হিসাবে মোহাব্বত করা হয়, তবে তাহা নিন্দনীয় নহে। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যমে হউক বা না হউক– এমনিই যদি ঐ গুলিকে মোহাব্বত করা হয়, তবে তাহা নিন্দনীয় নহে। তবে জাহ্ ও মাল যদি কোনরূপ গোনাহের কাজে ব্যবহার করা না হয় এবং উহা অর্জনের ক্ষেত্রে যদি মিথ্যা-প্রতারণা ও হারাম উপায় অবলম্বন করা না হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফাসেক বলা যাইবে না। জাহ্ ও মাল অর্জনের জন্য কোন এবাদতকেও মাধ্যম বানানো যাইবে না। কেননা, এবাদতের মাধ্যমে ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করা একটি ধর্মীয় অপরাধ এবং ইহা সুস্পষ্টরূপেই হারাম।

প্রসঙ্গঃ মানুষের অন্তরে আসন স্থাপন

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, খাদেম, বন্ধু, উস্তাদ ও শাসকের অন্তরে আসন স্থাপনের কোন নির্দিষ্ট সীমা আছে কি-না? এই প্রশ্নের জবাব হইল– তাহাদের অন্তরে তিন উপায়ে আসন স্থাপিত হইতে পারে। উহার মধ্যে দুইটি উপায় বৈধ এবং একটি উপায় অবৈধ। অবৈধ উপায় হইল– অপরকে এমন গুণের ভক্ত করা যাহা নিজের মধ্যে বর্তমান নহে। যেমন তাহাকে বলা যে, আমি আলেম-পরহেজগার কিংবা সৈয়্যদ বংশের লোক ইত্যাদি। এই দাবী মিথ্যা ও প্রতারণা হওয়ার কারণে ইহা অবৈধ ও হারাম।

বৈধ দুইটি উপায়ের একটি হইল– নিজের মধ্যে যেই গুণ ও যোগ্যতা আছে উহা প্রকাশ করিয়া উহার উপযোগী মর্যাদা প্রার্থনা করা। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম মিসরের শাসনকর্তাকে বলিয়াছিলেন–

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ، اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ =

অর্থঃ “ইউসুফ বলিলঃ আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।” (সূরা ইউসুফঃ আয়াত ৫৫)

এখানে তিনি নিজেকে উত্তম রক্ষক ও বিজ্ঞ হিসাবে জাহির করিয়া শাসনকর্তার অন্তরে আসন স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন– যাহা বাস্তবেও তাহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

আরেকটি উপায় হইল, নিজের কোন অপরাধ ও দোষ ত্রুটি গোপন রাখা যেন অপরের দৃষ্টিতে হেয় হইতে না হয়। ইহা মোবাহ ও জায়েয। কেননা, পাপকর্ম গোপন রাখা জায়েজ এবং উহা অপরের নিকট প্রকাশ করা না জায়েয। অপরাধ ও গোনাহ গোপন করার মধ্যে কোন প্রতারণা নাই। তাছাড়া এই পদ্ধতিটি এমন সব বিষয় অবগত হওয়ার পথ রুদ্ধ করিয়া দেয় যাহা জানার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। যেমন এক ব্যক্তি বাদশাহর নিকট হইতে নিজের মদ পানের কথা গোপন করিতেছে। কিন্তু নিজের এই ত্রুটি গোপন করা দ্বারা তাহার মনে এমন বিশ্বাস পয়দা হইতেছে না যে, আমি একজন মোত্তাকী ও পরহেজগার। অর্থাৎ সে যদি এইরূপে বলিত যে, আমি মদ্যপ নহি এবং আমি একজন ধার্মিক, তবে এই দাবীতে সে মিথ্যাবাদী হইত। মদ পানের কথা স্বীকার না করা– তাকওয়ার বিশ্বাস সৃষ্টি করে না। ইহা দ্বারা বড়জোর এতটুকু করা হয় যে, মদ পান করার কথা অপরের নিকট হইতে গোপন করা হয়।

মানুষের অন্তরে ভক্তি পয়দা করার জন্য উত্তমরূপে নামাজ পড়া ইহাও অবৈধ উপায়ের মধ্যে গণ্য। কেননা, ইহা সুস্পষ্টরূপেই রিয়া। আর লোকদেখানো রিয়া প্রকৃত অর্থেই প্রতারণা। কারণ, যেই ব্যক্তি তাহার এই উত্তম নামাজ অবলোকন করে, সে মনে করে, এই ব্যক্তি নেহায়েত এখলাস ও খুশু-খুজুর সহিত নামাজ পড়িতেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে করিতেছে রিয়া। এখলাস ও খুশু-খুজুর সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। এইভাবে জাহ্ ও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করা হারাম। এই উদাহরণটির উপর অপরাপর গোনাহসমূহ কেয়াস করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করা যেমন হারাম, তদ্রূপ অবৈধ উপায়ে জাহ্ ও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করাও হারাম। কাহারো সঙ্গে প্রতারণা করিয়া তাহার সম্পদ দখল করা যেমন জায়েয নহে, তদ্রূপ প্রতারণার মাধ্যমে কাহারো অন্তরে আসন স্থাপন করাও জায়েয নহে। কাহারো অন্তরের মালিক হওয়া, সম্পদের মালিক হওয়া অপেক্ষা গুরুতর।

প্রশংসায় আনন্দ ও নিন্দায় অসন্তুষ্ট হওয়া

প্রশংসায় আনন্দিত হওয়ার কারণ

মানুষ যেই সকল কারণে অপরের মুখে নিজের প্রশংসা শুনিয়া আনন্দিত হয়, সেই কারণগুলি চারি প্রকার–

প্রথম কারণ

অপরের মুখে প্রশংসা শুনিয়া প্রফুল্ল হওয়ার প্রথম কারণটিই সর্বাধিক প্রবল ও শক্তিশালী। সেই কারণটি হইল, অপরের মুখে প্রশংসা শুনিয়া মন জানিতে

পারে যে, সে বিশেষ কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার অধিকারী। ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি, কোন বিষয়ে পূর্ণতা ও যোগ্যতা অর্জন স্বভাবতই মানুষের নিকট প্রিয় হইয়া থাকে এবং যে কোন যোগ্যতা ও পূর্ণতা হাসিল হইলেই মানুষ এক প্রকার আত্মসুখ অনুভব করে। সুতরাং মন যখন নিজের কোন কামাল ও যোগ্যতার কথা জানিতে পারে তখন সে কিযে আনন্দ অনুভব করে তাহা বলিয়া বুঝাইবার মত নহে।

মানুষ নিজের যোগ্যতার কথা তখনই জানিতে পারে যখন অপরের মুখে নিজের প্রশংসার কথা শুনিতে পায়। যেই গুণটির কথা উল্লেখ করিয়া তাহার প্রশংসা করা হয়, সেই গুণটি অনেক সময় এমনও হয় যাহা প্রকাশ্য ও সর্বজন বিদিত। আবার অনেক সময় সেই গুণটি নিজের নিকট সন্দেহযুক্তও হয়। তো নিজের কোন প্রকাশ্য গুণের কথা শুনিলে আনন্দ কিছুটা কম হয়। যেমন কাহারো সম্পর্কে হয়ত বলা হইল, তুমি বেশ লম্বা এবং তোমার গায়ের রংও ফর্সা। এখন তাহার এই গুণটি যদিও প্রকাশ্য ও সর্বজন বিদিত এবং সেই ব্যক্তি নিজেও তাহার ঐ গুণ সম্পর্কে অবগত, কিন্তু ঐ গুণের কথা সকল সময় মনে হাজির থাকে না। যখন সেই গুণের কথা জানিতে পারে বা স্মরণে আসে, তখন আনন্দ অনুভূত হয়।

পক্ষান্তরে নিজের কোন সন্দেহযুক্ত গুণ সম্পর্কে যদি অপর কেহ প্রশংসা করে, তবে উহার ফলে সে এমন এক আত্মিক সুখ ও পুলক অনুভব করে যে, উহার সঙ্গে অপর কোন আনন্দের তুলনা হইতে পারে না। উদাহরণতঃ কাহারো প্রশংসা করিয়া হয়ত বলা হইল- তুমি একজন বড় আলেম ও পরহেজগার এবং তোমার দৈহিক রূপেরও কোন অন্ত নাই- ইত্যাদি। তো মানুষ নিজের এলেম ও পরহেজগারী সম্পর্কে সর্বদা একটা সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে এবং সে ইহা কামনা করে যেন কোন উপায়ে তাহার এই সন্দেহ দূর হইয়া নিজের গুণটি নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়। সেই সঙ্গে সে ইহাও কামনা করে যেন অপর কেহ তাহার এই গুণের মোকাবেলা করিতে না পারে। যখন অপর কোন ব্যক্তি তাহার সেই গুণ সম্পর্কে আলোচনা করে এবং তাহার প্রশংসা করে, তখন সেই গুণ সম্পর্কে মনে এতমিনান ও এক্বীন পয়দা হয় যে, যথার্থই আমি সেই গুণের অধিকারী। অর্থাৎ এইভাবেই তাহার মনে এক অনাবিল আত্মসুখ অনুভব হয়। বিশেষতঃ যখন কোন জ্ঞানী-গুণী, আলেম, পরহেজগার ও দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী ব্যক্তির মুখে এই প্রশংসা শোনা হয় কিংবা এমন ব্যক্তির মুখে যিনি সত্যাসত্য যাচাই না করিয়া নিজের মুখ হইতে একটি কথাও বাহির করেন না- তখন এই আনন্দ আরো অধিক মাত্রায় অনুভূত হয়। উদাহরণ স্বরূপ- কোন উস্তাদ যদি তাহার কোন ছাত্রের জেহেন ও মেধার প্রশংসা করে, তবে সেই ছাত্রের আনন্দের কোন সীমা থাকে না। অথচ এই প্রশংসাই যদি

এমন কোন ব্যক্তির মুখ হইতে শোনা হয় যেই ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করিয়া কথা বলিতে অভ্যস্থ নহে এবং মানুষের জেহেন ও মেধা সম্পর্কে যার কোন ধারণা নাই- তবে এই ক্ষেত্রে এতটা আনন্দ অনুভব হয় না।

অপরের মুখে নিজের নিন্দা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণও ইহাই যে, অপরের মুখে নিন্দা শুনিয়া নিজের অপরাধের কথা জানা হয় এবং এই জানার কারণে নিজের মনে কষ্ট অনুভব করে। আর এই নিন্দা যখন কোন জ্ঞানী-গুণী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মুখে শোনা হয়, তখন কষ্টের মাত্রাও অধিক হয়।

দ্বিতীয় কারণ

দ্বিতীয় কারণ হইল, কোন মানুষ যখন কাহারো প্রশংসা করে তখন ইহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয় যে, প্রশংসাকারী ব্যক্তি প্রশংসিত ব্যক্তির ভক্ত-অনুরক্ত এবং তাহার অন্তরও সেই ব্যক্তির মালিকানাধীন। কাহারো অন্তরের মালিকানা লাভ করা ইহা সকলের নিকটই প্রিয় ও পছন্দনীয়। কেননা, যখন সে ইহা জানিতে পারিবে যে, প্রশংসাকারী ব্যক্তি তাহার একান্ত অনুগত এবং সে যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবেই তাহাকে ব্যবহার করিতে পারিবে, তখন নিশ্চিতরূপেই সে আনন্দিত হইবে। বিশেষতঃ প্রশংসাকারী ব্যক্তি যদি বিশেষ ক্ষমতাবান হয় যেমন- কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি, বিচারক বা দেশের শাসক- তবে আনন্দ আরো বেশী হইবে। কেননা, এই ক্ষেত্রে তাহাদের দ্বারা অধিক লাভবান হওয়ার প্রত্যাশা করা হইবে।

পক্ষান্তরে প্রশংসাকারী ব্যক্তি যদি সমাজের কোন নগণ্য ও হীন ব্যক্তি হয়, যার কথার কোন মূল্য নাই এবং যেই ব্যক্তি অপর কাহাকেও সাহায্য করিবার কোন ক্ষমতা রাখে না, তবে সেই ক্ষেত্রে আনন্দের মাত্রাও অতি নগণ্য হইবে। কেননা, এইরূপ ব্যক্তির আনুগত্য একেবারেই মূল্যহীন এবং তাহার পক্ষ হইতে কোন ভাবেই উপকৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। অনুরূপভাবে নিন্দা অপছন্দনীয় হওয়া এবং উহা দ্বারা অন্তর ব্যথিত হওয়ার কারণও ইহাই যে, নিন্দাকারী ব্যক্তির অন্তর আমার মালিকানাধীন নহে এবং সে আমার ভক্ত-অনুরক্ত বা আমার ইচ্ছার অনুগামী নহে। আর এই ক্ষেত্রে নিন্দাকারী ব্যক্তি যেই পরিমাণ ক্ষমতাবান বা ক্ষমতাহীন হইবে, সেই অনুপাতেই তাহার নিন্দার কারণে কষ্ট কম বা বেশী হইবে।

তৃতীয় কারণ

কোন ব্যক্তি অপর কাহারো প্রশংসা করিলে উহার ফলে কেবল তাহার অন্তরই প্রশংসিত ব্যক্তির অনুগত হয় না; বরং এমন হওয়াও সম্ভব যে, এই প্রশংসা শুনিয়া অপরাপর লোকেরাও প্রশংসিত ব্যক্তির অনুগত ও ভক্ত হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ প্রশংসাকারী লোকটি যদি এমন কোন মান্যবর ব্যক্তি হয়

যার কথা লোকেরা গুরুত্ব দেয়, তবে এই ক্ষেত্রে তাহার কথায় অধিক তাছীর হইবে। তবে এই জন্য শর্ত হইল, প্রশংসা জনসম্মুখে হইতে হইবে। সমাবেশ যত বড় হইবে এবং প্রশংসাকারী ব্যক্তি যত মান্যবর হইবে আনন্দও সেই পরিমাণে বেশী হইবে। উহার বিপরীতে যদি নিন্দা করা হয়, তবে সেই অনুপাতেই কষ্ট অনুভব হইবে।

চতুর্থ কারণ

প্রশংসা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, প্রশংসিত ব্যক্তি একজন প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমতা ও প্রভাবের কারণেই তাহার প্রশংসা করা হয়। এই প্রশংসা চাই স্বেচ্ছায় করা হউক বা তাহার ভয় ও প্রভাবের কারণেই করা হউক। যদি ভয়ের কারণে করা হয় তবে সেই ক্ষেত্রেও তাহার শক্তিমত্তা ও প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। স্বেচ্ছায় প্রশংসা করিলে যেমন আনন্দ অনুভব হয়, তদ্রূপ ভয়ের কারণে প্রশংসা করা হইলেও অন্তরে আনন্দ অনুভব হয়। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে প্রশংসিত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের দীনতা-হীনতা ও ভীতিভাব এবং উহার বিপরীতে নিজের শক্তিমত্তা ও প্রাধান্যের কল্পনায় পুলক অনুভব করে। এমতাবস্থায় প্রতিপক্ষ যত দুর্বল হইবে সেই অনুপাতেই সে আনন্দ অনুভব করিবে।

উপরে বর্ণিত প্রশংসার চারিটি কারণ যদি একই ব্যক্তির মধ্যে একই সময় পাওয়া যায়, তবে এই ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের আনন্দ অনুভব হইবে। আর প্রশংসার এইসব উপকরণ যেই হারে কম হইবে আনন্দও সেই হারে কম হইবে।

বর্ণিত কারণ সমূহের চিকিৎসা

প্রথম কারণটির চিকিৎসা এইভাবে হইতে পারে যে, প্রশংসিত ব্যক্তি এই বাস্তবতাকে বিশ্বাস করিবে যে, প্রশংসাকারী ব্যক্তি যাহা বলিতেছে তাহা সত্য নহে। যেমন সেই ব্যক্তি এইরূপ বলিল– আপনি একজন উচ্চ বংশের লোক, আপনি আলেম, দানশীল এবং আপনি যাবতীয় মন্দ কর্ম হইতে পবিত্র– ইত্যাদি। অথচ যাহার প্রশংসা করা হইল সেই ব্যক্তি ইহা ভাল করিয়াই জানে যে, আসলে আমি এইরূপ নহি। বরং উহার বিপরীত অবস্থাই আমার মধ্যে বিদ্যমান। মনে মনে এইরূপ চিন্তা আসার পর যোগ্যতা ও পূর্ণতার অনুভূতির কারণে মনে যেই আনন্দ অনুভূত হয় তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অতঃপর কেবল এমন আনন্দ অবশিষ্ট থাকিবে যাহা প্রভাব ও ক্ষমতার কারণে মানুষের অন্তর ও জবান হইতে অর্জিত হয়। এই পর্যায়ে প্রশংসিত ব্যক্তি যদি মনে করে– প্রশংসাকারী ব্যক্তি যাহা বলিতেছে, মনে প্রাণে কিন্তু সে তাহা বিশ্বাস করে না এবং আমি নিজেও তাহার বর্ণিত গুণাগুণ হইতে বঞ্চিত– তবে এই দ্বিতীয়

আনন্দও (ক্ষমতা ও প্রভাবের কারণে কাহারো অন্তর প্রভাবিত হইয়া তাহার পক্ষ হইতে প্রশংসা প্রাপ্তির পর যেই আনন্দ অর্জিত হয় তাহাও) নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অবশেষে কেবল একটি আনন্দ অবশিষ্ট থাকিবে যাহা মানুষের মুখ প্রভাবিত হওয়ার কারণে অর্জিত হয়। অর্থাৎ এই অনুভূতির আনন্দ অবশিষ্ট থাকিবে যে, প্রশংসাকারী ব্যক্তি আমার ভয়ে মুখে মুখে আমার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইতেছে। পক্ষান্তরে এই প্রশংসা যদি সুবিবেচনার সহিত করা না হয়, অর্থাৎ নিছক তামাশা করিয়া করা হয়; তবে বর্ণিত সমস্ত আনন্দই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। কেননা, এই ক্ষেত্রে আনন্দ প্রাপ্তির উপাদানের একটিও আর অবশিষ্ট রহিল না।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, প্রশংসা দ্বারা অন্তরে আনন্দ এবং নিন্দা দ্বারা দুঃখ অনুভব হয় কেন আমরা এই কারণে প্রসঙ্গটির অবতারণা করিলাম যেন প্রশংসার মোহাব্বত এবং নিন্দার কারণে দুঃখানুভবের চিকিৎসা জানা যায়। কারণ, যতক্ষণ কোন রোগের কারণ জানা না যাইবে, ততক্ষণ উহার সুচিকিৎসা হওয়া সম্ভব নহে। রোগের কারণ দূর করাই হইল চিকিৎসার মূল কথা।

যশপ্রীতির চিকিৎসা

যেই ব্যক্তি অন্তরে প্রবল ভাবে "হোব্বে জাহ্" পোষণ করে এবং যশ-খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট, সেই ব্যক্তি অনুক্ষণ মানুষের সুদৃষ্টি অর্জনের জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা চালাইতে থাকে। সকল কথায় ও কাজে তাহার লক্ষ্য থাকে যেন মানুষের মাঝে তাহার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাইয়া সকলের অন্তরে তাহার তাজীম ও সম্মান বদ্ধমূল হয়। বস্তুতঃ মানুষের এই কর্মটিই সকল অনিষ্টের মূল। উহার ফলে এবাদতে আলস্য পয়দা হয় এবং ক্ষেত্রে বিশেষে মানুষের অন্তর আকৃষ্ট করার জন্য হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মে জড়াইয়া পড়িতে হয়। এই কারণেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

حب الشرف و المال ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل

অর্থঃ "গৌরব ও ধন-সম্পদের মোহ নিফাক উৎপন্ন করে, যেমন পানি শাক-সব্জি উৎপন্ন করে।"

নেফাক অর্থ কপটতা বা মানুষের ভিতর-বাহির এবং কথা ও কাজের বৈপরীত্য। সুতরাং যেই ব্যক্তি মানুষের নিকট সুখ্যাত ও সম্মানের পাত্র হইতে আগ্রহী হয়, সেই ব্যক্তি সকলের সঙ্গে মোনাফেকী আচরণ করিতে বাধ্য হয়। কৃত্রিম সে মানুষের সঙ্গে এমন সব আচরণ করিবে যাহা বাস্তবে তাহার স্বভাবে

অনুপস্থিত। ইহা নির্ভেজাল মোনাফেকী ছাড়া আর কিছুই নহে। হোব্বে জাহ্ তথা যশপ্রীতি মানবাত্মার এক সর্বনাশ ব্যাধি। সুতরাং এই ধ্বংসাত্মক ব্যাধির চিকিৎসা হওয়া জরুরী। এই ব্যাধিটিও ধন-সম্পদের মোহাব্বতের মত এক মজ্জাগত ব্যাধি। উহার চিকিৎসা এলমী ও আমলী– এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত। নিম্নে আমরা পৃথক শীরোনামে উহার বিবরণ পেশ করিব।

যশপ্রীতির এলমী চিকিৎসা

হোব্বে জাহ্ তথা যশপ্রীতির এলমী চিকিৎসা হইল, প্রথমেই সেই কারণটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাহা মানুষকে যশপ্রীতি ও সুনাম-সুখ্যাতির প্রতি আকৃষ্ট করে। বলাবাহুল্য সেই কারণটি হইল মানুষের দেহ ও মনের উপর ক্ষমতা অর্জন করা। ইতি পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষ যদি এই ক্ষমতা অর্জন করিতে সক্ষম হয়ও, তথাপি উহার শেষ পরিণতি হইল মৃত্যু। মৃত্যুর মাধ্যমে এই ক্ষমতার চির অবসান ঘটে। ইহা "বাক্বিয়াতুস্ সালিহাত" বা স্থায়ী কর্ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে যে, মৃত্যুর পরও উহার কার্যকারীতা অব্যাহত থাকিবে। মনে কর, ভূপৃষ্ঠের সকল মানুষ যদি তোমার সম্মুখে আসিয়া সেজদায় লুটাইয়া পড়ে এবং ক্রমাগত পঞ্চাশ বৎসর তাহারা মস্তক উত্তোলন না করে; তবুও না সেজদাহকারীগণ জীবিত থাকিবে, না তুমি চির অমর হইবে। একবার ভাবিয়া দেখ, এই পৃথিবীতে এমন বহু রাজা-বাদশাহ ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন যাহাদের সংখ্যার কোন সীমা-পরিসীমা নাই। যাহাদের খ্যাতি ছিল দুনিয়া জোড়া, তাহাদের সংখ্যাও নিরূপন করিবার মত নহে। কিন্তু বর্তমানে তাহাদের সকল কিছু মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। একদিন তোমাকেও অনুরূপ পরিণতির শিকার হইতে হইবে। সুতরাং তুচ্ছ দুনিয়ার পিছনে পড়িয়া দ্বীনের মত অমূল্য সম্পদ বর্জন করা বুদ্ধি মানের কাজ নহে। পারলৌকিক জীবনই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। সেই জীবনের সাফল্যই পরম সাফল্য। এমন জীবন, যেই জীবনের সূচনা আছে– শেষ নাই। সেই সুখময় জীবনে একবার প্রবেশ করিতে পারিলে আর কখনো তোমাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। যেই ব্যক্তি প্রকৃত সাফল্য ও কাল্পনিক সাফল্যের হাকীকত উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তির নিকট দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সুনাম-সুখ্যাতির কিছুমাত্র মূল্য নাই। সেই ব্যক্তি বরং সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

একদা হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ)-কে লিখিলেনঃ "মানুষের এমন মনে করা উচিৎ যেন আমার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে।" এই কথার জবাবে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) লিখিলেনঃ "আমাদের তো এমন মনে করা উচিৎ যেন দুনিয়াতে আমাদের আগমনই হয় নাই; আমরা যেন পরকালেই অবস্থান করিতেছি।"

অর্থাৎ তাঁহাদের মন-মানস ও চিন্তা-চেতনার সকল কিছু জুড়িয়া যেন পরকালই বিরাজমান ছিল। এই কারণেই তাঁহাদের আমল ছিল পরিপূর্ণ তাকওয়ার স্তরে। কারণ, তাঁহারা এই কথা ভাল করিয়াই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পারলৌকিক সাফল্য মোত্তাকীগণের জন্যই সংরক্ষিত। সুতরাং পার্থিব ধন-সম্পদ ও সুনাম-সুখ্যাতি তাঁহাদের নিকট ছিল একেবারেই মূল্যহীন ও তুচ্ছ বস্তু।

দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টি যেহেতু স্থুল, এই কারণে তাহারা কেবল দুনিয়ার আকর্ষণেই মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাদের স্থুল দৃষ্টি শেষ পরিণাম প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى =

অর্থঃ "বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।" (সূরা আল আ'লাঃ আয়াত ১৬, ১৭)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ =

অর্থঃ "কখনো না, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস, এবং পরকালকে উপেক্ষা কর।" (সূরা কেয়ামাহঃ আয়াত ২০,২১)

মোটকথা, যেই ব্যক্তি এইরূপ জাহ্প্রীতি ও দুনিয়ার সুনাম-সুখ্যাতির প্রতারণায় আক্রান্ত, তাহার পক্ষে নিজ আত্মার সংশোধন করা আবশ্যক। অর্থাৎ তাহার কর্তব্য, এই ব্যাধির ফলে সৃষ্ট বিপদাপদ হইতে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করা। দুনিয়ার নিয়ম হইল– যে কোন নামীদামী ও সম্মানী মানুষের যদি কিছু হিতাকাঙ্খী ও বন্ধু-বান্ধব থাকে, তবে তাহার কিছু শত্রুও অবশ্য থাকিবে। এই শত্রুগণ যে কোন উপায়ে তাহার ক্ষতি সাধনের উপায় খুঁজিতে থাকে এবং সুযোগ পাইলেই তাহার অনিষ্ট সাধনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাছাড়া সেই নামীদামী লোকগণ নিজেরাও অনুক্ষণ এমন আশংকায় লিপ্ত থাকে যে, আমি যেই সম্মানজনক অবস্থানে আছি, কোন কারণে যেন তাহা লুপ্ত হইয়া না যায় এবং আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ যেন কোন কারণেই আমার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া না পড়ে। মানুষের অন্তরের কোন স্থিতি নাই। আস্থা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ফুটন্ত পানির বুদ্বুদের মতই উহা আবর্তিত হইতে থাকে। মানুষের মনের ভক্তি-শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করিয়া সৌভাগ্যের সৌধ নির্মাণ করা যেন সমুদ্রের তরঙ্গমালার উপর প্রাসাদ নির্মাণ করারই নামান্তর। সুতরাং নিজের যশ-খ্যাতি ও সম্মান সংরক্ষণের চিন্তা, হিংসুক ও শত্রুর অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষা– ইত্যাদি বিপদাপদের কারণে যশ-খ্যাতির আনন্দ সর্বদাই বিস্বাদে পর্যবসিত থাকে।

অর্থাৎ যশ-খ্যাতির বিনিময়ে মানুষ এই দুনিয়াতে যেই পরিমাণ শান্তির আশা করে, পরিণামে বরং তদাপেক্ষা অধিক বিপদাশংকাতেই তাহাকে লিপ্ত থাকিতে হয়। তদুপরি পার্থিব জীবনের এই যশ-খ্যাতি প্রীতির কারণে পরকালে যেই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, উহা তো আছেই। পার্থিব জীবনে এই সব মুসীবতের কারনে খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ অনেক সময় অখ্যাত জীবনের সুযোগ খুঁজিয়া থাকেন। আসলে যশ-খ্যাতি একটি নির্ভেজাল আপদ ও বোকামী ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকদের দৃষ্টিভঙ্গির এলাজ ও চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক। কেননা, সতেজ ঈমান ও সুস্থ দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখনো নিজের আখেরাত বরবাদ করিয়া দুনিয়ার দিকে নজর দিতে পারেন না।

যশপ্রীতির আমলী চিকিৎসা

যশপ্রীতির আমলী এলাজ ও কর্মগত চিকিৎসা হইল, মানুষের অন্তর হইতে নিজের যশ-খ্যাতি মুছিয়া ফেলার জন্য এমন কাজ করা যেন উহার ফলে মানুষের নজরে তিরস্কারের পাত্রে পরিণত হইতে হয় এবং কোন মানুষের অন্তরেই যেন তাহার প্রতি সম্মানের লেশমাত্র অবশিষ্ট না থাকে। মানুষের নিকট অখ্যাত থাকার চেষ্টা করা এবং শুধু মাত্র আল্লাহ পাকের নিকট মকবুল হওয়াতেই তুষ্ট থাকা। ইহা হইল "তিরস্কার পছন্দ" সম্প্রদায়ের অনুসৃত পদ্ধতি। এই শ্রেণীর লোকেরা স্বেচ্ছায় পাপ কার্যে লিপ্ত হয় যেন উহার ফলে মানুষ তাহাদিগকে অসম্মান করিতে শুরু করে এবং পরিণতিতে তাহারা যশ-খ্যাতির বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করে। অবশ্য যাহারা নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, তাহাদের পক্ষে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয নহে। কেননা, উহার ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আমলে শৈথিল্য দেখা দেওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

পক্ষান্তরে যাহারা অনুসরণীয় ধর্মীয় নেতা নহে, তাহাদের পক্ষেও এই উদ্দেশ্যে কোন হারাম কাজ করা জায়েয নহে। বরং তাহারা বৈধ কাজ সমূহের মধ্যে এমন কাজ করিতে পারিবে যাহা করিলে মানুষের মধ্যে তাহাদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। নিম্নে এই জাতীয় কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হইল-

এক বাদশাহ এক বুজুর্গের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। বাদশাহ যখন সেই বুজুর্গের খানকার কাছাকাছি পৌঁছাইলেন, তখন বুজুর্গ বাদশাহর আগমন-সংবাদ জানিতে পারিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কিছু খাবার আনাইয়া বড় কদর্যভাবে গোগ্রাসে উহা খাইতে শুরু করিলেন। বাদশাহ নিকটে আসিয়া বুজুর্গকে এইভাবে খাইতে দেখিয়া তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। অতঃপর তাহার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা পরিত্যাগপূর্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বাদশাহ চলিয়া যাওয়ার পর বুজুর্গ স্বস্থির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন যে, আল্লাহ পাক তাহাকে বাদশাহর সংশ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

অপর এক বুজুর্গ শরাবের রং এর শরবত পান করিতেন। তাহাও আবার শরাবের নির্দিষ্ট পেয়ালাতেই পান করিতেন যেন লোকেরা তাহাকে শরাবখোর মনে করে। বুজুর্গের এই আচরণ দেখিয়া একে একে সকলে তাহাকে বর্জন করিয়া চলিয়া গেল।

অবশ্য ফেকাহশাস্ত্র মতে এই ধরনের কার্যকলাপ জায়েয হইবে কি-না তাহাতে সন্দেহ আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কোন কোন বুজুর্গ এইভাবেই আপন আত্মার এসলাহ ও সংশোধন করিয়াছেন। কিন্তু ফেকাহশাস্ত্রবিদ ও মুফতীগণ তাহাদের এই কর্ম শরীয়ত সম্মত বলিয়া অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু আল্লাহওয়ালাগণ এই পদ্ধতির উপর আমল করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছেন। অবশ্য পরে তাহারা এইরূপ বাড়াবাড়ির ক্ষতিপূরণ করিয়া লইয়াছেন।

অপর এক বুজুর্গের ঘটনা এইরূপ- লোকসমাজে তাহার বুজুর্গীর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িলে ক্রমে তাহার নিকট লোকসমাগম বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এক পর্যায়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি হইল যে, তাহার নিয়মিত এবাদত-বন্দেগী করাই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। পরে তিনি এই অবস্থা হইতে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। সেমতে এক দিন তিনি মহল্লার সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ করিলেন এবং গোসল শেষে বাহির হওয়ার সময় ইচ্ছা করিয়াই অপর এক ব্যক্তির মূল্যবান পোশাক গায়ে জড়াইয়া দ্রুত বাহির হইয়া আসিলেন।

এদিকে সেই পোশাকের মালিক তাহার মূল্যবান পোশাকটি যথাস্থানে না পাইয়া যারপর নাই পেরেশান হইল এবং তাহা "চুরি হইয়া গিয়াছে" এই মর্মে ঘোষণা দিয়া খোঁজাখুঁজি শুরু করিল। পরে তাহারা দেখিতে পাইল, সেই বুজুর্গ চুরি যাওয়া পোশাকটি গায়ে জড়াইয়া প্রকাশ্য রাজ পথে দিব্যি দাঁড়াইয়া আছেন। আর যায় কোথায়- অমনি চুরির অপরাধে চতুর্দিক দিক হইতে তাহার উপর কিল-ঘুষি শুরু হইয়া গেল।

উপরোক্ত ঘটনার পর দেশময় তাহার দুর্নাম ছড়াইয়া পড়িল যে, কথিত বুজুর্গ আসলে একজন চোর। অতঃপর তাহার নিকট লোকসমাগম একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। অর্থাৎ এইভাবেই তিনি মানুষের নজর হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নীরবে আল্লাহর এবাদতে মশগুল হইলেন।

যশ-খ্যাতির মোহ দূর করিবার উপায়

যশ-খ্যাতি নির্মূল করার উত্তম উপায় হইল, মানুষের সংশ্রব বর্জনপূর্বক নির্জনতা অবলম্বন করিয়া এমন স্থানে চলিয়া যাওয়া যেখানে কেহ তাহাকে চিনিতে না পারে। যেই শহরে খ্যাত হইয়াছে, সেই শহরেই নিজ ঘরে নির্জনবাস অবলম্বন করিলে পূর্বাধিক খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ার আশংকা রহিয়াছে।

কেননা, এমতাবস্থায় গোটা এলাকায় প্রচার হইয়া যাইবে যে, অমুকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নির্জনবাস অবলম্বন করিয়াছে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যেন তাহার নির্জনবাসই প্রসিদ্ধি লাভের কারণে পরিণত হইবে। এই অবস্থাটি আরো নাজুক। কারণ, এই ক্ষেত্রে এমনও হইতে পারে যে, সেই নির্জনবাসী ব্যক্তি এমন ধারণা করিতে শুরু করিবে যে, আমার অন্তর হইতে যশ-খ্যাতির মোহাব্বত দূর হইয়া গিয়াছে– অথচ তাহার অন্তরের কোন গহিন কোণে হয়ত উহার মোহাব্বত সুপ্ত থাকিবে। এই অবস্থায় তাহার নফস হয়ত বাহ্যতঃ উদ্দেশ্য সফল হওয়ার কল্পনায় প্রশান্তি লাভ করিবে। কিন্তু সে যদি এই কথা জানিতে পারে যে, মানুষ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নহে কিংবা তাহারা আমার সমালোচনা করে, তবে আত্মার সেই প্রশান্তি নিঃশেষ হইয়া তদস্থলে এমনই পেরেশানীর উদ্ভব হইবে যে, অতঃপর মানুষের অন্তরে তাহার সম্পর্কে সৃষ্ট কুধারণা সমূহ দূর করার জন্য সে চেষ্টা-তদ্বির শুরু করিয়া দিবে। এমনকি এই ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদি যেকোন উপায় অবলম্বন করিতেই সে পিছপা হইবে না।

এইসব ক্রিয়া-কর্ম দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই নির্জনবাস অবলম্বন করিয়াছিল। তাহার অন্তরে সম্পদের মোহাব্বতের মত যশ-খ্যাতির মোহাব্বতও আগের মতই বিদ্যমান। মানুষ যত দিন অপরের দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য লালায়িত থাকে, তত দিনই সে মানুষের অন্তরে আসন স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে। কিন্তু এই ব্যক্তি যদি গায়ে খাটিয়া অর্থ উপার্জন করে এবং অপরের সম্পদের প্রতি কোনরূপ নজর না করে তবে অপরাপর কোন মানুষকেই সে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিবে না এবং তাহার সম্পর্কে কে কি ধারণা পোষণ করিল এই বিষয়েও তাহার কোন মাথা ব্যথা থাকিবে না।

মানুষ দ্বারা উপকৃত হওয়ার এই লালসা শুধু কানাআ'ত বা অল্পেতুষ্টি দ্বারাই নির্মূল হইতে পারে। যেই ব্যক্তি অল্পেতুষ্ট, সে কখনো মানুষ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কেহ তাহার প্রতি খারাপ ধারণা করিলেও তাহার কিছু আসে যায় না এবং কেহ তাহার প্রতিশ্রদ্ধা পোষণ করিলেও সে কোনরূপ পুলক অনুভব করে না।

মোটকথা, অল্পেতুষ্টি ও লোভ-লালসা বর্জন ছাড়া যশ-খ্যাতির মোহ নির্মূল হওয়া সম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে আমরা যশ-খ্যাতির নিন্দা এবং নির্জনবাসের উপকারিতার যেই সব বিবরণ উল্লেখ করিয়াছি, উহার আলোকে নিজেদের কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের আকাবেরে দ্বীন ইজ্জতের তুলনায় অপমানকেই প্রাধান্য দিয়াছেন এবং পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পারলৌকিক ছাওয়াব অর্জনকেই অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন।

প্রশংসাপ্রীতির চিকিৎসা

প্রশংসার মোহ ও লোকনিন্দার ভয় এমন দুইটি মারাত্মক ব্যাধি যে, অধিকাংশ মানুষ উহাতে আক্রান্ত হইয়া ধ্বংস হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকেরা যাবতীয় কাজকর্ম মানুষের মর্জি অনুযায়ী করে যেন সকলেই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহার প্রশংসা করে এবং কাহারো পক্ষ হইতেই কোনরূপ নিন্দার আশংকা না থাকে। ইহা এমন এক মারাত্মাক ব্যাধি যে, ইহাতে আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষের সর্বনাশ হইতে আর কিছুই বাকী থাকে না। সুতরাং এই ব্যাধির চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক। এই চিকিৎসার সহজ উপায় হইল, প্রথমেই দেখিতে হইবে, কি কি কারণে প্রশংসার প্রতি মোহ ও নিন্দার প্রতি ঘৃণা পয়দা হয়।

প্রথম কারণ

ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, প্রশংসাকারীর উক্তির মাধ্যমেই প্রশংসিত ব্যক্তি নিজের যোগ্যতা ও পূর্ণতার কথা জানিতে পারে। এই ক্ষেত্রে প্রশংসিত ব্যক্তির কর্তব্য, সেই ব্যক্তির প্রশংসায় প্রতারিত না হইয়া নিজের জ্ঞান ও বিবেকের নিকট প্রশ্ন করা যে, যেই গুণ ও যোগ্যতার কথা উল্লেখ করিয়া তোমার প্রশংসা করা হইতেছে, বাস্তবেও উহা তোমার মধ্যে বিদ্যমান কি-না। যদি বিদ্যমান থাকে, তবে উহার প্রশংসায় আনন্দিত হওয়া যায় কি-না। প্রকাশ থাকে যে, মানুষের জন্য আনন্দিত হওয়ার মত গুণ হইল– এলেম, তাকওয়া ও যুহদ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ধনৈশ্বর্য ও পার্থিব বিষয়-সম্পদ দ্বারা আনন্দিত হওয়ার সঙ্গত কোন কারণ নাই। তো যেই গুণটির উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করা হইল, উহা যদি পার্থিব বিষয় সংক্রান্ত হয়, তবে উহার উপর আনন্দিত হওয়ার অর্থ যেন তুচ্ছ তৃণলতার মালিক হওয়ার কারণে আনন্দিত হওয়া– যাহা দুই দিন পরেই শুকাইয়া বাতাসের সঙ্গে উড়িয়া যাইবে। তা ছাড়া যুক্তির নিরীখেও পার্থিব বিষয়ের প্রশংসায় আনন্দিত হওয়া সঙ্গত নহে। কেননা, তুমি তো আনন্দিত হইতে পার আলোচ্য গুণটি তোমার মধ্যে বিদ্যমান থাকিলে– নিছক প্রশংসাকারীর প্রশংসার কারণে নহে। আর সেই গুণটি তো পূর্ব হইতেই তোমার মধ্যে বিদ্যমান ছিল– যাহা আনন্দিত হওয়ার মূল কারণ। সুতরাং মানুষের প্রশংসায় কি কারণে তুমি আনন্দিত হইবে? বরং এইভাবে আনন্দিত হইলে উহার অর্থ দাঁড়াইবে– প্রশংসার কারণেই সেই গুণটি তোমার মধ্যে অস্তিত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তো এইরূপ নহে। বরং ঐ গুণটি পূর্ব হইতেই তোমার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

তাছাড়া আলোচ্য গুণটি যদি এলেম, তাক্‌ওয়া ও যুহদ সংক্রান্ত হয়, তবুও উহার উপর আনন্দিত হওয়া ঠিক নহে। কেননা অন্তিম অবস্থা, কার কেমন

হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। সেই গুণটি জীবনের শেষ পর্যন্ত বহাল থাকিবে কি-না তাহাও জানা নাই। অবশ্য এই কথা সত্য যে, এলেম, তাকওয়া ও যুহদ ইত্যাদি বিষয়গুলি আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ হয়। কিন্তু শেষ পরিণতি ভাল হইবে না মন্দ হইবে, এই আশংকা সর্বদা লাগিয়াই থাকে। সুতরাং যেখানে শেষ পরিণতি খারাপ হওয়ার আশংকা বিদ্যমান, সেই ক্ষেত্রে মানুষ কেমন করিয়া দুনিয়ার কোন বস্তুর উপর আনন্দিত হইতে পারে? বরং এমতাবস্থায় সে মনে করিবে, দুনিয়া পেরেশানীর জায়গা- আনন্দের নহে; দুনিয়া কষ্টের জায়গা– সুখের নহে।

পক্ষান্তরে তোমার শেষ পরিণতি উত্তম হওয়ার ব্যাপারে তুমি যদি আশাবাদী হও; তবে সেই ক্ষেত্রেও প্রশংসাকারীর প্রশংসায় খুশী না হইয়া বরং আল্লাহ পাকের সেই অনুগ্রহের উপর খুশী হওয়া উচিৎ– যাহা এলেম ও তাকওয়ার আকারে তোমাকে দান করা হইয়াছে। কারণ, মানুষের যোগ্যতা ও পূর্ণতার অনুভূতির ফলেই আনন্দ অনুভূত হয়। আর মানুষের মধ্যে এই যোগ্যতা ও পূর্ণতা পয়দা হয় আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে– প্রশংসাকারীর প্রশংসার কারণে নহে। সুতরাং যদি আনন্দিত হইতেই হয়, তবে তাহা আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে হইবে– মানুষের প্রশংসার কারণে নহে।

এদিকে যেই গুণটির উল্লেখ করিয়া তোমার প্রশংসা করা হইল, সেই গুণটি যদি তোমার মধ্যে বিদ্যমান না থাকে, তবে এইরূপ প্রশংসায় আনন্দিত হওয়া বোকামী ছাড়া আর কিছুই নহে। উহার উদাহরণ যেন এইরূপ– এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে মজাক করিয়া বলিল, আপনার পেটের ময়লা এমনই সুবাসিত যে, আপনি যখন মল ত্যাগ করেন, তখন উহার সুবাসে চতুর্দিক আমোদিত হইয়া ওঠে। অথচ সেই ব্যক্তি ইহা ভাল করিয়াই জানে যে, তাহার পেট দুর্গন্ধযুক্ত ময়লায় ভর্তি এবং উহাতে আদৌ কোন সুবাস নাই। তখন এইরূপ প্রশংসা শুনিবার পরও যদি কেহ আনন্দিত হয়, তবে তাহাকে বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কি বলা যাইবে? অনুরূপভাবে কেহ যদি তোমার এলেম-তাকওয়া ও নেক আমলের উল্লেখ করিয়া তোমার প্রশংসা করে, আর তুমি জান যে, এইসব সদ গুণের সহিত তোমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই; তবে এইরূপ প্রশংসায় আনন্দিত হওয়াও অনুরূপ পাগলামীর মতই বটে। তোমার ভিতর কি কি গুণ আছে, তোমার যোগ্যতা ও ক্ষমতা কতটুকু এবং তুমি কি পরিমাণ নেক আমলের অধিকারী– এইসব বিষয় আল্লাহ পাক ভাল করিয়াই জানেন। সুতরাং মানুষের মিথ্যা প্রশংসায় আনন্দিত হওয়ার কোন কারণ নাই। আর প্রশংসাকারী যদি তোমার সত্য প্রশংসাও করে, তবে সেই ক্ষেত্রেও তাহার প্রশংসায় আনন্দিত না হইয়া বরং তোমার উপর প্রদত্ত আল্লাহর নেয়মতের উপরই আনন্দিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় কারণ

মানুষের প্রশংসায় আনন্দিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হইল, কোন ব্যক্তি যখন কাহারো প্রশংসা করে, তখন সেই প্রশংসিত ব্যক্তির অন্তরে এই বিশ্বাস পয়দা হয় যে, প্রশংসাকারীর অন্তর তাহার অনুগত এবং সে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ইহার পরিণতি যশপ্রীতির পরিণতির মতই অভিন্ন। এই অবস্থাটির চিকিৎসা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষের নিকট কোন কিছুই প্রত্যাশা করিবে না এবং যাহাকিছু চাহিবার কেবল আল্লাহ পাকের নিকটই চাহিবে। আর এই বাস্তবতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, মানুষের নিকট ইজ্জত-সম্মান ও মর্যাদার 'প্রত্যাশা' বান্দাকে আল্লাহ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। এই কারণেই মানুষের প্রশংসায় আনন্দিত হইতে নাই।

তৃতীয় কারণ

তৃতীয় কারণ হইল, প্রশংসা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, প্রশংসাকারী প্রশংসিত ব্যক্তির প্রভাব দ্বারা ভীত ও প্রভাবিত। বস্তুতঃ এইরূপ প্রভাব ও ক্ষমতা একটি অস্থায়ী বিষয় এবং ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। এমন অস্থায়ী ও বিলীয়মান প্রশংসার উপর আনন্দিত হওয়া জ্ঞানবানের কাজ নহে। বরং এইরূপ প্রশংসার উপর ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হওয়া উচিৎ। কেননা, এইরূপ প্রশংসা দ্বারা সে তাহাকে অনিষ্ট ও বিপদের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

এক বুজুর্গ বলেন, যেই ব্যক্তি মানুষের প্রশংসা দ্বারা আনন্দিত হয়, সে যেন শয়তানকে নিজের মধ্যে প্রবেশ করার পথ করিয়া দেয়। অন্য এক বুজুর্গ বলেন, কাহারো মুখ হইতে এই কথা শুনিতে যদি তোমার ভাল না লাগে যে, "তুমি মন্দ লোক" বরং মানুষের মুখ হইতে তোমার যদি এই কথা শুনিতে ভাল লাগে যে, "তুমি একজন ভাল মানুষ"– তবে উহার অর্থ দাঁড়াইতেছে, আসলেই তুমি একজন "মন্দ লোক"।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ "খবরদার! তোমরা একে অপরের প্রশংসা করিও না। আর প্রশংসাকারীকে দেখিলে তাহার মুখে মাটি নিক্ষেপ করিবে।"

এই কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম প্রশংসাকে ভয় করিতেন। একবার খোলাফায়ে রাশেদীনের একজন এক ব্যক্তিকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি আমার তুলনায় উত্তম এবং আপনার এলেমও আমার তুলনায় অনেক বেশী। খলীফা সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ হইয়া লোকটিকে বলিলেন, আমি কি তোমাকে আমার গুণ-কীর্তন ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতে বলিয়াছি? জনৈক ছাহাবী এক ব্যক্তির মুখে নিজের প্রশংসা শুনিয়া বলিলেন, আয় আল্লাহ! এই ব্যক্তি এমন বিষয় দ্বারা আমার সন্তুষ্টি কামনা করিতেছে যেই

বিষয়ের উপর তুমি অসন্তুষ্ট হও। আমি তোমাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি এই ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট।

আল্লাহর নেক বান্দাগণ মানুষের প্রশংসাকে এই কারণে ঘৃণা করিতেন যে, উহার ফলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। তাহারা এই কথা ভাল করিয়াই জানিতেন যে, আল্লাহ পাক আমাদের ভিতর-বাহিরের সব অবস্থাই জানেন এবং আমাদের গোনাহ ও পাপাচার সম্পর্কেও তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত। সুতরাং মানুষ প্রশংসা করিলেই আমাদের গোনাহ হ্রাস পাইবে না এবং উহাতে বৃদ্ধিও ঘটিবে না। সেই ব্যক্তিই উত্তম যে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করিয়াছে। আর সবচাইতে অধম সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। সুতরাং যেই ব্যক্তির প্রশংসা করা হইতেছে, সেই ব্যক্তি যদি আল্লাহ পাকের নিকট মন্দ হয়, আর তাহার শেষ পরিণতি হয় জাহান্নাম; তবে মানুষের প্রশংসায় তাহার আনন্দিত হওয়ার কোন কারণ নাই। আর সেই ব্যক্তি যদি জান্নাতী হয়, তবে মানুষের প্রশংসায় খুশী না হইয়া বরং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের কারণেই খুশী হওয়া উচিৎ। মানুষ তো মানুষের কিছুই করিতে পারে না। হায়াত-মউত, রিজিক-দৌলত; সবই আল্লাহর হাতে। এই মৌলিক বিশ্বাস যদি মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত হয়, তবে মানুষের প্রশংসা বা নিন্দার কারণে সে কিছুতেই প্রভাবিত হইবে না।

নিন্দাকে ঘৃণা করার চিকিৎসা

ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, মানুষ যেই কারণে নিন্দাকে ঘৃণা করে, ঠিক উহার বিপরীত কারণে প্রশংসাকে মোহাব্বত করে। সুতরাং প্রশংসার মোহাব্বতের চিকিৎসা দ্বারাই ঘৃণাকে নিন্দা করার চিকিৎসা কি তাহা জানা যাইবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল- যেই ব্যক্তি তোমার নিন্দা করে তাহার অবস্থা নিম্ন বর্ণিত তিন অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় অবশ্য সংশ্লিষ্ট হইবে-

(এক) তোমার নিন্দাকারী ব্যক্তি যদি তাহার বক্তব্যে সত্যবাদী হয় এবং তোমার মঙ্গলার্থেই নিন্দা করিয়া থাকে, তবে তাহার কথায় রাগ করা, তাহার সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করা কিংবা এই নিন্দার জবাবে পাল্টা তাহার নিন্দা করা উচিৎ হইবে না। কেননা, এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য খারাপ নহে; সে তোমার অপরাধ বিষয়ে সতর্ক করিয়া তোমাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে চাহিতেছে। সুতরাং এই ব্যক্তির নিন্দায় বরং খুশী হইয়া তোমার নিন্দাযোগ্য অপরাধগুলি দূর করার চেষ্টা করা চাই। মোটকথা, নিন্দাকারীর বক্তব্য দ্বারা যদি সত্যিকার অর্থেই তোমার ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করিয়া তোমাকে সংশোধন হওয়ার সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহার নিন্দায় ক্রুদ্ধ হওয়া উহা অপছন্দ করা কিংবা তাহাকে তিরস্কার করা উচিৎ নহে।

(দুই) নিন্দাকারী যদি তোমার সঙ্গে শত্রুতার কারণে এবং তোমাকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তোমার নিন্দা করিয়া থাকে; তবুও তাহার কথায় রাগ না করিয়া বরং তোমার খুশীই হওয়া উচিৎ। কেননা, তাহার নিন্দার কারণে তুমি নিজের এমনসব ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হইতে পারিলে- যাহা তোমার জানা ছিল না। কিংবা তোমার এমন কতক অবস্থা যেইগুলিকে তুমি নিজের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করিতে অথচ প্রকৃতপক্ষে সেইগুলি যে তোমার নেহায়েতই মন্দ স্বভাব ছিল- তাহা নিন্দুকের সমালোচনার কারণেই তুমি জানিতে পারিলে। সুতরাং নিন্দুকের এই জাতীয় সমালোচনা তোমার জন্য সৌভাগ্যের কারণই বটে। উহার উদাহরণ যেন এইরূপ-

মনে কর, তুমি কোন বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছ। এই সময় তোমার পরিধেয় বস্ত্রটি ছিল নাপাক ও ময়লা এবং দুর্গন্ধযুক্ত। পথে এক ব্যক্তি তোমাকে ডাকিয়া বলিল, হে ক্লেদাক্ত ও কুৎসিত! বাদশাহর দরবারে যাওয়ার পূর্বে তোমার পরিধেয় বস্ত্র পাক-সাফ করিয়া লও। তো এই ব্যক্তির এই মৌখিক সতর্কবাণী তোমার জন্য গনীমত বটে। মানুষের যাবতীয় গর্হিত চরিত্র পরকালের জন্য বরবাদীর কারণ হইবে। আর মানুষ নিজের এইসব গর্হিত চরিত্র নিন্দাকারীর নিন্দার মাধ্যমেই জানিতে পারে। সুতরাং তোমার ভাগ্যে যদি এমন একজন নিন্দাকারীর ব্যবস্থা হয়, যে তোমাকে পারলৌকিক বরবাদীর কারণগুলি চিহ্নিত করিয়া উহা হইতে সতর্ক হওয়ার সুযোগ করিয়া দিবে, তবে তো উহাকে গনীমতই মনে করিতে হইবে। নিন্দাকারী যদি তোমার অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে তোমার পিছনে লাগিয়া থাকে, তবে উহার ফলে তাহার দ্বীন বরবাদ হইবে- তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। বরং তাহার নিন্দার কারণে তোমার উপকারই হইবে। সুতরাং তাহার নিন্দার উপর তুষ্ট হইয়া উহা দ্বারা তুমি উপকৃত হওয়ারই চেষ্টা করা উচিৎ। নিন্দাকারী যদি তাহার নিজের জালানো আগুনে আত্মাহুতি দেয়, তবে সেই ক্ষেত্রে তোমার তো করিবার কিছু নাই।

(তিন) নিন্দাকারী যদি তাহার কথায় মিথ্যাবাদী হয়, অর্থাৎ সে যদি তোমার এমন দোষ বর্ণনা করে যাহা তোমার মধ্যে নাই, তবে তাহার এই মিথ্যা নিন্দার কিছুমাত্র পরওয়া করিবে না। এবং উহার জবাবে তুমিও তাহার কোন নিন্দা করিবে না। বরং এই ক্ষেত্রে তুমি নিম্ন বর্ণিত তিনটি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিতে পার-

(ক) প্রথমতঃ যদিও তুমি নিন্দাকারীর বর্ণিত সেই বিশেষ দোষটি হইতে মুক্ত, কিন্তু এমন বহু দোষ তোমার মধ্যে বিদ্যমান যাহা আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তোমার পক্ষে আল্লাহ পাকের শোকর

আদায় করা কর্তব্য যে, তিনি দয়াপরবশ হইয়া তোমার অসংখ্য দোষ-ত্রুটি গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। আর নিন্দাকারী কেবল তোমার এমন একটি দোষের কথা প্রচার করিয়াছে, যাহা বাস্তবে তোমার মধ্যে বিদ্যমান নহে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ নিন্দাকারী কর্তৃক তোমার দোষ অন্বেষণ এবং উহা প্রচার করিয়া বেড়ানোর ফলে উহা তোমার গোনাহের কাফ্‌ফারা হইয়া যাইতেছে। অর্থাৎ যেই দোষে তুমি দুষ্ট নও, এমন একটি দোষ প্রচার করিয়া নিন্দাকারী যেন তোমার অসংখ্য দোষ ঢাকিয়া দিতেছে। কেননা, এই ক্ষেত্রে মানুষ মনে করিবে, তোমার মধ্যে যদি আরো কোন দোষ থাকিত, তবে তো সেইসব দোষও সে প্রচার করিয়া বেড়াইত। স্মরণ রাখিও, নিন্দাকারী তোমার নামে নিন্দা করিয়া সে যেন তাহার নেকীসমূহ তোমার খেদমতে হাদিয়া পেশ করিতেছে। আর যেই ব্যক্তি তোমার প্রশংসা করে, সে যেন তোমার পিঠের উপর সজোরে আঘাত করিতেছে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, নিজের পিঠের উপর আঘাত পাইয়া তুষ্ট হওয়া– আর মোফতে অসংখ্য নেকী পাইয়া অসন্তুষ্ট হওয়া, ইহা তো কোন বুদ্ধিমানের কাজ হইতে পারে না। আর তুমি তাহার পক্ষ হইতে নেকী প্রাপ্ত হইতেছ, উহা তোমার জন্য আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের কারণ হইবে।

(গ) সেই নিন্দাকারী বেচারা তোমার নিন্দা করিয়া তাহার নিজেরই দ্বীন বরবাদ করিতেছে। এই সর্বনাশা অপরাধের কারণে সে আল্লাহ পাকের রহমতের নজর হইতে দূরে সরিয়া গিয়া ভয়াবহ আজাবের শিকার হইতেছে। এখন কি তুমি এই অসহায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে আরো কষ্ট দিবে? সে তো এমনিতেই আল্লাহর আজাবে নিপতিত হইয়া ধ্বংসের অতলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অতঃপর এই অসহায় ব্যক্তিটির জন্য আরো গজবের দোয়া করিয়া তুমি শয়তানকে খুশী করিতে পার না। তুমি বরং তাহার জন্য এইরূপ দোয়া করিতে পার– আয় আল্লাহ! তাহাকে আত্মসংশোধনের সুযোগ করিয়া দাও, তাহার উপর রহম কর এবং তাহাকে তওবা করিবার তাওফীক দান কর। যেমন ওহোদ যুদ্ধে যাহারা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দান্দান মোবারক শহীদ করিয়াছিল, পবিত্র চেহারা ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল এবং তাহার পিতৃব্য হযরত আমীর হামজা (রাঃ)-কে শহীদ করিয়াছিল, তাহাদের জন্য তিনি এইরূপ দোয়া করিয়াছিলেন–

اللهم اغفر لقومي، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون

অর্থঃ "আয় আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা কর। আয় আল্লাহ! আমার কওমকে হেদায়েত কর। কেননা, তাহারা অজ্ঞ।" (বায়হাকী, দালায়েলুন্নবুওয়্যাহ)

এক ব্যক্তি হযরত ইবরাহিম বিন আদহামকে আঘাত করার পর তিনি

তাহার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, লোকটি তো আপনার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করিল, অথচ আপনি তাহার জন্য কল্যাণের দোয়া করিলেন, ইহার কারণ কি? জবাবে হযরত ইবরাহিম বিন আদহাম বলিলেন, লোকটির এই অন্যায় আচরণের কারণে আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে উত্তম বিনিময় প্রাপ্ত হইব। সুতরাং যেই ব্যক্তির কারণে আমি উত্তম বিনিময় প্রাপ্ত হইব, সেই ব্যক্তিকে আজাব দেওয়া হউক– ইহা আমি কামনা করিতে পারি না। এই কারণেই আমি তাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিয়াছি।

আল্লাহ পাক যাহাদিগকে অল্পেতুষ্টি ও কানাআত দান এবং মানুষের নিকট হইতে যাহারা কোন কিছু প্রত্যাশা করে না, এইরূপ লোকেরা মানুষের নিন্দায় কখনো অসন্তুষ্ট হয় না। তুমি যদি মানুষের নিকট হইতে অমুখাপেক্ষী হইতে পার, তবে মানুষ তোমার যতই নিন্দা করুক না কেন, উহা তোমার অন্তরে কিছুমাত্র ক্রিয়া করিবে না। অল্পেতুষ্টি ও কানাআত মানুষের জন্য এক বিরাট সম্পদ। যেই ব্যক্তি এই কানায়াত হাসিল করিতে পারিয়াছে, তাহার অন্তর হইতে ধন-সম্পদ ও যশ-খ্যাতির মোহাব্বত অবশ্যই দূর হইয়া যাইবে। যতদিন তোমার অন্তরে চাহিদা ও লোভ-লালসা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তুমি ইহাই কামনা করিবে যে, যেই ব্যক্তির নিকট আমি কিছু প্রত্যাশা করি, সেই ব্যক্তির অন্তরে যেন আমার মোহাব্বত এবং আমার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বিদ্যমান থাকে এবং সে যেন আমার প্রশংসা করে। তুমি নিজেও সেই ব্যক্তিকে আমার অনুরক্ত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকিবে। এই ক্ষেত্রে সবচাইতে ক্ষতিকর বিষয় হইল, মানুষের নিকট এইরূপ প্রত্যাশা ও কামনা-বাসনা মানুষের দ্বীনকে বরবাদ করিয়া দেয়।

প্রশংসা ও নিন্দার ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থার প্রকার ভেদ

প্রশংসা ও নিন্দার ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা চারি প্রকার–

প্রথম অবস্থা

এই ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থা হইল, প্রশংসার উপর খুশী হওয়া এবং প্রশংসাকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অনুরূপভাবে নিন্দার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া এবং নিন্দাকারীর সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করা। তাহার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা বা উহার ইচ্ছা পোষণ করা। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। এখানে পর্যায়ক্রমে যেই চারি প্রকার অবস্থার কথা বর্ণনা করা হইবে, উহার মধ্যে এই প্রথম প্রকারের অবস্থাটির গোনাহ সবচাইতে বেশী।

দ্বিতীয় অবস্থা

দ্বিতীয় অবস্থা হইল, নিন্দার কারণে মনে মনে অসন্তুষ্ট হওয়া কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ না করা এবং উহার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা না করা। অনুরূপভাবে নিজের প্রশংসা শুনিয়া মনে মনে খুশী হওয়া কিন্তু বাহ্যিক অঙ্গ-অবয়ব দ্বারা তাহা প্রকাশ না করা। এই অবস্থাটিও দোষণীয় বটে। তবে প্রথম অবস্থার তুলনায় এই দ্বিতীয় অবস্থাকে উত্তম বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় অবস্থা

তৃতীয় অবস্থা হইল– প্রশংসায় কোনরূপ খুশী না হওয়া এবং নিন্দার কারণেও কষ্ট অনুভব না হওয়া। অর্থাৎ– তাহার নিকট প্রশংসাও যেমন, নিন্দাও তেমন এবং এইসব দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত না হওয়া। এই প্রসঙ্গে এই তৃতীয় অবস্থাটিকে সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে।

চতুর্থ অবস্থা

এই ক্ষেত্রে চতুর্থ অবস্থাটি হইল সমস্ত এবাদতের নির্যাস। অর্থাৎ প্রশংসাকে সরাসরি খারাপ মনে করা এবং প্রশংসাকারীকে তিরস্কার করা। কেননা, এই প্রশংসা তাহার জন্য ফেৎনা, উহা তাহার কোমর ভাঙ্গিয়া দেয় এবং এই অবস্থাটি তাহার দ্বীনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

উহার পাশাপাশি নিন্দাকারীকে মোহাব্বত করা। কেননা, এই নিন্দাকারী তাহার অপরাধসমূহ চিহ্নিত করিয়া উহা হইতে তওবা করার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেয় এবং সে নিজের গোনাহসমূহ তাহাকে দিয়া দেয়।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

رأس التواضع ان تكره ان تذكر بالبر و التقوى

অর্থঃ "উত্তম বিনয় হইল, তোমাকে নেককার ও মোত্তাকী হিসাবে উল্লেখ করিলে তাহা তোমার নিকট খারাপ মনে হওয়া।"

এই প্রসঙ্গে অপর এক হাদীসে আরো কঠোরতার সহিত বলা হইয়াছে–

ويل للصائم و ويل للقائم، و ويل لصاحب الصوف الا من ؟ فقيل يا رسول الله ؟ الا من ؟ فقال إلا من تنزهت نفسه من الدنيا و بغض المدحة و استحب المذمة .

অর্থঃ "রোজাদারদের জন্য দুর্ভোগ, রাত জাগরণকারীদের জন্য দুর্ভোগ, কম্বল মোড়া দানকারীদের জন্য দুর্ভোগ, কিন্তু এমন কতক লোক ছাড়া। লোকেরা আরজ করিল, 'কিন্তু এমন কতক লোক কাহারা'? তিনি এরশাদ করিলেনঃ এমন লোক যার আত্মা দুনিয়ার নাপাকি হইতে পবিত্র, যেই ব্যক্তি প্রশংসা অপছন্দ করে এবং নিন্দাকে পছন্দ করে।"

উপরে প্রশংসা ও নিন্দার ক্ষেত্রে মানুষের চারিটি অবস্থা বর্ণনা করা হইল। আমাদের মত মানুষের পক্ষে কেবল দ্বিতীয় অবস্থাটির উপরই আমল করা সম্ভব। অর্থাৎ প্রশংসা শুনিয়া মনে মনে খুশী হওয়া কিন্তু মুখে বা অঙ্গ-অবয়ব দ্বারা তাহা প্রকাশ না করা। তদ্রূপ নিন্দার কারণেও মনে মনে কষ্ট পাওয়া কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ না করা। বর্ণিত তৃতীয় অবস্থাটিতে সংশ্লিষ্ট হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সেই স্তরটির অবস্থা হইল– প্রশংসাও যেমন– নিন্দাও তেমন। অর্থাৎ এইসব দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত না হওয়া।

কতক লোক এমনও আছে যাহারা নিজের প্রশংসা শুনিয়া খুশী হয় না এবং উহার কারণে কোনরূপ কষ্টও অনুভব করে না। অর্থাৎ এই প্রশংসা যেন কোনভাবেই তাহাদের উপর ক্রিয়া করে না। এই ধরনের লোকেরা ভাগ্যবান বটে। আবার কতক লোক এইরূপও আছে, যাহারা প্রশংসার উপর নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করে বটে, কিন্তু প্রশংসাকারীর উপর অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারে না। তো এই ক্ষেত্রে সর্বোত্তম স্তর হইল– প্রশংসাকে অপছন্দ করা এবং স্পষ্টরূপে উহার উপর নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া দেওয়া। এই অসন্তোষ যেন কৃত্রিম না হয়– অর্থাৎ যথার্থই অসন্তুষ্ট হইতে হইবে। কারণ, মনে মনে খুশী হওয়া আর মুখে অসন্তোষ প্রকাশ করা ইহা সুস্পষ্টরূপেই মোনাফেকী। এই শ্রেণীর লোকেরা সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে নিজেদের এখলাস ও সততার কথা প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে এখলাস ও সততার নাম-গন্ধও থাকে না।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা নিন্দা প্রসঙ্গে মানুষের অবস্থার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া গেল। এই ক্ষেত্রে প্রথম স্তর হইল– নিন্দার উপর সুস্পষ্টরূপে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া দেওয়া। আর সর্বোচ্চ স্তর হইল– নিন্দার উপর সন্তোষ প্রকাশ করা। কিন্তু নিজের নিন্দার উপর সন্তোষ প্রকাশ করা কেবল এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব হয়, যে নিজের নফসের সঙ্গে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষন করে। বস্তুতঃ মানুষের আত্মা ও নফস বড়ই অবাধ্য এবং উহাতে পাপেরও কোন অন্ত নাই। নফসের ওয়াদা খেলাফী সর্বজন বিদিত এবং উহার প্রতারণা সম্পর্কেও কেহ অজানা নহে। সুতরাং এই নফস মানুষের পক্ষ হইতে এমন ব্যবহারই পাওয়ার যোগ্য– যাহা একজন শত্রুর সঙ্গে করা হয়। মানুষের স্বভাব হইল, সে তাহার শত্রুর নিন্দা শুনিয়া আনন্দিত হয়। তো 'নফস' যখন মানুষের শত্রু বলিয়া সাব্যস্ত হইল, সুতরাং উহার নিন্দা শুনিয়া আনন্দিত হওয়া এবং নিন্দাকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ। কেননা, নিন্দাকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আত্মার অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করিয়া তাহার বিরাট উপকার করিয়াছে।

মোটকথা, এই জাতীয় নিন্দা মানুষের জন্য এক বিরাট নেয়ামত ও গনীমত বটে। এই নিন্দার কারণেই সে মানুষের নজরে একেবারে হীন ও নগণ্য সাব্যস্ত হইয়া সর্বনাশা যশ ও খ্যাতি ফেৎনা হইতে নিরাপদ রহিয়াছে। তাছাড়া এমন অনেক নেক আমল আছে যাহা মানুষ করিতে পারে না। তো এই ক্ষেত্রে এমনও হইতে পারে যে, এই নিন্দা তাহার জন্য নেকীতে পরিণত হইয়া উহা তাহার এমন গোনাহের কাফ্‌ফারা হইয়া যাইবে, যেইসব গোনাহ সে দূর করিতে পারিতে ছিল না।

ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, প্রশংসা ও নিন্দা বরাবর মনে হওয়া এবং উহার কোনটি দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত না হওয়া– ইহা এমন এক কঠিন অবস্থা যে, উচ্চ স্তরের সাধকগণের পক্ষেই এইরূপ স্তরে পৌঁছা সম্ভব। কোন মুরীদ ও সাধক যদি এই স্তর হাসিল করার উদ্দেশ্যে নিজের গোটা জীবন ওয়াক্‌ফ করিয়া দেয়, তবে সে ইহা ব্যতীত অণ্য কোন কাজ করার সুযোগই পাইবে না। সাধকগণকে উচ্চতর মোকামে পৌঁছার জন্য যেই কঠিন খাঁটি ও দুরূহ স্তরসমূহ অতিক্রম করিতে হয়– এইটি উহার অন্যতম। ক্রমাগত দীর্ঘ মোজাহাদা ও কঠিন সাধনার পরই ইহা অর্জন করা সম্ভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়
রিয়া

রিয়ার নিন্দা

রিয়া সুস্পষ্ট রূপেই একটি হারাম কর্ম এবং যেই ব্যক্তি রিয়া করে, সে আল্লাহর গজবের শিকার হয়। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ، اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ

অর্থঃ অতএব, দুর্ভোগ সেইসব নামাজীর যাহারা তাহাদের নামাজ সম্বন্ধে বে-খবর; যাহারা তাহা লোক-দেখানোর জন্য করে (অর্থাৎ রিয়া করে)।

(সূরা মাউনঃ আয়াত ৪.৫.৬)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَ الَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَ مَكْرُ اُولٰئِكَ هُوَ يَبُوْرُ =

অর্থঃ যাহারা মন্দ কার্যের চক্রান্তে লাগিয়া থাকে তাহাদের জন্যে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি। তাহাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হইবে। (সূরা ফাতিরঃ আয়াত ১০)

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত আয়াতে রিয়াকারদের কথা বলা হইয়াছে। অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّ لَا شُكُوْرًا

অর্থঃ তাহারা বলেঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদিগকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (সূরা আদ দাহরঃ আয়াত ৯)

উপরোক্ত আয়াতে এমন মোখলেস ও আন্তরিক লোকদের প্রশংসা করা হইয়াছে, যাহারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিরই নিয়ত করে। অপর এক স্থানে এরশাদ হইয়াছে–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا =

অর্থঃ অতএব, যেই ব্যক্তি তাহার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাহার পালনকর্তার এবাদতে কাহাকেও শরীক

না করে। (সূরা কাহাফঃ আয়াত ১১০)

উপরোক্ত আয়াতটি এমন লোকদের সম্পর্কে নাজিল হইয়াছে যাহারা নিজেদের এবাদত ও নেক আমলের বিনিময় কামনা করিত।

রিয়া সম্পর্কিত রেওয়ায়েত

এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ আমলের মধ্যে নাজাত নিহিত? তিনি এরশাদ করিলেন–

ان لا يعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس

অর্থঃ "বান্দা যেন আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে এমন কাজ না করে, যার উদ্দেশ্য হয় মানুষ।" (হাকিম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত দাতা, শহীদ ও ক্বারী সম্পর্কিত এক হাদীসে আছেঃ আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রত্যেককে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। দান করার পিছনে তোমার উদ্দেশ্য ছিল যেন লোকেরা তোমাকে দাতা বলে। মুজাহিদকে বলিবেন, তুমিও মিথ্যাবাদী। তুমি আল্লাহর জন্য যুদ্ধ কর নাই; বরং যুদ্ধ করার পিছনে তোমার উদ্দেশ্য ছিল, যেন লোকেরা তোমাকে বাহাদুর বলে। ক্বারীকে বলিবেন, তুমিও মিথ্যা বলিতেছ, তুমি এই উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ করিয়াছ যেন লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ এইসব লোকেরা তাহাদের আমলের ছাওয়াব পাইবে না। রিয়া তাহাদের সকল আমল বরবাদ করিয়া দিয়াছে। (মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

من راءى راءي الله به، و من سمع سمع الله به

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি রিয়া করে, আল্লাহ পাকও তাহার সঙ্গে রিয়া করেন। আর যেই ব্যক্তি তাহা শোনে আল্লাহ পাকও তাহার সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করেন।"

(বোখারী, মুসলিম)

এক দীর্ঘ হাদীসে আছে– আল্লাহ পাক ফেরেশতাকে বলিবেন, অমুক ব্যক্তিকে দোজখে নিক্ষেপ কর। কেননা, সে আমার নিয়তে আমল করে নাই।

(ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমি তোমাদের মধ্যে "ছোট শিরক" বিষয়ে অধিক ভয়

করিতেছি। ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কি? তিনি বলিলেন, ছোট শিরক হইল রিয়া। উহার পর তিনি এরশাদ করেন–

يقول الله عز و جل يوم القيامة اذا جازى العباد باعمالهم اذهبوا الى الذين

كنتم تراؤن في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء

অর্থঃ "রোজ কেয়ামতে আল্লাহ পাক মানুষের আমলের প্রতিদান দেওয়ার সময় বলিবেন, তোমরা দুনিয়াতে যাহাদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে আমল করিতে, তাহাদের নিকট গিয়া দেখ, উহার কোন প্রতিদান পাও কি-না।

(আহমাদ, বায়হাকী)

এক হাদীসে আছে– "তোমরা আল্লাহর নিকট 'হুয্ন' হইতে পানাহ চাও।" ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'হুয্ন' কি? তিনি এরশাদ করিলেনঃ 'হুয্ন' হইল জাহান্নামের একটি উদ্যান যাহা রিয়াকার ক্বারীদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। (তিরমিজী)

এক হাদীসে কুদসীতে আছে–

من عمل في عملا اشرك فيه غيرى فهو له كله و انا منه بريئ وانا اغنياء

من الشرك

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি অপর কাহাকেও শরীক করিয়া আমার জন্য কোন আমল করে, সে যেন তাহারই হয়, আমি উহা হইতে দূরে। আমি শিরক হইতে সকলের তুলনায় অধিক বেপরওয়া।" (ইবনে মাজা)

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম এরশাদ করেনঃ রোজার হালাতে তুমি মাথা দাড়িতেও তৈল ব্যবহার করিবে এবং তৈলাক্ত হাতটি ঠোঁটের উপর মুছিয়া দিবে। যেন মানুষ ইহা ধারণা করিতে না পারে যে, তুমি রোজাদার। এমনভাবে দান করিবে যেন ডান হাতে দান করিলে বাম হাত জানিতে না পারে। নামাজ পড়ার সময় দরজায় পর্দা ঝুলাইয়া দিবে। আল্লাহ পাক প্রশংসাও তেমনি বণ্টন করেন, যেমন রুজি বণ্টন করেন।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে–

لا يقبل الله عز و جل عملا فيه مثقال ذرة من ريا

অর্থঃ "আল্লাহ পাক এমন কোন আমল কবুল করেন না, যাহাতে বিন্দু পরিমাণও রিয়া আছে।"

একবার হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মোয়াজ বিন জাবাল (রাঃ)-কে

কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মোয়াজ! তুমি কাঁদিতেছ কেন? জবাবে তিনি বলিলেন, একটি হাদীছ স্মরণ হওয়াতেই কাঁদিতেছি যাহা আমি এই কবরবাসীর নিকট (রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট) শুনিয়াছি। তিনি এরশাদ করিতেন–

ان ادنى الرياء شرك

অর্থঃ "সাধারণ রিয়াও শিরকের মধ্যে গণ্য।" (তাবরানী)

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন– আমি তোমাদের ব্যাপারে রিয়া ও গোপন খাহেশের আশংকা করিতেছি। বস্তুতঃ গোপন খাহেশও রিয়া বটে।

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছেঃ কেয়ামতের কঠিন দিনে যখন আল্লাহর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকিবে না, তখন আল্লাহর আরশের ছায়ায় এমন লোকেরাই স্থান পাইবে, যাহারা এমনভাবে দান করিত যে, ডান হাতে দান করিলে বাম হাত তাহা টের পাইত না। (বোখারী, মুসলিম)

এক হাদীসে আছে ঃ"গোপন আমল প্রকাশ্য আমলের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী ফজিলতপূর্ণ।" (বায়হাকী)

আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ কেয়ামতের দিন রিয়াকারদিগকে এইভাবে ডাকা হইবে– হে বদকার! হে গাদ্দার! হে রিয়াকার! তোমার আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে, তোমার ছাওয়াব শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন এমন লোকদের নিকট গিয়া উহার বিনিময় প্রার্থনা কর, যাহাদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে সেই আমল করিতে। (ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহার খেদমতে আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেনঃ আমি আমার উম্মতের শিরকের ব্যাপারে শঙ্কিত। তাহারা না মূর্তি পূজা করিবে, না চাঁদ-সূর্য ও পাথরের পূজা করিবে। তাহারা বরং নিজেদের আমলের মধ্যে রিয়া করিবে। (ইবনে মাজা, হাকিম)

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ আল্লাহ পাক পৃথিবী সৃষ্টি করিবার পর পৃথিবী উহার মধ্যস্থিত সকল বস্তুসহ কাঁপিতে লাগিল। অতঃপর আল্লাহ পাক পাহাড় সৃষ্টি করিয়া ঐগুলিকে পেরেক স্বরূপ স্থাপন করিলেন। এই সময় ফেরেশতাগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিল যে, আল্লাহ পাক পাহাড় অপেক্ষা শক্ত অন্য কোন বস্তু সৃষ্টি করেন নাই। পরে আল্লাহ লোহা সৃষ্টি করিলেন এবং লোহা পাহাড়কে কাটিয়া দিল। অতঃপর

আল্লাহ আগুন সৃষ্টি করিলেন এবং আগুন লোহাকে গালাইয়া দিল। উহার পর আল্লাহর আদেশে পানি আগুনকে নিভাইয়া দিল। আল্লাহর আদেশ পাইয়া বায়ু পানিকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল। এই সব অবস্থা দেখিয়া ফেরেশতাদের মধ্যেও এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল যে, সর্বাধিক কঠিন বস্তু কোন্‌টি। পরে তাহারা আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিল, আয় পরওয়ারদিগারে আলম! আপনার সৃষ্টিকুলের মধ্যে কোন্ বস্তুটি সর্বাধিক কঠিন? এরশাদ হইলঃ আমি আদমের অন্তর অপেক্ষা কঠিন বস্তু আর কিছু সৃষ্টি করি নাই। সে ডান হাতে দান করিলে বাম হাতকে তাহা জানিতে দেয় না। (তিরমিজী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রাঃ) এক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন, একদা সেই লোকটি হযরত মোয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর নিকট আরজ করিল যে, আমাকে এমন একটি হাদীস শোনান যাহা আপনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তিনি এমনভাবে কাঁদিতে লাগিলেন যে, এক পর্যায়ে এমন আশংকা হইতে লাগিল যেন আর কোন দিনই তাহার এই কান্না নিবারণ হইবে না। পরে কান্না প্রশমন হইলে তিনি বলিলেন, একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে মোয়াজ! আমি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়া বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ হউক, আপনি বলুন। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি তোমাকে একটি কথা বলিতেছি, তুমি যদি সেই কথাটি স্মরণ রাখ, তবে উপকৃত হইবে, আর ভুলিয়া গেলে আল্লাহর নিকট কোন যুক্তিই কাজে আসিবে না। হে মোয়াজ! আল্লাহ তায়ালা পৃথিবী সৃষ্টি করার পূর্বে সাতজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি আসমান সমূহ সৃষ্টি করেন এবং প্রতিটি আসমানে ঐ সাতজন ফেরেশতার একজনকে প্রহরী নিযুক্ত করেন। আল্লাহ পাক প্রতিটি আসমানকেই অত্যন্ত আজমত পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করেন।

মানুষের আমলের হেফাজতকারী ফেরেশতা মানুষের সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কৃত আমলসমূহ লইয়া আসমানের দিকে উঠে। মানুষের সেই আমল সূর্যের আলো হইতেও উজ্জ্বল হয়। ফেরেশতা যখন এই আমল লইয়া প্রথম আসমানে যায়, তখন সেখানে নিযুক্ত প্রহরী ফেরেশতা বান্দার আমলের হেফাজতকারী ফেরেশতাকে বলে, এই আমল ফেরৎ লইয়া যাও এবং আমলকারীর মুখের উপর নিয়া নিক্ষেপ কর। আমি গীবতের ফেরেশতা। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন এমন কোন ব্যক্তির আমল উপরের দিকে উঠিতে না দেই যে মানুষের গীবত করে। এই সময় আমল-সংরক্ষণকারী ফেরেশতা বান্দার অন্য কোন আমল বাহির করিয়া দেখায় এবং উহার উসিলায় উপরে আরোহণ করে।

এইভাবে দ্বিতীয় আসমানে যাওয়ার পর তথায় নিযুক্ত প্রহরী ফেরেশতা আমল বহনকারী ফেরেশতাকে বাধা দিয়া বলে, এই আমল ফেরৎ লইয়া গিয়া আমলকারীর মুখের উপর নিয়া নিক্ষেপ কর। এই ব্যক্তি নিজের আমল দ্বারা অমুক পার্থিব বিষয় প্রত্যাশা করিয়াছিল। আমার পরওয়ারদিগার আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন এইরূপ আমল উপরের দিকে যাইতে না দেই। এই ব্যক্তি লোকজনের আসরে বসিয়া গর্ব করিত। অতঃপর আমল বহনকারী ফেরেশতা বান্দার এমন আমল লইয়া উপরে আরোহণ করে, যাহা হইতে নূর বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। ফেরেশতাগণ অবাক বিস্ময়ে বান্দার সেই আমল প্রত্যক্ষ করে।

এইভাবে তৃতীয় আসমানে যাওয়ার পর তথায় নিযুক্ত প্রহরী ফেরেশতা আমল বহনকারী ফেরেশতাকে বাধা দিয়া বলে, এই আমল ফেরৎ লইয়া যাও এবং আমলকারীর মুখের উপর নিয়া নিক্ষেপ কর। আমি অহংকারের ফেরেশতা। আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন এইরূপ কোন আমল উপরের দিকে উঠিতে না দেই। এই লোক মজলিসে বসিয়া মানুষের সঙ্গে অহংকার করিত। অতঃপর ফেরেশতা বান্দার এমন আমল লইয়া উপরের দিকে আরোহণ করিবে যাহা উজ্জ্বল তারকার মত জ্বল জ্বল করিতে থাকিবে। ঐ আমল হইতে হজ্ব, ওমরা, নামাজ-রোজা, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি ধ্বনিত হইবে। চতুর্থ আসমানের ফেরেশতা আমল বহনকারী ফেরেশতার গতিরোধ করিয়া বলে, এই আমল বান্দার মুখ, পিঠ ও পেটের উপর গিয়া নিক্ষেপ কর। আমি অহংকার ও আত্মগরিমার ফেরেশতা। আমার আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন এইরূপ কোন আমল উপরের দিকে যাইতে না দেই। এই ব্যক্তি যখনই কোন নেক আমল করিত, তখনই উহার সঙ্গে আত্মগরিমার মিশ্রণ ঘটাইত।

অতঃপর আমল বহনকারী ফেরেশতা বান্দার এমন আমল লইয়া পঞ্চম আসমানের দিকে অগ্রসর হয়, যাহা বাসর রাতের বধুর মত সজ্জিত হয়। সেখানে নিযুক্ত প্রহরী-ফেরেশতা আমলবহনকারী ফেরেশতাকে বাধা দিয়া বলে, এই আমল উহার মালিকের মুখের উপর নিয়া নিক্ষেপ কর এবং উহার বোঝা তাহার ঘাড়ের উপরই রাখিয়া দাও। আমি হিংসার ফেরেশতা। আমার রব আমাকে হুকুম করিয়াছেন, যেন এইরূপ কোন আমল উপরের দিকে উঠিতে না দেই। এই ব্যক্তি এমন লোকদের সঙ্গে চলাফিরা করিত যাহারা তাহার মতই এলেম হাসিল করিয়াছিল এবং তাহার মতই আমল করিত। তবে কেহ তাহার তুলনায় বেশী এবাদত করিলে তাহার সঙ্গে সে হিংসা করিত এবং তাহাকে বিদ্রূপ করিত। অতঃপর আমল বহনকারী ফেরেশতা বান্দার নামাজ-রোজা, হজ্ব-জাকাত, ওমরা ইত্যাদি আমল লইয়া ষষ্ঠ আসমানের দিকে অগ্রসর হয়। তথায় নিযুক্ত প্রহরী ফেরেশতাও তাহাকে বাধা দিয়া বলে, এইসব আমল আমলকারীর মুখের উপর নিয়া নিক্ষেপ কর। আল্লাহর কোন বান্দা কোনরূপ

মুসীবত ও পেরেশানীর শিকার হইলে এই ব্যক্তি তাহাদের উপর রহম করিত না। বরং কেহ বিপদগ্রস্ত হইলে তাহাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত। আমি অনুগ্রহ ও রহমের ফেরেশতা। আমার রব আমাকে হুকুম দিয়াছেন, যেন এইরূপ কোন আমল উপরের দিকে যাইতে না দেই।

অতঃপর আমল বহনকারী ফেরেশতা বান্দার নামাজ-রোজা, সদকাহ, জাকাত, মোজাহাদা ও তাকওয়া ইত্যাদি আমল লইয়া সপ্তম আসমানের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে নিযুক্ত প্রহরী ফেরেশতা আমল বহনকারী ফেরেশতাকে বাঁধা দিয়া বলে, এই সব আমল উহার মালিকের মুখের উপর গিয়া নিক্ষেপ কর। আমি এইরূপ আমল উপরের দিকে যাইতে দিব না, যাহা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাসিলের পরিবর্তে গাইরুল্লাহর নিয়তে করা হইয়াছে। এই ব্যক্তি নিজের আমল ও এবাদতের মাধ্যমে এমন কামনা করিত যেন ওলামা ও ফোকাহাদের মজলিসে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং চতুর্দিকে তাহার সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন এই জাতীয় কোন আমল উপরের দিকে যাইতে না দেই। এমন সব আমল যাহা আল্লাহর জন্য করা হয় নাই- উহাই রিয়া। আর আল্লাহ পাক রিয়াকারের আমল কবুল করেন না।

অবশেষে আমল বহনকারী ফেরেশতা বান্দার নামাজ, রোজা, হজ্ব, ওমরা, জিকির, উত্তম চরিত্র ইত্যাদি আমলসমূহ লইয়া সামনে অগ্রসর হয়। এইসব আমলের মিছিলে আকাশের সমস্ত ফেরেশতাও শরীক হয়। এই পর্যায়ে সমস্ত পর্দা সরাইয়া দেওয়া হইলে তাহারা বান্দার নেক আমল সমূহ লইয়া আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হইয়া বান্দার নেক আমলের সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমরা আমার বান্দার আমলের হেফাজতকারী, আর আমি আমার বান্দার নফসের নেগরান। বান্দা তাহার আমলের মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের এরাদা করে নাই। বরং তাহার নিয়ত ছিল অন্য কিছু। সুতরাং তাহার উপর আমার অভিশাপ বর্ষিত হউক। এই সময় সমস্ত ফেরেশতা বলিয়া উঠিবে, আয় পরওয়ারদিগার! তাহার উপর আপনার এবং আমাদের অভিশাপ বর্ষিত হউক। গোটা আকাশ মণ্ডলি হইতে আওয়াজ আসিবে, তাহার উপর আল্লাহর এবং আমাদের অভিশাপ বর্ষিত হউক। অতঃপর আসমান ও জমিনের প্রতিটি অনু-পরমাণু হইতে তাহার উপর অভিশাপ বর্ষিত হইবে।

হযরত মোয়াজ (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, আপনি আল্লাহর রাসূল আর আমি (অধম বান্দা) মোয়াজ। এখন আমি কি করিব বলিয়া দিন। আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ হে মোয়াজ! তুমি আমার অনুসরণ কর। তোমার যেই সকল ভাই এলমে কোরআনের ধারক ও বাহক, তাহাদের গীবত করিও না। নিজের গোনাহের জন্য নিজেকেই দোষী

করিয়া নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করিতে চাহিও না। অপরের তুলনায় নিজেকে বড় মনে করিও না এবং দুনিয়ার কাজকে আখেরাতের আমলের সঙ্গে মিশ্রিত করিও না। মানুষের সঙ্গে অহংকার করিও না। কেননা এইরূপ করিলে তোমার বদ আখলাকের কারণে লোকেরা তোমাকে ভয় করিবে। তোমার নিকট একাধিক মানুষ থাকিলে তাহাদের সকলকে বাদ দিয়া একজনের সঙ্গে কানে কানে কথা বলিও না। মানুষেল নিকট নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করিও না। এইরূপ করিলে দুনিয়াতে তোমার বরকত নষ্ট হইয়া যাইবে। মানুষের মানহানী করিও না। অন্যথায় রোজ কেয়ামতে দোজখের কুকুর তোমার গোশত ছিঁড়িয়া ফেলিবে। আল্লাহ পাক বলেন–

وَّ النّٰشِطٰتِ نَشْطًا =

অর্থঃ "শপথ তাহাদের যাহারা আত্মার বাঁধন খুলিয়া দেয় মৃদুভাবে।"

(সূরা নাযিয়াতঃ আয়াত ২)

হে মোয়াজ! তুমি কি বলিতে পার উহা কি? আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলিয়া দিন উহা কি? এরশাদ হইলঃ উহা দোজখের কুকুর, গোশত ও হাড্ডি দাঁত দ্বারা চিরিয়া ফেলিবে। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ হউক, আপনি যেই সব উত্তম স্বভাবের কথা বলিলেন, উহার উপর কাহারা আমল করিতে পারিবে? আর কাহারা দোজখের কুকুর হইতে নিরাপদ থাকিতে পারিবে? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেনঃ হে মোয়াজ! আল্লাহ পাক যাহাকে তাওফীক দান করিবেন, তাহার পক্ষে উহার উপর আমল করা কোন কষ্টকর নহে। বর্ণনাকারী বলেন, উপরোক্ত হাদীস শোনার পর হইতে হযরত মোয়াজ (রাঃ) অধিকাংশ সময় কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে মশগুল থাকিতেন।

রিয়া সম্পর্কে মহাজনদের উক্তি

একবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এক ব্যক্তিকে মাথা নত করিয়া রাখিতে দেখিয়া বলিলেন– 'বিনয়' মাথানত করিয়া রাখার মধ্যে নহে। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রহঃ) এক ব্যক্তিকে মসজিদে সেজদারত অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, এই আমলটি যদি তুমি নিজের ঘরে করিতে, তবে কতইনা ভাল হইত।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রিয়াকারের লক্ষণ তিনটি–

০ যখন একাকী হয়, তখন অলসতা বাড়িয়া যায়।

০ মানুষ দেখিলেই তৎপর হইয়া উঠে এবং

০ কেহ প্রশংসা করিলে বেশী বেশী আমল করে। আর নিন্দা করিলে তাহার

আমল হ্রাস পায়।

এক ব্যক্তি হযরত ওবাদা ইবনুস্ সামেত (রাঃ)-এর খেদমতে আরজ করিলেন, আমি তলোয়ার হাতে আল্লাহর পথে এই নিয়তে জেহাদ করিব যেন আল্লাহ পাক আমার উপর সন্তুষ্ট হন এবং মানুষও আমার প্রশংসা করে। এই কথা শুনিয়া হযরত ওবাদা বলিলেন, তবে উহার বিনিময়ে তুমি কিছুই পাইবে না। লোকটি তিনবার এই কথা নিবেদন করিলে প্রতিবারই তিনি এই জবাব দিয়া সবশেষে বলিলেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ "আমি সর্বাপেক্ষা বেনিয়াজ ও অমুখাপেক্ষী।"

এক ব্যক্তি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ)-এর খেদমতে আরজ করিল, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নেক আমল করিয়া এইরূপ প্রত্যাশা করে যেন ঐ আমলের বিনিময়ে সে ছাওয়াব প্রাপ্ত হয় এবং মানুষও তাহার প্রশংসা করে। সে কি ইহা ঠিক করে? জবাবে তিনি বলিলেন, তোমরা কি ইহা কামনা করে যে, তোমাদের উপর আল্লাহর গজব নাজিল হউক? লোকটি বলিল, আমরা কখনো এইরূপ কামনা করিব না। তিনি বলিলেন, তবে তোমরা সকল আমলই এখলাসের সহিত কেবল আল্লাহর জন্যই করিও।

হযরত জোহ্হাক (রহঃ) বলেন, তোমরা কখনো এইরূপ বলিও না যে, এই আমলটি আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করিতেছি। কিংবা এইরূপও বলিও না যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও স্বজনদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করিতেছি। কেননা, আল্লাহ পাকের কোন শরীক নাই।

একদা হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে চাবুক মারিবার পর লোকটিকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট হইতে এই প্রহারের বদলা গ্রহণ কর। লোকটি আরজ করিল, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে এবং আপনার খাতিরে ক্ষমা করিয়া দিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে তো তোমার কিছুই লাভ হইল না। হয় তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া আমার উপর অনুগ্রহ কর, কিংবা আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা কর। লোকটি বলিল, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) ফরমাইলেন, এইবার তুমি ঠিক করিয়াছ।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, আমি এমন কতক লোকের সাহচর্য লাভ করিয়াছি, যাহাদের অন্তর এলেম ও মারেফাত-জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা যদি সেইসব হেকমতপূর্ণ কথা আলোচনা করিতেন তবে তাহারা নিজেরাও উপকৃত হইতেন এবং শ্রোতাগণও লাভবান হইত। কিন্তু তাহারা প্রসিদ্ধি লাভের ভয়ে নিজেদের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এমনকি তাহারা এই প্রসিদ্ধি লাভের আশংকার কারনেই পথ চলাচলের সময় কোন কষ্টদায়ক

বস্তু দেখিলে তাহা সরাইয়া দিতেন না।

রোজ কেয়ামতে রিয়াকারদিগকে এইভাবে আহ্বান করা হইবে- হে গাদ্দার! হে রিয়াকার! হে ক্ষতিগ্রস্ত! হে বদকার! দূর হও এবং আজ এমন ব্যক্তিদের নিকট বিনিময় প্রার্থনা কর যাহাদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে তোমরা আমল করিতে। আজ আমার নিকট তোমাদের কোন বিনিময় নাই।

হযরত ফোজায়েল ইবনে আয়াজ (রহঃ) বলেন, এক সময় মানুষ আমলের মধ্যে রিয়া করিত। কিন্তু বর্তমানে সেই অবস্থার আরো অবনতি ঘটিয়াছে। অর্থাৎ এখন লোকেরা আমল ছাড়া শুধুই রিয়া করে। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাক মানুষের আমলের বদলা দেন তাহার নিয়ত অনুযায়ী। কেননা, নিয়তের মধ্যে কোন রিয়া হয় না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি রিয়া করে সে ভাল নহে। কেননা, সে আল্লাহ পাকের তাক্দীরের উপর প্রবল হইতে চাহে। সে কামনা করে যেন মানুষ তাহাকে ভাল মনে করে। যেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট মন্দ, মানুষ তাহাকে কেমন করিয়া ভাল মনে করিবে? মোমেনদের কর্তব্য, এইরূপ ব্যক্তিকে চিনিয়া রাখা। হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, মানুষ যখন রিয়া করে, তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছে।

হযরত মালেক বিন দীনার (রহঃ) বলেন, ক্বারী তিন প্রকার- ১. আল্লাহর ক্বারী, ২. দুনিয়ার ক্বারী, ৩. বাদশাহদের ক্বারী। হযরত মোহাম্মদ বিন ওয়াসি' ছিলেন আল্লাহর ক্বারী। হযরত ফোজায়েল বিন আয়াজ (রহঃ) বলেন, কেহ রিয়াকার দেখিতে চাহিলে সে যেন আমাকে দেখে।

মোহাম্মদ ইবনুল মোবারক ছুরী (রহঃ) বলেন, তুমি দিনের বেলা নেক লোকদের অবস্থা অবলম্বন করিও না। দিনের বেলা অপেক্ষা উহা রাতেই অবলম্বন করা উত্তম। কেননা, দিনের বেলা নেক অবস্থা অবলম্বন করিলে উহা হইবে মাখলুকের জন্য; আর রাতের নির্জনে উহা হইবে শুধুই রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে।

হযরত আবু সোলাইমান (রহঃ) বলেন, মানুষের পক্ষে আমল করা অপেক্ষা আমলের হেফাজত করা অধিক কঠিন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রহঃ) বলেন, কতক লোক বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে বটে, কিন্তু বাস্তবে তাহারা খোরাসানেই অবস্থান করে। লোকেরা উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যাহারা এই উদ্দেশ্যে তাওয়াফ করে যে, মানুষের মাঝে আমি "তাওয়াফকারী" হিসাবে খ্যাত হইব, তাহারা এইরূপ তাওয়াফের কোন ছাওয়াব পাইবে না। বরং ভিন্ন কোন শহরে সাধারণ কোন প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করা আর এই তাওয়াফের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম

(রহঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করে, সেই ব্যক্তির ঈমান পূর্ণাঙ্গ নহে।

রিয়ার হাকীকত

প্রকাশ থাকে যে, রিয়া আরবী রুইয়াত ধাতু হইতে উদ্ভূত। রুইয়াত অর্থ দেখা। রিয়া শব্দের অর্থ উত্তম স্বভাব ও কর্ম প্রদর্শন করিয়া মানুষের অন্তরে সম্মান ও মর্যাদা স্থাপনের চেষ্টা করা। এই উত্তম কর্ম এবাদত-বন্দেগী হওয়া জরুরী নহে। বরং অন্য যে কোন কর্মের মাধ্যমেও এই মর্যাদা হাসিল হইতে পারে। তবে সাধারণভাবে রিয়া বলা হয় এবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে মানুষের অন্তরে সম্মানের আসন স্থাপনের প্রচেষ্টাকে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে রিয়াকে চারিভাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে-

১. রিয়াকার। অর্থাৎ আবেদ।

২. এমন ব্যক্তি যাহাকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে রিয়া করা হয়।

৩. এমন কর্ম বা এবাদত যার মাধ্যমে রিয়া প্রদর্শন করা হয়।

৪. স্বয়ং রিয়া।

এমন সব বিষয় যাহাতে রিয়া বিদ্যমান

রিয়াকার ব্যক্তি পাঁচটি বিষয়ের মাধ্যমে রিয়া প্রদর্শন করিয়া সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন ও মানুষের অন্তরে সম্মানের আসন পাইতে চাহে। সেই পাঁচটি বিষয় হইল- ১. দেহ, ২. আকার-আকৃতি বা অঙ্গ-অবয়ব, ৩. কথা, ৪. কর্ম এবং অনুসারী বা সাথী-সঙ্গী।

দুনিয়াদার ব্যক্তিও এই পাঁচটি বিষয়ের মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদা হাসিল করে বটে। কিন্তু এবাদত নহে- এমন বস্তুর মাধ্যমে রিয়া করা এবাদতের মাধ্যমে রিয়া করার তুলনায় হাল্কা।

দেহ দ্বারা রিয়া

রিয়ার প্রথম প্রকার হইল দেহ প্রদর্শন করা। উহার পদ্ধতি হইল- দেহের শীর্ণ ও ফ্যাকাশে ভাব প্রদর্শন করা যেন উহার ফলে মানুষ মনে করে যে, এই ব্যক্তি দ্বীনের উপর মেহনত করিতে করিতে একেবারে দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং আখেরাতের ভয়ে সে অনুক্ষণ ভীত ও বিমর্ষ থাকে। অর্থাৎ অনাহার-অর্ধাহারে ক্রমাগত এবাদত-বন্দেগী করার ফলে তাহার দেহটি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং রাতের পর রাত বিনিদ্র এবাদতই তাহার চেহারা ফ্যাকাশে হওয়ার কারণ। অনুরূপভাবে তাহার উস্কখুস্ক চুল এই কথা প্রমাণ করে যে, লোকটি সদাসর্বদা দ্বীনের ফিকিরে ব্যতিব্যস্ত থাকে এবং অনুক্ষণ এবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকার

ফলে তাহার গলার স্বর ক্ষীণ, ঠোঁট শুষ্ক ও চক্ষু কোটরাগত হইয়া গিয়াছে। আর দেহের এইসব অবস্থা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, লোকটি নিশ্চয়ই সর্বদা রোজা রাখে।

এই কারণেই হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম বলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ রোজা রাখিলে সে যেন মাথায় তৈল ব্যবহার করিয়া তৈলাক্ত হাতটি ঠোঁটের উপর মুছিয়া লয় এবং চিরুনী দ্বারা কেশ বিন্যাস করিয়া চোখে সুরমা ব্যবহার করে। যেন লোকেরা তাহাকে রোজাদার বলিয়া অনুমান করিতে না পারে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-ও অনুরূপ নসীহত করিয়াছেন। অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে তাহারা রিয়ার গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্যই এইসব নসীহত করিয়াছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) রোজাদারগণকে বে-রোজাদার মানুষের মত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। মোটকথা, দ্বীনদার লোকেরা উপরে বর্ণিত দেহের বিভিন্ন অবস্থা প্রদর্শনের মাধ্যমে রিয়া করে, আর দুনিয়ার লোকেরা উহার বিপরীতে স্থূল দেহ, সুঠাম শরীর, স্বচ্ছবর্ণ ও দৈহিক শক্তি প্রদর্শন করিয়া রিয়া করে।

আকার-আকৃতি ও পোশাকের মাধ্যমে রিয়া

রিয়ার দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে আকার-আকৃতি, অঙ্গ-অবয়ব ও পোশাকের মাধ্যমে রিয়া প্রদর্শন করা। যেমন মাথার চুল উস্ক-খুস্ক ও এলোমেলো রাখা। গোঁফ মুণ্ডন করা, মাথা নত করিয়া ধীরে ধীরে পথ চলা, কপালে সেজদার চিহ্ন অবশিষ্ট রাখা, মোটা কাপড় পরিধান করা, পশমের জুব্বা ব্যবহার করা, খাটো আস্তিনের জামা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলাইয়া পরিধান করা, ময়লা ও ছিন্ন বস্ত্র ব্যবহার করা- ইত্যাদি। এইগুলি এই কারণে করা হয় যেন লোকেরা তাহাকে সুন্নতের পাবন্দ এবং আল্লাহর নেক বান্দা মনে করে। অনুরূপভাবে তালিযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার, জায়নামাজের উপর নামাজ আদায়, সূফীগণের মত নীল রঙ্গের বস্ত্র ব্যবহার, পাগড়ী বাঁধার পর মাথার উপর সাদা রুমাল জড়াইয়া উহার প্রান্ত চক্ষুর উপর পর্যন্ত ঝুলাইয়া রাখা- এইসবই রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া আলেম না হইয়াও আলেমের মত লেবাস পরিধান করা এবং চলাফেরা ও কথাবার্তায় আলেমদের ভাব প্রদর্শন করা যেন লোকেরা তাহাকেও আলেম মনে করিয়া ইজ্জত করে- এইগুলিও রিয়ার মধ্যে গণ্য।

যাহারা লেবাস-পোশাকের মাধ্যমে রিয়া করে, তাহাদের মধ্যে কতক শ্রেণীভেদ রহিয়াছে। যেমন এক শ্রেণীর লোক নিজেদেরকে জাহেদ ও সাধক হিসাবে জাহির করিয়া নেক লোকদের নিকট ইজ্জত ও সম্মান পাইতে চাহে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা পুরাতন, ময়লা ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করে যেন উহা দেখিয়া

লোকেরা মনে করে- দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগ-বিলাসের প্রতি ইহাদের কিছুমাত্র আকর্ষণ নাই। এই শ্রেণীর লোকদিগকে যদি মধ্যম মানের পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করানো হয়- যাহা বুজুর্গানে দ্বীন ব্যবহার করিতেন, তবে উহাতে তাহারা অন্তহীন কষ্ট অনুভব করে। কেননা, এই ক্ষেত্রে তাহারা মনে করে পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করিলে লোকেরা হয়ত এমন সন্দেহ করিতে পারে যে, এই লোকটি যুহ্‌দ ও তাক্‌ওয়া ত্যাগ করিয়া এখন দুনিয়াদারদের চালচলন অবলম্বন করিয়াছে।

অপর একটি শ্রেণী দুনিয়াদার ও দ্বীনদার এই উভয় পক্ষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহে। অর্থাৎ দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ, উজীর, ব্যবসায়ী এবং ওলামা-মাশায়েখ ও সূফী সাধক ইত্যাদি সকলের নিকটই সম্মান পাইতে চাহে। এই শ্রেণীর লোকেরা সর্বদা বড় সমস্যায় থাকে। কারণ, উত্তম পোশাক পরিধান করিলে সূফীগণ তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করে; আবার তালিযুক্ত সাধারণ পোশাক পরিধান করিলে রাজা-বাদশাহ ও বিত্তবানদের নজরে হেয় হইতে হয়। অথচ তাহারা কোন পক্ষের নিকটই নিজেদের মান ক্ষুণ্ন হইতে দিতে চাহে না। এই কারণে তাহারা মিহি জুব্বা এবং উন্নত মানের রঙ্গীন তালিযুক্ত লেবাস পরিধান করে। অর্থাৎ দৃশ্যতঃ তাহাদের পোশাক সাধারণ মনে হইলেও অনেক সময় মূল্যমানে তাহা বিত্তবানদের পোশাক হইতেও দামী হয়। তাহাদের পোশাকের রং এবং উহার ধরন-ধারণ আল্লাহওয়ালাদের পোশাকের মত হয়। অর্থাৎ এই শ্রেণীর লোকেরা দ্বীনদার ও দুনিয়াদার এই উভয় শ্রেণীর নিকটই এক রকম গ্রহণীয় ও প্রশংসনীয় হইতে চাহে। এই শ্রেণীর লোকদিগকে যদি জোরপূর্বক মোটা ও ময়লা বস্ত্র পরিধান করাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে কিছুতেই তাহারা উহাতে সম্মত হয় না। এই ক্ষেত্রে তাহাদের আশংকা হয়- এইরূপ পোশাক পরিধান করিলে রাজা-বাদশাহ ও বিত্তবানদের নজরে তাহারা হীন ও তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইবে। অনুরূপভাবে তাহারা রেশমী ও মূল্যবান কাপড়ও পরিধান করিতে চাহে না। কেননা, তাহারা মনে করে, এইরূপ কাপড় পরিধান করিলে লোকেরা বলিবে, ইহারা বুজুর্গানেদ্বীনের তরীকা ও পন্থা ত্যাগ করিয়াছে।

সারকথা হইল, এই ক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রেণীই যেই লেবাস ও পোশাককে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা ও সুখ্যাতির জন্য সহায়ক মনে করে, উহা হইতে নিম্নস্তর বা উচ্চস্তরের লেবাস পরিধান করিতে সম্মত হয় না। সেই লেবাস মোবাহ হইলেও না । অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে দ্বীনদার লোকেরা এইভাবেই রিয়া করে। পক্ষান্তরে দুনিয়াদারগণ উন্নত ও দামী পোশাক, মূল্যবান চাদর, দামী পাগড়ী ও জুব্বা, উন্নত সওয়ারী ও বিলাস সামগ্রীর মাধ্যমে রিয়া করে। অর্থাৎ এই দুনিয়াদারগণ ঘরের ভিতর সাধারণ পোশাক পরিধান করে বটে কিন্তু

বাহিরে যাওয়ার সময় দামী পোশাকে সাজগোজ করিয়া বাহির হয় যেন লোকেরা তাহাদিগকে বিত্তবান মনে করে।

কথার মাধ্যমে রিয়া

রিয়ার তৃতীয় প্রকার হইল 'কথা'। অর্থাৎ দ্বীনদার লোকেরা কথার মাধ্যমে রিয়া করে। উহার পদ্ধতি হইল– মানুষকে ওয়াজ-নসীহত করিয়া বেড়ানো, জ্ঞান ও হেকমতের কথা বলা, সচরাচর কথাবার্তায় ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কতক হাদীস ও মহাজনদের উক্তি মুখস্থ করিয়া লওয়া এবং মানুষকে শোনাইবার জন্য বুজুর্গানেদ্বীনের কিছু হালাত ইয়াদ করিয়া লওয়া– ইত্যাদি। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ জনসমাগমে জিকিরে লিপ্ত থাকে এবং অকারণেই ঠোঁট নাড়াইতে থাকে যেন লোকেরা মনে করে, লোকটি বড়ই নেক এবং সর্বদা আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন। ইহারা সাধারণ মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে এবং কাহাকেও কোন অন্যায় করিতে দেখিলে ভয়ানক অসন্তোষ প্রকাশ করে। এমনিভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় ক্ষীণ স্বরে কথা বলা এবং করুণ ও মিহি আওয়াজে কোরআন তেলাওয়াত করা যেন মানুষ মনে করে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং আখেরাতের ফিকিরে বড়ই পেরেশান। নির্দিষ্ট কতক হাদীস ইয়াদ করিয়া রাখা ও বড় বড় মোহাদ্দেসগণের সঙ্গে সখ্যতার দাবী করা। কেহ কোন হাদীস বর্ণনা করিলে সঙ্গে সঙ্গে উহার উপর মন্তব্য করা কিংবা এইরূপ বলা যে, হাদীসটি যথার্থ বা ইহার বর্ণনায় ক্রটি রহিয়াছে। অর্থাৎ এইরূপ মন্তব্যের ফলে যেন মানুষ মনে করে যে, হাদীস বিষয়ে লোকটির অগাধ জ্ঞান রহিয়াছে। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য দীর্ঘ বক্তব্যের অবতারণা করা এবং নিজের এলেম ও বিদ্যা-বুদ্ধি জাহির করার জন্য কথায় কথায় কোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া।

কথার মাধ্যমে দ্বীনের মধ্যে রিয়া করার আরো অসংখ্য অবস্থা রহিয়াছে। এখানে নমুনা হিসাবে উহার কতক অবস্থা তুলিয়া ধরা হইল। এদিকে দুনিয়াদারগণ এই ক্ষেত্রে কিছু শের-বয়াত ও বুজুর্গানে দ্বীনের উক্তি মুখস্থ করিয়া রাখা এবং উহা বর্ণনার ক্ষেত্রে ভাষার অলংকার ও সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা। জ্ঞানী-গুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে প্রভাবিত করার জন্য নির্দিষ্ট কতক বাক্য ও শব্দ মুখস্থ করিয়া সময়মত উহা ব্যবহার করা এবং মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাহাদের প্রতি কৃত্রিম সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করা ইত্যাদি।

আমলের মাধ্যমে রিয়া

রিয়ার চতুর্থ প্রকার হইল 'আমল'। অর্থাৎ দ্বীনদার ব্যক্তিগণ আমলের মাধ্যমে রিয়া করিয়া থাকে। উহার পদ্ধতি হইল– নামাজ দীর্ঘায়ীত করা। রুকু-সেজদায় বিলম্ব করা এবং স্থিরতা ও গাম্ভীর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে মাথা ঝুকাইয়া রাখা, হাত-পা সোজা করিয়া রাখা– ইত্যাদি।

অর্থাৎ যেইসব আমল দ্বারা নামাজে খুশু-খুজু প্রকাশ পায় সেইগুলি কৃত্রিমভাবে প্রকাশ করা। নামাজের মত রোজা, হজ্ব, জাকাত, জেহাদ, মানুষকে আহার করানো– ইত্যাদির মাধ্যমে রিয়া করা হয়। চলনে-বলনে শির নত করিয়া বিনয় প্রকাশের মাধ্যমেও রিয়া হইয়া থাকে। রিয়াকার ব্যক্তি নিজের কোন কাজে হয়ত দ্রুততার সহিত ধাবিত হয়, কিন্তু কোন দ্বীনদার মানুষের নজরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের গতি শ্লথ করতঃ মাথা ঝুঁকাইয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। অতঃপর সেই দ্বীনদার ব্যক্তিটি দৃষ্টি আড়াল হইলে পুনরায় সেই আগের গতিতে চলিতে থাকে। পরে আবার দেখিয়া ফেলিলে সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ী চলন অবলম্বন করে। অর্থাৎ এই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করে না; বরং মানুষকে দেখাইবার জন্যই বিনয় প্রকাশ করে, যেন লোকেরা তাহার চালচলন দেখিয়া মনে করে যে, বাস্তবিক লোকটি আল্লাহর নেক বান্দা বটে।

পক্ষান্তরে দুনিয়াদারগণ সদর্প পদচারণার মাধ্যমে রিয়া করে। তাহারা এই কারণে এইরূপ রিয়া করে যেন উহার ফলে মানুষের মাঝে তাহাদের ইজ্জত-সম্মান বড়ত্ব বৃদ্ধি পায়।

সাথী-সঙ্গীদের সঙ্গে রিয়া

রিয়ার পঞ্চম প্রকার হইল সাথী-সঙ্গী ও সাক্ষাতপ্রার্থীদের সঙ্গে রিয়া করা। দ্বীনদার লোকেরা নিজের সাথী সঙ্গী ও সাক্ষাতপ্রার্থীদের সঙ্গে রিয়া করিয়া থাকে। উদাহরণতঃ এইরূপ কামনা করা যে, আলেমগণ যেন আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে। উহার ফলে লোকেরা মনে করিবে, অমুক ব্যক্তি নিশ্চয়ই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং এই কারণেই আলেমগণ আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করে। কেহ কেহ আবার নিজের নিকট রাজা-বাদশাহ ও প্রশাসনের আমলাদের আগমন প্রত্যাশা করে। যেন সাধারণ লোকদের নিকট তাহার মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। অনেকে আবার কথায় কথায় ওলামা-মাশায়েখগণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যেন এই কথা প্রমাণ হয় যে, ইনি অসংখ্য আলেম ও পীর-বুজুর্গের সাহচর্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। অর্থাৎ এই শ্রেণীর রিয়াকারগণ মাশায়েখ ও পীর-বুজুর্গের সান্নিধ্য লাভ এবং তাহাদের দ্বারা উপকৃত হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করে। বিশেষতঃ ধর্মীয় বিষয়ে যখন কোন বিতর্ক দেখা দেয়, তখন প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার সময় এইরূপ দাবী

করা হয় যে, আমি অমুক পীরকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি, অমুক বুজুর্গকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি এবং অমুক অমুক দেশ সফর করিয়া অসংখ্য বুজুর্গের সোহবতের মাধ্যমে এই বিষয়ে আমার অগাধ জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা অর্জিত হইয়াছে।

রিয়ার নিষিদ্ধতা ও বৈধতা

উপরের সুদীর্ঘ আলোচনায় রিয়ার হাকীকত এবং উহার স্বরূপ আলোচনা করা হইয়াছে। এখন আমরা পর্যালোচনা করিয়া দেখিব, শরীয়তের দৃষ্টিতে এই রিয়ার অবস্থান কি? এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যেই বিষয়টি আলোচনায় আসে তাহা হইল– রিয়া হারাম, মাকরূহ, না মোবাহ? কিংবা উহার বিস্তারিত কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে কি-না। এই প্রশ্নের জবাবে আমাদের মতামত হইল– রিয়া অর্থাৎ সুনাম-সুখ্যাতির প্রত্যাশা এবাদতের মাধ্যমেও হইতে পারে, আবার এবাদত ছাড়া অন্য বিষয়ের মাধ্যমেও হইতে পারে। তো রিয়া যদি এবাদত ছাড়া অন্য বিষয়ের মাধ্যমে হয়, তবে উহার অবস্থান হইবে ধন-সম্পদের প্রত্যাশার মত। অর্থাৎ রিয়ার মাধ্যমে যদি শুধুই মানুষের অন্তরে সম্পদ ও মর্যাদা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা হয়, তবে উহা হারাম ও নিষিদ্ধ নহে– যেমন ধন-সম্পদের প্রত্যাশা হারাম নহে। কিন্তু সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে যেমন অবৈধ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তদ্রূপ সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের ক্ষেত্রেও অবৈধ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। তো মানবের জন্য নিজের একান্ত প্রয়োজনে আবশ্যক পরিমাণ সম্পদ আহরণ যেমন উত্তম; তদ্রূপ যৎসামান্য সুখ্যাতি ও মর্যাদা হাসিল করাও উত্তম। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম মিশরের বাদশাহকে বলিয়াছিলেন–

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ، اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ *

অর্থঃ ইউসুফ বলিলঃ আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।” (সূরা ইউসুফঃ আয়াত ৫৫)

কিন্তু এখানে লক্ষ্য রাখিবার বিষয় হইল, ধন-সম্পদের আধিক্য যেমন মানুষকে অহংকারী ও বেপরওয়া করিয়া আল্লাহ পাকের জিকির ও পরকালের ফিকির হইতে গাফেল করিয়া দেয়; তদ্রূপ সুনাম-সুখ্যাতি ও মর্যাদার আধিক্যও মানুষকে গোমরাহ করিয়া দেয়। বরং ধন-সম্পদ ও মালের ফেৎনার মোকাবেলায় যশ-খ্যাতির ফেৎনা অধিক ক্ষতিকারক। সুতরাং আমরা যেমন এই কথা বলি না যে, অধিক সম্পদের মালিক হওয়া হারাম, তদ্রূপ বিপুল সংখ্যায় মানুষের অন্তরের মালিক হওয়াকেও আমরা হারাম বলি না। অবশ্য সম্পদ ও যশ-খ্যাতির আধিক্য যদি অবৈধ উপায়ে অর্জন করা হয়, তবে উহা ভিন্ন কথা

এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা বলিবঃ যশ-খ্যাতির আধিক্য প্রীতি যাবতীয় অনিষ্টের মূল– যেমন সম্পদের আধিক্য সর্ব প্রকার ফেৎনা ফাসাদের অন্যতম কারণ।

যশ-খ্যাতি ও সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট মানুষ অন্তর ও মুখের গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য কোন ব্যক্তি বিশেষ যদি নিজের চাহিদা ছাড়াই বিপুল যশ-খ্যাতি ও সুনাম-সুখ্যাতির মালিক হয় এবং উহা হইতে বঞ্চিত হইলেও ব্যাথিত না হয়, তবে এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে তাহা ক্ষতিকারক নহে।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তীতে ওলামায়ে দ্বীন যেই যশ-খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন, উহার সঙ্গে অপর কোন ব্যক্তির যশ-খ্যাতির তুলনা হইতে পারে কি? কিন্তু এই সুনাম-সুখ্যাতি তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না এবং তাহারা উহার বিলুপ্তিতেও আশংকা বোধ করিতেন না। তো নিজেকে যশ-খ্যাতির অন্বেষায় নিরত রাখা যদিও দ্বীনের জন্য ক্ষতিকারক– তবুও উহাকে আমরা নিষিদ্ধ বলিতে পারিব না। এই কারণেই আমরা বলি– কোন ব্যক্তি যদি নিজের ঘর হইতে উত্তম পোশাক পরিধান করতঃ সাজ-সজ্জা করিয়া বাহির হয়, তবে ইহা রিয়া হইলেও হারাম নহে। কেননা, ইহা এবাদতের মধ্যে রিয়া নহে, বরং দুনিয়া সংক্রান্ত রিয়া। এই মূলনীতির আলোকে অপরাপর বিষয়ের উপরও কেয়াস করিয়া লওয়া যাইবে। ইহা হারাম না হওয়ার দলীল হিসাবে নিম্নের রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করা যাইতে পারে–

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামের নিকট যাওয়ার সময় মটকার পানিতে দেখিয়া চুল ও পাগড়ী ঠিক করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও এইরূপ করেন? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেনঃ আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তিকে মোহাব্বত করেন, যেই ব্যক্তি নিজের ভাইদের নিকট যাওয়ার সময় পরিপাটি হইয়অ যায়। (ইবনে আ'দী)

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত আমলটি ছিল এবাদত। কেননা, তিনি মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া, ন্যায় ও সত্যের আনুগতের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা এবং উম্মতকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার কাজে আদিষ্ট ছিলেন। সুতরাং তিনি যদি মানুষের নিকট সাদরে গ্রহণীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র না হইবেন, তবে মানুষ কেমন করিয়া তাঁহার আনুগত্য করিবে? এই কারণে তাঁহার বাহ্যিক অবস্থাও সৌম্য ও মনোরম হওয়া আবশ্যক ছিল, যেন মানুষের নজরে তিনি হীন না হন। কেননা, সাধারণ মানুষের নজর বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ তাহাদের নজর বাতেনী অবস্থা পর্যন্ত

পৌঁছাইতে সক্ষম হয় না। সুতরাং এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন মানুষ যদি জনসাধারণের নিন্দা ও হীন দৃষ্টি হইতে বাঁচিয়া থাকার উদ্দেশ্যে নিজের লেবাস-ছুরত দুরস্ত করিয়া চলে এবং মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা কামনা করে, তবে তাহার এই প্রত্যাশাকে মোবাহ বলা হইবে। কারণ প্রতিটি মানুষেরই নিন্দার পীড়ন হইতে বাঁচার এবং সকলের সঙ্গে সদ্ভাব ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের সুফল ভোগ করার অধিকার আছে। মানুষের এই প্রত্যাশা অনেক সময় এবাদতের মধ্যে গণ্য হয়, আবার অনেক সময় তাহা নিন্দিতও হয়। ইহা নির্ভর করে মানুষের উদ্দেশ্য ও নিয়তের উপর। মানুষের উদ্দেশ্য ও নিয়ত যেইরূপ হইবে, সেই হিসাবেই উহার হুকুম আরোপিত হইবে। এই কারণেই আমরা বলি- কোন ব্যক্তি যদি একদল বিত্তবানের মধ্যে ছাওয়াবের নিয়ত ছাড়া কেবল 'দানবীর' খ্যাতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু সম্পদ ব্যয় করে, তবে উহা রিয়া হইবে বটে, কিন্তু হারাম হইবে না।

সদকা, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জেহাদ ইত্যাদি এবাদতের মাধ্যমে রিয়াকারীগণ সাধারণত দুইটি অবস্থার শিকার হয়। প্রথমত তাহাদের আমলের উদ্দেশ্য শুধুই রিয়া হওয়া এবং উহার বিনিময়ে ছাওয়াবের প্রত্যাশী না হওয়া। এই শ্রেণীর লোকদের সমস্ত এবাদতই বরবাদ হয়। কেননা, মানুষের আমল নির্ভর করে নিয়তের উপর। আর এই ক্ষেত্রে তাহারা এবাদতের নিয়ত করে না। এই কারণেই তাহারা ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হয়। এই ক্ষেত্রে তাহাদের পরিণতি এমন নহে যে, আমল বরবাদ হইয়া আমলের পূর্বে যেমন ছিল তেমনই থাকিবে; বরং উদ্দেশ্য ও নিয়তের বিশুদ্ধতার অভাবে তাহারা গোনাহগারও হইবে বটে। গোনাহগার হওয়ার কারণ দুইটি। প্রথম কারণটি মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হয়। কেননা, উপরোক্ত আচরণের ফলে মানুষ তাহাকে আল্লাহ'র অনুগত ও মোখলেস বান্দা মনে করে। অথচ প্রকৃত অবস্থা উহার বিপরীত। এই অবস্থাটি হইল দ্বীনের সহিত সংশ্লিষ্ট। দুনিয়ার ক্ষেত্রেও মানুষকে প্রতারণা করা জায়েজ নহে। সুতরাং কোন মানুষ যদি এমন পদ্ধতিতে করজ আদায় করে যে, একজন সাধারণ দর্শক উহাকে সদকা বা দান মনে করে, তবে ইহাতেও গোনাহ হইবে। কেননা, এইভাবে করজ আদায় করিয়া দর্শককে প্রতারিত করার মাধ্যমে মানুষের নিকট সম্মান প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা হইতেছে।

দ্বিতীয় কারণটি আল্লাহর সহিত সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ বাহ্যদৃষ্টিতে সে যেন আল্লাহর এবাদত করিতেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার উদ্দেশ্য হয় গায়রুল্লাহ। ইহা যেন সুস্পষ্টরূপেই আল্লাহর সঙ্গে তামাশা করার নামান্তর। এই প্রসঙ্গে হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেনঃ মানুষ যখন রিয়া করে, তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণকে ডাকিয়া বলেনঃ দেখ, বান্দা আমার সঙ্গে মজাক করিতেছে।

উপরোক্ত অবস্থার উদাহরণ যেন এইরূপঃ এক ব্যক্তি সমস্ত দিন করজোড়ে বাদশাহর খেদমতে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহার এই 'করজোড় দণ্ডায়মান' বাদশাহর ভয় কিংবা আজমতের কারণে নহে; বরং এইভাবে বাদশাহর নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার যুবতী বাঁদীর রূপ দেখাই তাহার মূল উদ্দেশ্য। তো এই আচরণটিকে বাদশাহর সঙ্গে তামাশা করা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? কেননা, এই ব্যক্তি বাদশাহর খেদমত কিংবা তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিয়ত করে নাই। বরং বাদশাহর সুন্দরী বাঁদীর রূপ দর্শনই ছিল তাহার উদ্দেশ্য।

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, ইহা অপেক্ষা জঘন্য কর্ম আর কি হইতে পারে যে, একজন মানুষ আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্যের ছুরতে এমন একজন মানুষের জন্য রিয়া করিতেছে- যেই মানুষ তাহার কল্যাণ-অকল্যাণ কিছুই করিতে পারে না? এইরূপ রিয়াকার ব্যক্তি সম্পর্কে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, সে যেন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে এমন ধারণা করিতেছে যে, তাহার দ্বারাই আমার উদ্দেশ্য পূরণ হইবে কিংবা আমার জন্য এই ব্যক্তির নৈকট্য আল্লাহর নৈকট্য হইতেও কল্যাণকর হইবে। এই কারণেই তো সে আল্লাহর উপর সেই ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দিতেছে এবং তাহাকেই নিজের এবাদতের লক্ষ্য স্থির করিতেছে। সুতরাং আমরা বলিব- গোলামকে মনিবের উপর প্রাধান্য দেওয়ার মত জঘন্য তামাশা আর কি হইতে পারে? এই কারণেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকে 'শিরকে আসগর' বা ছোট শিরক আখ্যা দিয়াছেন।

রিয়া কখনো গোনাহমুক্ত নহে। তবে শ্রেণী বিভক্ত রিয়ার একটি অপরটির তুলনায় গুরুতর বটে। কোন রিয়ার গোনাহ হয়ত খুবই কঠিন, আবার কোনটির গোনাহ হয়ত মামুলী। রিয়ার মধ্যে যদি অন্য কোন গোনাহ নাও থাকে, তবুও গায়রুল্লাহর জন্য রুকু-সেজদাহ করা- ইহাই কি কোন কম অপরাধ? বস্তুতঃ রিয়া বা লোকদেখানো এবাদত একটি চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং যেই ব্যক্তিকে শয়তান প্রতারণার জালে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, কেবল তাহার পক্ষেই রিয়া করা সম্ভব। শয়তান তাহার অন্তরে এমন বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে যে, মানুষই তাহার লাভ-ক্ষতির মালিক, মানুষই তাহার হায়াত-মউত ও রিজিকের মালিক এবং আল্লাহ অপেক্ষা মানুষের ক্ষমতাই অধিক (নাউজুবিল্লাহ)। এই কারণেই সে নিজের দৃষ্টি আল্লাহর দিক হইতে ফিরাইয়া সেই ব্যক্তির উপর নিবদ্ধ করিয়াছে। আল্লাহ পাক যদি ইহকাল-পরকালে রিয়াকারের দায়িত্ব সেই বান্দার হাতেই ছাড়িয়া দেন, তবে বান্দা সেই রিয়াকারের বড় কোন আমলের মোকাবেলায় কোন সাধারণ বিনিময় দিতেও সক্ষম হইবে না। বান্দা তো নিজের লাভ-লোকসানেরই ফায়সালা করিতে পারে না। সুতরাং সে আবার অপরের লাভ-লোকসানে কেমন করিয়া হস্তক্ষেপ করিবে? আর দুনিয়াতেই যখন তাহার এই অবস্থা সেই বান্দা

আখেরাতের ব্যাপারে কি করিতে পারিবে? অথচ আখেরাতের অবস্থা হইল–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهِ شَيْئًا *

অর্থঃ "হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এমন এক দিবসকে যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসিবে না এবং পুত্রও তাহার পিতার কোন উপকার করিতে পারিবে না।" (সূরা লোকমানঃ আয়াত ৩৩)

পরকালে তো আল্লাহর নবীগণও ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী! বলিতে থাকিবেন। রিয়াকারের সব চাইতে বড় বোকামী হইল, সে পরকালের ছাওয়াব এবং আল্লাহর নৈকট্যকে দুনিয়ার তুচ্ছ লোভের বিনিময়ে মানুষের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়।

নিম্নে আমরা রিয়ার রোকন এবং উহার স্তর প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। রিয়ার রোকন তিনটি–

১. রিয়া,
২. যাহা দ্বারা রিয়া করা হয়,
৩. যাহার জন্য রিয়া করা হয়।

প্রথম রোকন

প্রথম রোকন হইল রিয়া। রিয়ার মধ্যে দুইটি অবস্থার যে কোন একটি অবস্থা অবশ্য বিদ্যমান থাকিবে। অর্থাৎ এই রিয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর এবাদত ও ছাওয়াবের নিয়ত মোটেই থাকিবে না। কিংবা ছাওয়াবের নিয়ত থাকিবে বটে, তবে এই নিয়ত শক্তিশালীও হইতে পারে আবার দুর্বলও হইতে পারে। অথবা রিয়া ও ছাওয়াবের ইচ্ছা বরাবর হইতে পারে। এই হিসাবে উহা চারিটি স্তরে বিভক্ত হইল। নিম্নে আমরা পৃথক শিরোনামে উহার বিস্তারিত আলোচনা করিব।

প্রথম স্তর

রিয়ার যাবতীয় স্তর সমূহের মধ্যে ইহা সর্বাধিক গুরুতর। অর্থাৎ ছাওয়াবের নিয়ত মোটেই না থাকা। যেমন এক ব্যক্তি মানুষের সামনে নামাজ পড়ে কিন্তু একাকী হইলে নামাজ পড়ে না। আবার কোন কোন সময় অজু ছাড়াই মানুষের সঙ্গে দাঁড়াইয়া যায়। এইরূপ ব্যক্তির নিয়ত থাকে শুধুই রিয়া এবং উহার ফলেই সে আল্লাহর গজবের শিকার হয়। এই হুকুম এমন ব্যক্তির জন্যও; যেই ব্যক্তি লোকনিন্দার ভয়ে সম্পদের জাকাত আদায় করে এবং ছাওয়াবেরও আশা করে।

দ্বিতীয় স্তর

রিয়ার দ্বিতীয় স্তর হইল, ছাওয়াবের ইচ্ছা থাকিবে বটে কিন্তু তাহা খুবই

দুর্বল হইবে। অর্থাৎ এই ব্যক্তি যদি একা থাকে তবে এই এবাদত করিবে না। কেননা, তাহার ছাওয়াব প্রাপ্তির ইচ্ছা এমন শক্তিশালী নহে, যার কারণে সেই আমলটি বাস্তবে রূপ লাভ করিতে পারে। অবশ্য ছাওয়াবের ইচ্ছা না থাকিলেও রিয়ার কারণেই সেই আমলটি অবশ্যই করিত। এই স্তরটি প্রথম স্তরের কাছাকাছি। এইরূপ ইচ্ছা থাকা না থাকা বরাবর। এই ব্যক্তিও আল্লাহর গজবের শিকার হইবে।

তৃতীয় স্তর

তৃতীয় স্তর হইল, রিয়ার ইচ্ছা এবং ছাওয়াবের ইচ্ছা উভয়টিই সমান সমান হওয়া। এই দুইটি ইচ্ছা একত্রিত হইলে সে আমল করে এবং এই দুইটির কোন একটি অনুপস্থিত থাকিলে আমল করে না। এইরূপ ব্যক্তির অবস্থা হইল, সে যেই পরিমাণ গড়ে, সেই পরিমাণই নষ্ট করে। ফলে আশা করা যায়– এইরূপ ব্যক্তি ছাওয়াবও পাইবে না এবং আজাবেরও শিকার হইবে না। কিংবা যেই পরিমাণ ছাওয়াব হইবে সেই পরিমাণই আজাব হইবে। হাদীসের বাহ্যিক বিবরণ দ্বারা জানা যায়– এইরূপ ব্যক্তিও আল্লাহর আজাব হইতে নিরাপদ থাকিতে পারিবে না।

চতুর্থ স্তর

চতুর্থ স্তর হইল, ছাওয়াবের ইচ্ছা প্রবল ও রিয়ার ইচ্ছা দুর্বল হওয়া। সুতরাং মানুষ তাহার আমল সম্পর্কে জানিতে না পারিলেও সে আমল বর্জন করে না। কিংবা এবাদতের ইচ্ছাই তাহাকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না। আমাদের ধারণায় এইরূপ ব্যক্তি মূল ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে না বটে, কিন্তু ছাওয়াব কিছুটা কম হইবে। অথবা রিয়া পরিমাণ আজাব হইবে এবং ছাওয়াবের ইচ্ছা পরিমাণ ছাওয়াব হইবে।

দ্বিতীয় রোকন

দ্বিতীয় রোকন হইল– যাহা দ্বারা রিয়া করা হয়। মানুষ যেই দুইটি বিষয় দ্বারা রিয়া করে, তাহা হইল আনুগত্য ও এবাদত। এই হিসাবে রিয়ার দুইটি স্তর রহিয়াছে। প্রথমতঃ মূল এবাদত দ্বারা রিয়া করা এবং দ্বিতীয়তঃ এবাদতের গুণ দ্বারা রিয়া করা। প্রথম স্তরটি খুবই মারাত্মক। এই স্তরটির তিনটি অবস্থা রহিয়াছে।

প্রথম অবস্থা

প্রথম অবস্থা হইল, মূল ঈমান দ্বারাই রিয়া করা। এই রিয়া অত্যন্ত ভয়াবহ এবং যেই ব্যক্তি ঈমান দ্বারা রিয়া করে, সে প্রকাশ্য কাফের। এইরূপ ব্যক্তি অনন্তকাল জাহান্নামের আজাবে থাকিবে। এইরূপ রিয়াকার হইল সেই ব্যক্তি,

যে মুখে কালেমা পড়ে বটে, কিন্তু অন্তরে উহাকে মিথ্যা মনে করে। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে সে নিজেকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু তাহার অন্তর থাকে ইমানশূন্য। এইরূপ রিয়াকার সম্পর্কে কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ، وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ، وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ *

অর্থঃ মোনাফেকেরা আপনার নিকট আসিয়া বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মোনাফেকেরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।"

(সূরা মোনাফেকুনঃ আয়াত ১)

অর্থাৎ তাহাদের মুখের কথা অন্তরের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে। অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ، وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ * وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ، وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ *

অর্থঃ "আর এমন কিছু লোক রহিয়াছে যাহাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করিবে। আর তাহারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। যখন ফিরিয়া যায় তখন চেষ্টা করে যাহাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করিতে পারে এবং (কাহারও) শস্যক্ষেত্রও প্রাণনাশ করিতে পারে। আল্লাহ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।" (সূরা বাক্বারাঃ আয়াত ২০৪ – ২০৫)

অন্য আয়াতে আছে–

وَ اِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَ اِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ *

অর্থঃ "অথচ তাহারা যখন তোমাদের সঙ্গে আসিয়া মিশে, বলে– 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' পক্ষান্তরে তাহারা যখন পৃথক হইয়া যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াইতে থাকে।" (সূরা আল-ইমরানঃ আয়াত ১১৯)

আরো এরশাদ হইয়াছে–

يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا * مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ وَ لَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ *

অর্থঃ "শুধু লোকদেখানোর জন্য। আর তাহারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। ইহারা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নহে, সেদিকেও নহে।"

(সূরা নিসাঃ আয়াত ১৪২ – ১০৪)

পবিত্র কোরআনে মোনাফেকদের বিবরণ সম্বলিত এই ধরনের বহু আয়াত রহিয়াছে। এখানে নমুনা হিসাবে উহার কয়েকটি উল্লেখ করা হইল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মোনাফেকদের তৎপরতা অনেক বেশী ছিল। কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাহারা নিজেদেরকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিত। কিন্তু তাহাদের অন্তর থাকিত কুফরীতে পরিপূর্ণ। বর্তমান যুগে এই রূপ মোনাফেকদের সংখ্যা কম বটে। তবে এখনো এক শ্রেণীর লোক মনে মনে জান্নাত-জাহান্নাম ও কেয়ামত ইত্যাদিকে অস্বীকার করে এবং মুখে রিয়াকার ও মোনাফেক। ইহারাও অনন্তকাল জাহান্নামে থাকিবে। কেননা, ইহারা প্রকাশ্য কাফেরদের চাইতেও জঘন্য।

দ্বিতীয় অবস্থা

দ্বিতীয় অবস্থা হইল মূল ঈমানকে স্বীকার করার পাশাপাশি এবাদতের মাধ্যমে রিয়া করা। ইহাও কঠিন গোনাহের কাজ বটে, তবে প্রথম অবস্থার তুলনায় কিছুটা হাল্কা। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি হয়ত নামাজ পড়ায় অভ্যস্থ নহে। কিন্তু লোকজনের সঙ্গে অবস্থানকালে সকলে যখন নামাজে রওনা হইল, তখন সেও তাহাদের সঙ্গে নামাজে গিয়া হাজির হইল। অথচ তাহার অবস্থা হইল, যদি লোক নিন্দার ভয় না হইত, তবে সে কিছুতেই নামাজে যাইত না। অনুরূপভাবে নিজের ইচ্ছা ও স্বভাবের বিরুদ্ধে আত্মীয়দের সঙ্গে ভাল ব্যবহার, মাতাপিতার আনুগত্য কিংবা জেহাদ ও হজ্বে গমন করিল। মানুষের নিন্দা ও সমালোচনার আশংকা না হইলে সে এইসবের কিছুই করিত না। সুতরাং তাহার এইসব আমল সুস্পষ্ট রিয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। তবে এইসব রিয়ার কারণে তাহার মূল ঈমান নষ্ট হইবে না। কেননা, সে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহাকেও সেজদা করিতে বলিলে সে কিছুতেই উহাতে সম্মত হইবে না। অবশ্য অলসতার কারণে সে এবাদতে অবহেলা করে এবং মানুষকে দেখাইয়া এবাদত করিতে পারিলে আনন্দিত হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহর নিকট সম্মানিত হওয়ার তুলনায় মানুষের নিকট সম্মানপ্রাপ্তির বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং আল্লাহর আজাবের তুলনায় মানুষের নিন্দাকে বেশী ভয় করে। আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে ছাওয়াব ও বিনিময় প্রাপ্তি অপেক্ষা মানুষের প্রশংসা প্রাপ্তির অধিক প্রত্যাশী হয়। এইরূপ মনোভাব চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই শ্রেণীর লোকদের মূল ঈমান বহাল থাকিলেও তাহারা নির্ঘাত আল্লাহর আজাবের শিকার হইবে।

তৃতীয় অবস্থা

তৃতীয় আরেকটি অবস্থা হইল, এই শ্রেণীর লোকেরা ঈমান ও ফরজ এবাদত দ্বারা রিয়া করে না বটে, তবে নফল ও মোস্তাহাব এবাদত দ্বারা রিয়া করে– যাহা বর্জন করিলে কোন গোনাহ হয় না। অর্থাৎ সম্মুখে কোন লোকজন না থাকিলে ছাওয়াবের আশায় এবাদত করে না বটে, কিন্তু লোকজন থাকিলে তাহাদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নফল এবাদত করে। যেমন– জামায়াতে শরীক হওয়া, রোগীর সেবা করা, জানাজায় শরীক হওয়া, মুরদারকে গোসল দেওয়া– ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তাহাজ্জুদের নামাজ, ইয়াওমে আশুরা-আরাফা এবং বৃহস্পতিবার ও সোমবারের নফল রোজা রাখা– ইত্যাদি। রিয়াকার অনেক সময় এইসব এবাদত লোক নিন্দার ভয় ও মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যেও করিয়া থাকে। অথচ আল্লাহ পাক ভাল করিয়াই জানেন যে, একাকী হইলে এই শ্রেণীর লোকেরা ফরজ এবাদতের বেশী আর কিছুই করিত না। এই শ্রেণীটি পূর্ববর্তী দুইটি শ্রেণীর তুলনায় কম মন্দ।

এবাদতের গুণ দ্বারা রিয়া করা

এবাদতের গুণ দ্বারা রিয়া করার ক্ষেত্রেও উহার তিনটি স্তর রহিয়াছে–

প্রথম স্তর

উহার প্রথম স্তর হইল, এমন কাজে রিয়া করা যাহা বর্জন করিলে এবাদতের মধ্যে ত্রুটি দেখা দেয়। যেমন– এক ব্যক্তি একাকী নামাজ পড়ার সময় রুকু-সেজদা, কেয়াম-জলসা ইত্যাদি সবই দ্রুত সম্পন্ন করে। কিন্তু কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলা মাত্র সবকিছু ঠিক ঠিকভাবে আদায় করিতে শুরু করে। এইরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ সে যেন আল্লাহ পাককে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছে। অর্থাৎ– আল্লাহ পাক যে তাহার গোপন আমল সম্পর্কেও সম্যক পরিজ্ঞাত, এই বিষয়টিকে যেন সে কিছুমাত্র পরওয়া করিতেছে না। অথচ মানুষ তাহাকে দেখিয়া ফেলিলেই আমলের প্রতি যথাযথ মনোযোগী হইতেছে।

এক কথায় সে যেন মানুষকে পরওয়া করিতেছে কিন্তু আল্লাহকে পরওয়া করিতেছে না। উহার উদাহরণ যেন এইরূপ– এক ব্যক্তি হয়ত কাহারো সম্মুখে তাকিয়ায় হেলান দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পর সম্মুখের সেই লোকটির এক গোলাম হঠাৎ তথায় আসিয়া হাজির হওয়া মাত্র সেই লোকটি সোজা হইয়া বসিয়া পা গুটাইয়া লইল। এখন লোকটির এই আচরণ দেখিয়া সকলেই বলিবে যে, লোকটি একজন মনিবের উপর তাহার গোলামকে প্রাধান্য দিয়াছে। অনুরূপভাবে একাকী জাকাত দেওয়ার সময় ময়লা ও ছেঁড়া নোট দ্বারা জাকাত আদায় করা, আর লোক সমাগমে চকচকে নোট দ্বারা জাকাত আদায়

করা– যেন মানুষ তাহাকে খারাপ বলিতে না পারে কিংবা রোজার হালাতে মানুষের নিন্দার ভয়ে গীবত-শেকায়েত বর্জন করিয়া চলা ইত্যাদি কর্মসমূহ সুস্পষ্ট রিয়া এবং ইহা নিষিদ্ধ। কেননা, এই ক্ষেত্রেও স্রষ্টার উপর সৃষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

এক্ষণে যদি কেহ বলে যে, আমি মানুষকে গীবত হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করি। অর্থাৎ তাহারা যদি আমাকে সাধারণভাবে রুকু-সেজদা করিতে এবং সংক্ষিপ্ত কেয়াম-কেরাত করিতে দেখে, তবে আমার সমালোচনা ও গীবত করিতে শুরু করিবে; সুতরাং এই বিষয়ে তাহারা যেন আমার গীবত ও সমালোচনা করার সুযোগ না পায়, এই উদ্দেশ্যেই আমি তাহাদের সম্মুখে উত্তমরূপে নামাজ আদায় করি। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে সঠিকভাবে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে অপরাপর মানুষকে একটি জঘন্য পাপ হইতে রক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য, তবে এই বক্তব্যের জবাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা বলিব– তোমার এই ধারণা শয়তানের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নহে। তুমি বরং একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে, এই ক্ষেত্রে তোমার ক্ষতির পরিমাণ তাহাদের উপকারের তুলনায় অনেক বেশী। কেননা, নামাজ হইল আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উসিলা এবং পরকালে উহা তোমার উপকারে আসিবে। এখন তুমি যদি এই নামাজে অবহেলা কর, তবে তুমি আল্লাহর নৈকট্য লাভে ব্যর্থ হইবে এবং পরকালের কঠিন দিনে উহা তোমার কোন উপকারে আসিবে না।

পক্ষান্তরে তুমি যদি দ্বীনী আবেগ ও ধর্মীয় মনোভাবের কারণে এইরূপ করিয়া থাক, তবে তো তোমার নিজের ব্যাপারেই অধিক যত্নবান হওয়া আবশ্যক। কেননা, তুমি যদি নিজের তুলনায় অপরের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি অধিক মনোযোগী হও, তবে তোমার উদাহরণ যেন এইরূপঃ এক ব্যক্তি বাদশাহর পক্ষ হইতে নগদ অর্থ-সম্পদ পাওয়ার আশায় বাদশাহর খেদমতে একটি অন্ধ বাঁদী পেশ করার ইচ্ছা করিল। বাঁদীটি একাধারে অন্ধ, লেংড়া ও কুৎসিতও বটে। তাহার এই গর্হিত আচরণে বাদশাহ যে ক্রুদ্ধ হইবেন– এই বিষয়টিকে সে কিছুমাত্র আমলে আনিতেছে না। বরং সে হয়ত আশংকা করিতেছে, বাদশাহর উজীর ও গোলামরা যদি দেখিতে পায় যে, বাদশাহকে এমন একটি কুৎসিত বাঁদী উপঢৌকন দেওয়া হইতেছে, তবে তাহারা হয়ত এই বিষয়ে তাহার নিন্দা করিবে। অথচ তাহার উচিৎ ছিল, উজীর গোলামদের সমালোচনার পরওয়া না করিয়া বাদশাহর অসন্তোষের কথা চিন্তা করা।

যাহাই হউক, উপরে যেই রিয়ার কথা আলোচনা করা হইল, উহার দুইটি অবস্থা হইতে পারে। প্রথমতঃ রিয়ার মাধ্যমে শুধুই মানুষের প্রশংসা ও মর্যাদা

প্রত্যাশা করা। ইহা সুস্পষ্টরূপেই হারাম। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ কল্পনা করা যে, আমি যদি মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে ভালভাবে রুকু-সেজদা আদায় করিব, তবে আমার এই আমলে এখলাস থাকিবে না। আর যদি তাড়াহুড়া করিয়া নামাজ আদায় করি, তবে আমার এই নামাজ আল্লাহ পাকের নিকট ত্রুটিপূর্ণরূপে গণ্য হইবে। তদুপরি এই নামাজ মানুষের নিকট নিন্দনীয় হওয়ার কারণে আমাকে মানসিক পীড়নের শিকার হইতে হইবে। এখন আমি যদি ভালভাবে নামাজ আদায় করি, তবুও তো এই নামাজের ত্রুটি দূর হইতেছে না। কেননা, আমার এই নামাজে এখলাস অবর্তমান। অবশ্য এইরূপ নামাজের ফলে মানুষের নিন্দা ও গীবতের পীড়ন হইতে মুক্ত থাকা যাইবে। এই অবস্থাটি এতদ্ অপেক্ষা উত্তম যে, আমি রুকু-সেজদা ভালভাবে আদায় না করিয়া ছাওয়াব হইতেও বঞ্চিত থাকিব এবং মানুষের নিন্দাও সহ্য করিব। এই সূক্ষ্ম অবস্থাটি বিবেচ্য বিষয় বটে।

এই ক্ষেত্রে সঠিক মতামত হইল, নামাজী ব্যক্তির কর্তব্য হইল, পরিপূর্ণ এখলাসের সহিত নামাজের রুকু-সেজদাগুলি উত্তমরূপে আদায় করিবে। ইহা ওয়াজিব। যদি এখলাসের সহিত এইরূপ নামাজ আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে একাকী নামাজ পড়ার সময় এইরূপ অভ্যাস করার চেষ্টা করিবে। কেননা, ইহা কখনো সঙ্গত হইতে পারে না যে, আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও এবাদতের মাধ্যমে রিয়া করিয়া মানুষকে নিন্দা ও গীবত হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করিবে। এইরূপ করিলে তাহা আল্লাহ পাকের সঙ্গে উপহাস করা হইবে- যাহা কবীরা গোনাহ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় স্তর

দ্বিতীয় স্তর হইল, এমন কাজের মধ্যে রিয়া করা যাহা না করিলে এবাদতের মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি আসে না। তবে এই কথা সত্য যে, ঐ কর্মটি এবাদতের মধ্যে পূর্ণতা আনয়ন করে।

যেমনঃ রুকু-সেজদা ও কেয়ামে বিলম্ব করা, যথা নিয়মে হস্তদ্বয় উত্তোলন করা, তাকবীরে উলার জন্য আগে আগে মসজিদে যাওয়া, কেরাত সাধারণ নিয়মের চাইতে একটু দীর্ঘ করা, রমজানের রোজার সময় সকল হইতে পৃথক হইয়া একাকী থাকা এবং অধিক সময় নীরব থাকা, উত্তম মাল দ্বারা জাকাত দেওয়া- ইত্যাদি। অর্থাৎ লোকটি যদি একাকী হইত, তবে এইভাবে আমল করিত না। ইহা তাহার শুধুই লোকদেখানো আমল।

তৃতীয় স্তর

তৃতীয় স্তর হইল এমন আমল দ্বারা রিয়া করা যাহা নফল আমলের মধ্যেও গণ্য নহে। যেমন- নামাজের জন্য সকলের আগে মসজিদে গমন করা, প্রথম কাতারে শামিল হওয়া, ইমামের ডান দিকে দাঁড়ানো- ইত্যাদি অর্থাৎ একাকী হইলে সে এইসব আমল করে না।

তৃতীয় রোকন

তৃতীয় রোকন হইল, যেই উদ্দেশ্যে রিয়া করা হয়। যেই ব্যক্তি রিয়া করে, তাহার এই রিয়ার পিছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই নিহিত থাকে। কখনো সে মাল-দৌলত ও ধনসম্পদের জন্য রিয়া করে, আবার কখনো তাহার উদ্দেশ্য হয়, যশ-খ্যাতি ও সুনাম অর্জন। আবার ক্ষেত্র বিশেষে এই রিয়ার পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকিতে পারে। এই অবস্থাটিও তিনটি স্তরে বিভক্ত।

প্রথম স্তর

রিয়ার যাবতীয় স্তর সমূহের মধ্যে এই স্তরটি সবচাইতে মারাত্মক। অর্থাৎ গোনাহের জন্য রিয়া করা। যেমন- সন্দেহযুক্ত মাল খাওয়ার জন্য এবাদতের মাধ্যমে রিয়া করা এবং অধিকাংশ সময় নফল এবাদত দ্বারা নিজের বুজুর্গী জাহির করা। এইসব আমলের পিছনে তাহার উদ্দেশ্য থাকে যেন লোকেরা তাহাকে আমানতদার মনে করিয়া বিচারকার্য, ওয়াকফ সম্পত্তি, ওসীয়ত পূরণ এবং এতীমের সম্পদের জিম্মাদারী তাহার হাতে সোপর্দ করে। আর এই সুযোগে সে উহা হইতে আত্মসাৎ করিতে পারে। অনুরূপভাবে জাকাত-সদকার সম্পদ বন্টনের দায়িত্ব, সাধারণ মানুষের আমানতের দায়িত্ব এবং হজ্বের সফরে কাফেলার সাথীদের টাকা-পয়সার দায়িত্ব যেন তাহার হাতে দেওয়া হয় এবং সে যেন উহা হইতে নিজের ইচ্ছামত খরচ করিতে পারে।

কতক লোক সূফীগণের লেবাস পরিধান করিয়া আল্লাহর ওলীদের রূপ ধারণ করে। এই অবস্থায় তাহারা ওয়াজ-নসীহত ও দ্বীনের কথা বলিয়া বেড়ায়। আর মনে মনে উদ্দেশ্য থাকে এই প্রক্রিয়ায় কোন নারী বা কিশোরের মন আকর্ষণ করিতে পারিলে তাহার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা। আবার কতক লোক ওয়াজ ও ক্বেরাতের মাহ্‌ফিলে শরীক হয়। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে করা হয় যেন তাহারা দ্বীনের কথা ও কালামে পাকের তেলাওয়াত শোনার জন্যই তথায় হাজির হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের আসল উদ্দেশ্য থাকে- মজলিসে আগত যুবতী নারী ও কম বয়সী কিশোরদের রূপ দর্শন করা। এই সকল লোক আল্লাহ পাকের নিকট অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর রিয়াকার। কেননা, তাহারা আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও এবাদতকে গোনাহের কাজের মাধ্যম বানাইয়াছে।

উপরোক্ত শ্রেণীর কাছাকাছি আরেকটি দল হইল, যাহারা কোন গর্হিত কর্মে সংশ্লিষ্ট হইয়া অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার পর এমন কামনা করে যেন সেই অপরাধ হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। যেমন- এক ব্যক্তি আমানতের

খেয়ানত করার পর লোকেরা যখন তাহাকে "খেয়ানতকারী" হিসাবে আখ্যা দিল, তখন সে নিজের সম্পদ হইতে প্রচুর পরিমাণে দান করিতে শুরু করিল। যেন মানুষ তাহার দানশীলতা দেখিয়া এই কথা বলিতে বাধ্য হয় যে, যেই ব্যক্তি নিজের সম্পদ হইতে এমন বিপুল পরিমাণে মানুষকে দান করে, সেই ব্যক্তি মানুষের আমানতের সামান্য কয়েকটি টাকা আত্মসাৎ করিবে, ইহা কখনো বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয় স্তর

দ্বিতীয় স্তর হইল, রিয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার বৈধ স্বাদ-সম্ভোগ উদ্দেশ্য হওয়া। যেমন ধন-সম্পদ হাসিল কিংবা কোন সুন্দরী ও সদবংশীয়া নারীকে বিবাহ করার বাসনা– ইত্যাদি। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি ক্রমাগত হা-হুতাশ, ওয়াজ-নসীহত ও জিকির-আজকারে মশগুল হওয়া যেন তাহার এই অবস্থা দেখিয়া মানুষ তাহাকে মাল দেয় কিংবা প্রার্থিত নারীটি যেন তাহার সহিত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইতে সম্মত হয়। অনুরূপভাবে কোন আলেম ও আবেদের কন্যাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে নিজের এলমী ও আমলী যোগ্যতা প্রকাশ করা যেন উহার ফলে সেই আলেম তাহার কন্যা সমর্পনে সম্মত হন। এইরূপ রিয়া হারাম। কেননা, এই ক্ষেত্রে রিয়াকার আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা পার্থিব সম্পদ প্রার্থনা করিতেছে। তবে এই স্তরটি প্রথমোক্ত স্তর হইতে কম মন্দ। কেননা, এখানে প্রার্থিত বস্তুটি সত্ত্বাগতভাবে বৈধ। যদি প্রার্থিত বস্তুটি হারাম হইত তবে তো উহার অবস্থা আরো গুরুতর হইত।

তৃতীয় স্তর

তৃতীয় স্তর হইল, এই রিয়ার পিছনে কোন আরাম আয়েশ, ধনসম্পদ অর্জন কিংবা বিবাহ-শাদী ইত্যাদি কিছুই উদ্দেশ্য না হওয়া। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কেবল এই আশংকায় এবাদতের প্রদর্শনী ঘটায় যে, সে যদি এবাদত না করে, তবে লোকেরা তাহাকে হীন দৃষ্টিতে দেখিবে এবং তাহাকে আবেদ ও জাহেদদের মধ্যে গণ্য করা হইবে না। বরং তাহাকে একজন সাধারণ শ্রেণীভুক্ত মানুষ মনে করিয়া তুচ্ছ নজরে দেখা হইবে। যেমন এক ব্যক্তি হয়ত নিজের অভ্যাস অনুযায়ী দ্রুত পথ চলিতেছে। কিন্তু যখনই সে টের পাইল যে, মানুষ তাহাকে অবলোকন করিতেছে, তখনই হাঁটার ধরন পরিবর্তন করিয়া ধীর-স্থিরভাবে চলিতে শুরু করিল যেন মানুষ তাহাকে ভাবগম্ভির ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মনে করিতে পারে। অনুরূপভাবে নিন্দার ভয়ে হাসি-মজাক ও আনন্দ-ফুর্তির স্থলে "আস্তাগফেরুল্লাহ" পড়া, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করা, পেরেশানী জাহির করা এবং এইরূপ বলা যে, হায়! মানুষ নিজের ব্যাপারে কেমন গাফেল হইয়া গিয়াছে। অথচ আল্লাহ পাক এই ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল করিয়াই জানেন যে, এই ব্যক্তি যদি

একাকী হইত, তবে এইরূপ হাসি-মজাককে কিছুমাত্র দোষণীয় মনে করিত না। তাহার আশংকা কেবল উহাতে শরীক হইলে মানুষের নজরে তাহাকে হাল্কা হইতে হইবে।

অনুরূপভাবে সেই সকল ব্যক্তিও উপরোক্ত শ্রেণীভুক্ত, যাহারা অপরাপর মানুষকে তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, বৃহস্পতি ও সোমবারের রোজায় মশগুল দেখিয়া নিজেরাও উহাতে শরীক হয়, যেন লোকেরা তাহাদিগকে অলস ও সাধারণ মানুষের দলভুক্ত মনে করিতে না পারে। এই লোকদিগকেই যদি একাকী ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা এইসব আমলের কিছুই আদায় করিবে না। অনুরূপভাবে আশুরা, ইয়াওমে আরাফা ইত্যাদি দিবসসমূহে প্রচণ্ড পানির পিপাসা থাকা সত্ত্বেও কেবল এই আশংকায় পানি পান না করা যে, মানুষ দেখিতে পাইলে মনে করিবে– এই ব্যক্তি আজ রোজা রাখে নাই। অর্থাৎ লোকেরা তাহার সম্পর্কে এমন ভুল ধারণা পোষণ করিতেছে যে, সে রোজা রাখিয়াছে। আর মানুষের এই ভুল ধারণা বহাল রাখার জন্যই সে খানাপিনা ত্যাগ করিয়াছে। আবার কতক লোক প্রচণ্ড গরমের সময়ও কেবল 'রোজাদার' আখ্যা পাওয়ার জন্য পানি পান করে না। আবার অনেক সময় যদিও নিজেকে স্পষ্ট ভাষায় রোজাদার বলিয়া প্রকাশ করা হয় না, কিন্তু আকারে-ইঙ্গিতে এমন ভাব প্রকাশ করা হয় এবং এমন শব্দ ব্যবহার করা হয় যাহা দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় যে, সে রোজা রাখিয়াছে। এই ব্যক্তি এক সঙ্গে দুইটি অপরাধ করিতেছে– প্রথমতঃ আকারে ইঙ্গিতে নিজেকে রোজাদার বলিয়া দাবী করিতেছে; দ্বিতীয়তঃ সে নিজেকে বে-রিয়া ও সাধু মনে করিতেছে। এই ব্যক্তির বিভ্রান্তি হইল– সে মনে করিতেছে, আমি নিজের এবাদত জাহির করি নাই। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সে নিজের এবাদত জাহির করিয়া রিয়াকার সাব্যস্ত হইয়াছে। এই ব্যক্তির পানির পিপাসা যখন প্রকট হয় এবং সবর করিবারও ক্ষমতা থাকে না, তখন ইশারা-ইঙ্গিতে বা সরাসরি কোন ওজর পেশ করিয়া পানি পান করিয়া লয়। যেমন নিজেকে এমন ব্যাধিতে আক্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করে– যেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে প্রচণ্ড পিপাসা পায় এবং যেই ব্যাধির কারণে রোজা রাখা ক্ষতিকর হয়। কিংবা এমন ওজর পেশ করে যে, আজ আমি অমুক ব্যক্তির মন রক্ষার্থে রোজা ভঙ্গ করিয়াছি– ইত্যাদি। আবার কতক লোক এমনই সতর্ক হয় যে, পানি পান করার সঙ্গে সঙ্গেই ওজর পেশ করে না– যেন মানুষ তাহাকে কোনভাবেই রিয়াকার মনে করিতে না পারে। বরং কিছু বিলম্বের পর অপর কোন প্রসঙ্গের আবরণে রোজা ভঙ্গের কারণ উত্থাপন করে। যেমন সে হয়ত বলিল, অমুক ব্যক্তি নিজের দোস্ত-আহবাবের সঙ্গে গভীর মোহাব্বতের সম্পর্ক রাখে। খানা-খাওয়ার সময় তাহার প্রচণ্ড রকমের চাহিদা হইল– তাহার কোন না কোন দোস্ত অবশ্যই তাহার সঙ্গে খানায় শরীক হইতে হইবে। আজ আমিও

সেই ব্যক্তির পাল্লায় পড়িয়াছিলাম। অথচ আমি ছিলাম রোজাদার। কিন্তু তাহার মন রক্ষা করিতে গিয়া আমাকে রোজা ভঙ্গ করিতে হইয়াছে। আবার কেহ হয়ত এইরূপ ওজর করে– আমার মাতার মনটা খুবই নরম এবং আমার সম্পর্কে বরাবরই তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকেন। যেমন আজ তিনি মনে করিলেন, আজ আমি রোজা রাখিলে অসুস্থ হইয়া পড়িব। অবশেষে তাহার কথায় আজ আমাকে রোজা ভঙ্গ করিতেই হইল। এই সকল অবস্থা রিয়ার মধ্যে গণ্য। মানুষ এইরূপ বানোয়াট ওজর-আপত্তির কথা তখনই বলে, যখন রিয়ার জীবানু তাহার রগ-রেশায় ছড়াইয়া পড়ে।

যাহাদের অন্তরে এখলাস আছে, তাহারা এই বিষয়ে কোন চিন্তাই করে না যে, কে আমাদের সম্পর্কে কি ভাবিতেছে এবং কে কি মনে করিতেছে। সুতরাং রোজা না রাখা অবস্থায় তাহারা এই কথা ভাল করিয়াই জানে যে, আল্লাহ পাক আমার অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। এই কারণে নিজের সম্পর্কে তাহারা আল্লাহ পাকের এলেমের খেলাফ কোন কথা নিজের মুখ হইতে বাহির করে না। আর যখন রোজা রাখে, তখন এই বিষয়ে আল্লাহর অবগতিতেই তুষ্ট থাকে এবং ইহাতে অপর কাহাকেও শরীক করিতে চাহে না। মানুষ কখনো মনে করে যে, আমি যদি আমার এবাদত জাহির করি, তবে আমার অনুকরণে লোকেরাও এবাদত করিবে এবং আমার মত তাহারাও ছাওয়াব হাসিল করিতে পারিবে। এইরূপ ধারণার ফলে শয়তানের পক্ষে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার প্রবল সুযোগ সৃষ্টি হয়।

উপরে রিয়ার স্তরসমূহ আলোচনা করা হইল। বস্তুতঃ একজন রিয়াকার সর্ব স্তরেই আল্লাহর আজাবের শিকার হয়। রিয়া হইল আত্মার বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। এই সর্বনাশা রিয়া কেমন করিয়া যে মানবাত্মায় প্রবেশ করে, তাহা সকলে অনুভবও করিতে পারে না। পিপীলিকার চলনের মতই উহা নীরব-সন্তর্পনে আত্মায় প্রবেশ করিয়া মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেয়। সাধারণ মানুষ তো বটেই; বরং অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় জ্ঞানী-গুণী ও আলেম-ফাজেলগণও এই ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হন।

পিপীলিকার চলন অপেক্ষা গোপন রিয়া

রিয়া দুই প্রকার। জলি (প্রকাশ্য) ও খফী (গোপন)। প্রকাশ্য রিয়া হইল– যাহা ছাওয়াবের নিয়ত না থাকা সত্ত্বেও মানুষকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এই রিয়া একেবারেই প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট। ইহা অপেক্ষা গোপন রিয়া হইল– যেই রিয়া আমলের কারণ হয় না বটে, কিন্তু ছাওয়াবের নিয়তে যেই আমল করা হয়, এই রিয়ার কারণে সেই আমলটি সহজ হইয়া যায়। যেমন এক ব্যক্তি নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ায় অভ্যস্থ। কিন্তু এই তাহাজ্জুদে তাহার কিছুটা কষ্ট হয়। অর্থাৎ

সুখের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া বিছানা ত্যাগ করিতে মনের সহিত কিছুটা যুদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু কোন দিন যদি বাড়ীতে মেহমান থাকে, তবে এই তাহাজ্জুদে সে এক অনাবিল আত্মসুখ অনুভব করে এবং ইতিপূর্বে তাহাজ্জুদ পড়িতে যেই কষ্ট হইত, আজ মেহমানের উপস্থিতির কারণে সেই কষ্টের কিছুই অনুভব হয় না। অবশ্য এই কথা সত্য যে, এই ব্যক্তি যদি তাহাজ্জুদের মাধ্যমে ছাওয়াবের আশা না করিত, তবে নিছক মেহমানের সম্মুখে রিয়া করার উদ্দেশ্যেই তাহাজ্জুদ পড়িত না।

উপরোক্ত গোপন রিয়া অপেক্ষা আরো গোপন রিয়া হইল, যাহা আমলের কারণ হয় না এবং আমলকে সহজও করে না। এই রিয়া অন্তরে গোপন থাকে। আমলের উপর এই রিয়ার কোন প্রভাব নাই বিধায় কোনরূপ লক্ষণ ছাড়া ইহার পরিচয় পাওয়াও সম্ভব হয় না। এই রিয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ হইল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যখন জানিতে পারে যে, মানষ তাহার আমল সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছে, তখন সে অন্তরে আনন্দ ও পুলক অনুভব করে। যেমন অনেক নেককার-পরহেজগার ও নিষ্ঠাবান আবেদ যাহারা রিয়াকার নহে এবং রিয়াকে পছন্দও করে না; কিন্তু যখনই তাহার এবাদত সম্পর্কে মানুষ অবগত হয়, তখনই সে অন্তরে এক প্রকার আনন্দ ও সুখ অনুভব করে। এই সুখ ও আনন্দের ফলে মন হইতে এবাদতের কষ্টও দূর হইয়া যায়। বলাবাহুল্য, মানব-অন্তরে সুপ্ত গোপন রিয়াই হইল এই আনন্দের উৎস। আর এই আনন্দই অন্তরে রিয়ার উপস্থিত প্রমাণ করে। অন্তর যদি মানুষের প্রতি মনোযোগী না হইত, তবে কখনো এই আনন্দ অনুভব হইত না। পাথরের মধ্যে যেমন আগুন লুকাইয়া থাকে এবং অপর কিছুর সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে সেই আগুনের বিচ্ছুরণ ঘটে, তদ্রূপ অন্তরে সুপ্ত রিয়া মানুষের অবগতির স্পর্শে আসিয়া বিকশিত হয়। এখন মানুষ যদি এই রিয়ার আনন্দকে ঘৃণা দ্বারা দূর করার চেষ্টা না করে, তবে এই আনন্দই গোপন রিয়ার খাদ্য ও শক্তির যোগান দেয়। এই পর্যায়ে সে কামনা করে– যেকোন উপায়েই হউক, মানুষ তাহার এবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে জানিতে পারিলেই হইল। ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে হউক বা স্পষ্ট অবগতির মাধ্যমেই হউক।

অনেক সময় এই রিয়া এমনই গোপন হয় যে, এই পর্যায়ে রিয়াকার ইশারা-ইঙ্গিতে বা স্পষ্টভাবে অর্থাৎ কোনভাবেই তাহার এবাদত সম্পর্কে মানুষকে অবগত করিতে চাহে না। বরং সে হয়ত কামনা করে, তাহার স্বভাব-প্রকৃতি ও শারীরিক অবস্থা দ্বারাই যেন মানুষ তাহার এবাদত সম্পর্কে অবগত হয়। যেমন তাহার শারীরিক দুর্বলতা, চেহারার বিমর্ষভাব, ক্ষীণস্বর, শুষ্কওষ্ঠ, চোখে অশ্রুর চিহ্ন, দীর্ঘ অনিদ্রার ছাপ– ইত্যাদি যাহা দ্বারা তাহার ক্রমাগত এবাদত ও মোজাহাদা এবং তাহাজ্জুদের আলামত প্রকাশ পায়।

এতদ্ অপেক্ষা আরো সূক্ষ্ম ও গোপন রিয়া হইল– এই ক্ষেত্রে রিয়াকার নিজের এবাদত সম্পর্কে মানুষকে অবগত করিতে চাহে না এবং কোনক্রমে তাহার এবাদত প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহাতেও আনন্দ অনুভব করে না। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও ইহা অবশ্যই কামনা করে যেন মানুষ তাহাকে দেখামাত্র আগে ছালাম করে, হাসিমুখে সাক্ষাত করে, সম্ভ্রম আচরণ করে, তাহার প্রশংসা করে, তাহার কোন প্রয়োজন মিটাইয়া দিতে পারিলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে, আসন ছাড়িয়া তাহাকে বসিতে দেয়– ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ে কেহ ত্রুটি করিলে মনঃক্ষুণ্ন হয় এবং মানুষের এইরূপ আচরণ তাহার নিকট অসঙ্গত মনে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে– সে যেন এইরূপ সম্মান ও ইজ্জত-এহতেরাম নিজের এমন সব এবাদতের বিনিময়ে প্রত্যাশা করে যাহা সে অতি গোপনে আদায় করে এবং মানুষকে জানিতেও দেয় না। ইতিপূর্বে সে যখন এইসব এবাদত করিত না, তখন লোকেরা তাহাকে এইরূপ ইজ্জত-সম্মান না করিলে তখন উহা তাহার নিকট খারাপ মনে হইত না। অর্থাৎ এইসব এবাদত করিয়া সে কেবল আল্লাহ তায়ালার অবগতিতেই তুষ্ট নহে বিধায় তাহার অন্তর গোপন রিয়ার শিকার হইয়াছে। এই রিয়া পিপীলিকার চলন হইতেও অধিক সন্তর্পনে তাহার অন্তরে স্থান করিয়া লইয়াছে। এহেন গোপন রিয়াও মানুষের আমল বরবাদ করিয়া দিতে পারে। এইরূপ সূক্ষ্ম রিয়া হইতে কেবল ছিদ্দীকগণ ব্যতীত অপর কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

উপরোক্ত প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ক্বারীগণকে বলিবেন, লোকেরা কি তোমাদিগকে কম দামে পন্য দিত না? মানুষ কি তোমাদিগকে আগে ছালাম করিত না? তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করিত না? এই শ্রেণীর লোক সম্পর্কে হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

لا اجر لكم قد استوفيتم اجوركم

অর্থঃ "আজ তোমাদের জন্য কোন পুরস্কার নাই, তোমরা নিজেদের পুরস্কার দুনিয়াতেই আদায় করিয়া লইয়াছ।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রঃ) বলেন, ওয়াহাব ইবনে মোনাব্বেহ হইতে বর্ণিত, জনৈক বুজুর্গ একবার তাহার সাথী-সঙ্গীগণকে বলিলেন, আমি আল্লাহর নাফরমানীর ভয়ে নিজের ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজন সব ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু আমার আশংকা হইতেছে, সম্পদশালীগণ নিজেদের ধনসম্পদের কারণে যেমন আল্লাহর নাফরমানী করে, তদ্রূপ আমরাও আমাদের দ্বীনদারীর কারণে আল্লাহর নাফরমান হইয়া যাই কি-না। আমাদের অবস্থা কিন্তু অনেকটা সেইরূপই মনে হইতেছে। কাহারো সঙ্গে যখন আমাদের সাক্ষাত হয়, তখন আমরা আশা করি যেন আমাদের দ্বীনদারীর কারণেই সেই ব্যক্তি আমাদের

ইজ্জত করে। আমরা কাহারো নিকট কোন কথা বলিলে এইরূপ কামনা করি যেন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পালন করা হয়। কোন পন্য ক্রয় করিলে আশা করি যেন আমাদের নিকট হইতে উহার মূল্য কম রাখা হয়।

উপরোক্ত বুজুর্গের এই হালাতের কথা যখন সেই দেশের বাদশাহ জানিতে পারিলেন, তখন তিনি রাজকীয় ফৌজসহ বুজুর্গের সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিলেন। এদিকে বাদশাহর আগমন সংবাদ পাইয়া চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। বুজুর্গ এই অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত লোক জড়ো হওয়ার কারণ কি? লোকেরা বলিল, মহামান্য বাদশাহ সালামাত আপনার সঙ্গে মোলাকাত করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষেই এই লোক সমাগম। বুজুর্গ ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া শাগরিদকে খানা হাজির করিতে বলিলেন। শাগরিদ সঙ্গে সঙ্গে খাবার আনিয়া হাজির করিল। এইবার তিনি জীব-জানোয়ারের মত উহা গোগ্রাসে খাইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে বাদশাহ বুজুর্গের হুজুরার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইলেন। বাদশাহ লক্ষ্য করিলেন, কক্ষের ভিতর সেই বুজুর্গ গোগ্রাসে আহার করিতেছেন। দৃশ্যটি বাদশাহর নিকট খুবই দৃষ্টিকটু মনে হইল (এবং ইতিপূর্বে তিনি বুজুর্গ সম্পর্কে যেই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেছিলেন সহসাই যেন তাহা ঘৃণায় পর্যবসিত হইল)। অতঃপর তিনি নেহায়েত সৌজন্য রক্ষার্থে আগাইয়া গিয়া বুজুর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বুজুর্গ সংক্ষেপে জবাব দিলেন, আমি ভাল আছি। বাদশাহ বলিলেন, এখানে ভাল'র কোন আশা করা যায় না। এই মন্তব্যের পরই তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বাদশাহ চলিয়া যাওয়ার পর বুজুর্গ আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করিলেন যে, বাদশাহ তাহার নিন্দা করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

আল্লাহ পাকের মোখলেস বান্দাগণের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। এই নেক বান্দাগণ সর্বদা গোপন রিয়ার ভয়ে ভীত থাকেন এবং এই ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষার জন্য সদা সতর্ক থাকেন। নিজেদের আমল ও এবাদতের উপর হইতে মানুষের নজরকে ফিরাইয়া রাখার জন্য অনেক সময় কৌশলও অবলম্বন করেন। সাধারণ ভাবে মানুষ নিজের আয়েব ও দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহওয়ালাগণ নিজেদের নেক আমলসমূহ গোপন রাখার কাজে সচেষ্ট থাকেন, যেন তাহাদের নেক আমলসমূহে রিয়ার সংমিশ্রণ ঘটিতে না পারে। ফলে যেন কেয়ামতের দিন নিজেদের আমল ও এখলাসের বিনিময় হাসিল করিতে পারেন। আল্লাহর ওলীগণ এই কথা ভাল করিয়াই জানেন যে, রোজ কেয়ামতে এখলাসপূর্ণ আমল ব্যতীত অন্য কোন আমলই কবুল হইবে

না। কেয়ামতের সেই কঠিন দিবসে কেবল নেকীরই প্রয়োজন হইবে– অপর কোন সম্পদ সেই দিন কাজে আসিবে না। না সন্তানাদি কোন কাজে আসিবে, না পিতা সন্তানদের কোন সাহায্য করিতে পারিবে। সকলেই আপন চিন্তায় নফসী! নফসী! বলিয়া চিৎকার করিতে থাকিবে।

রিয়ার কারণে সৃষ্ট মনের আনন্দের প্রকার ভেদ

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আমল প্রকাশ হওয়ার পর সকলের মনেই কিছু না কিছু আনন্দ অবশ্যই প্রকাশ পায়। এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাইবে, লোক সমাজে যার আমল প্রকাশ হওয়ার পরও মনে কোনরূপ আনন্দ অনুভূত হয় না। সুতরাং আমল প্রকাশ হওয়ার কারণে সৃষ্ট মনের আনন্দ মাত্রই কি নিন্দনীয়, না উহার কোন কোনটি প্রশংসনীয়ও আছে। এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, আমল প্রকাশ হওয়ার ফলে সৃষ্ট মনের সব আনন্দই নিন্দনীয় নহে। এই আনন্দ মোট পাঁচ প্রকার এবং উহার চারিটি উত্তম ও একটি মন্দ। নিম্নে পৃথকভাবে উহার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

প্রথম প্রকার

প্রথম প্রকার আনন্দ হইল– আবেদের উদ্দেশ্য নিজের আমল ও এবাদত গোপন রাখা এবং শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যেই এবাদত করা। কিন্তু উহার পরও যখন কোন কারণে তাহার এবাদত প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন সে এইরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দিত হইল যে, আমার এবাদত সম্পর্কে আল্লাহ পাকই মানুষকে অবহিত করিয়াছেন এবং তিনিই আমার উত্তম বিষয়গুলি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ পাক আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমি তাঁহার কৃপা ও দয়া হইতে বঞ্চিত হই নাই। আমার তো ইচ্ছা ছিল, আমার এবাদত ও গোনাহ উভয়টিই গোপন থাকুক, কিন্তু তিনি অনুগ্রহপূর্বক আমার গোনাহ ও ত্রুটিসমূহ গোপন করিয়া আমার এবাদত ও উত্তম কর্মসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ইহা অপেক্ষা বড় অনুগ্রহ আর কি হইতে পারে যে, তিনি আমার গোনাহ সমূহ ঢাকিয়া রাখিয়া আমার এবাদতগুলি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন? পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের এহেন অনুগ্রহ ও দয়ার কথা ভাবিয়া আনন্দিত হওয়া খারাপ নহে, বরং উত্তম। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا =

অর্থঃ "বলুন, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে। সুতরাং ইহারই প্রতি তাহাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ।" (সূরা ইউনুসঃ আয়াত ৫৮)

অর্থাৎ আবেদ তাহার এবাদত প্রকাশ হওয়ার কারণে আনন্দিত হয় নাই; বরং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও দয়া এবং আল্লাহর নিকট তাহার কবুলিয়াতের

কারণেই সে আনন্দিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার

এইরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দিত হওয়া যে, আল্লাহ পাক যেমন দুনিয়াতে আমার গোনাহ-খাতা ঢাকিয়া রাখিয়া আমার নেক আমলসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন; আখেরাতেও তিনি আমার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহারই করিবেন। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

ما ستر الله على عبد ذنبا في الدنيا الا ستره عليه في الاخرة

অর্থঃ 'দুনিয়াতে আল্লাহ পাক যেই গোনাহ গোপন রাখেন, আখেরাতেও সেই গোনাহ গোপন রাখিবেন।" (মুসলিম শরীফ)

তৃতীয় প্রকার

এইরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দিত হওয়া মন্দ নহে যে, মানুষ আমার এই এবাদতের অনুসরণ করিবে এবং এইভাবেই আমি দ্বিগুণ ছাওয়াব লাভ করিব। অর্থাৎ আমার আমলের ছাওয়াব তো আমি পাইবই; তদুপরি যাহারা আমার দেখাদেখি আমল করিবে বা আমার আমলের অনুসরণ করিবে উহার ছাওয়াবও আমি প্রাপ্ত হইব। যেমন, হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে– "যেই ব্যক্তি কোন ছাওয়াবের কাজ করে এবং মানুষ তাহার অনুসরণ করে, সে অনুসারীদের সমান ছাওয়াব পাইতে থাকে এবং তাহাদের ছাওয়াবও হ্রাস করা হয় না।" সুতরাং কোন কারণে ছাওয়াব বৃদ্ধি পাইলে আনন্দিত হওয়াই সঙ্গত বটে।

চতুর্থ প্রকার

চতুর্থ প্রকার হইল, এইরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দিত হওয়া যে, যাহারা তাহার এবাদতের কথা জানিতে পারিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছে, প্রকারান্তরে তাহারা আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্যের প্রতিই নিজেদের সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে এবং যাহারা আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদত করে, তাহাদিগকে মোহাব্বত করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাহাদের অন্তরেও এবাদতের প্রতি অনুরাগ বিদ্যমান এবং এবাদতের প্রতি আবেগ-অনুরাগ আছে বলিয়াই একজন আবেদের প্রশংসা করিয়াছে। নতুবা এমন বহু লোক আছে, যাহারা কোন আবেদকে দেখিলে হিংসা করে, নিন্দা করে এবং তাহাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তো একজন আবেদের প্রশংসা দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঈমানের স্বচ্ছতা প্রমাণিত হয়। আর এই ক্ষেত্রে আবেদের এখলাস ও আন্তরিকতার পরিচয় হইল– নিজের প্রশংসা শুনিয়া যেমন অন্তরে আনন্দ অনুভূত হয়, অপরের প্রশংসা শুনিয়াও অনুরূপ আনন্দ অনুভূত হওয়া।

পঞ্চম প্রকার

প্রঞ্চম প্রকারের আনন্দটি হইল মন্দ ও নিন্দনীয়। অর্থাৎ এইরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দিত হওয়া যে, আমার এবাদত-বন্দেগীর কারণেই মানুষের অন্তরে আমার মর্যাদার আসন স্থাপিত হইয়াছে এবং উহার ফলেই তাহারা আমার প্রশংসা করিতে শুরু করিয়াছে। মানুষ এখন আমার তাজীম করে, সব কাজে আমাকে অগ্রাধিকার দেয় এবং আমার সর্ববিধ খেদমতে আগাইয়া আসে। এবাদতকারীর এই জাতীয় আনন্দ নিন্দনীয় ও গর্হিত।

এমন গোপন ও প্রকাশ্য রিয়া যাহা আমলকে বাতিল করিয়া দেয়

পরিপূর্ণ এখলাস ও আন্তরিকতার সহিত আমল সম্পন্ন করিবার পর যদি উহাতে 'রিয়া' আসিয়া আক্রমণ করে, তবে এই ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে– যদি এবাদত শেষ হওয়ার পর কেবল তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ার কারণে আনন্দ অনুভূত হয় এবং নিজে এবাদত প্রকাশ না করে তবে এই আনন্দের কারণে এবাদত বাতিল হইবে না। কেননা, তাহার এবাদত রিয়ামুক্ত অবস্থায় এখলাসের সাথেই সমাপ্ত হইয়াছে। এবাদত সম্পন্ন হওয়ার পর যদি কোন রিয়া হয়, তবে আশা করা যায় উহা দ্বারা এবাদত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। বিশেষতঃ এবাদতকারী যদি নিজে তাহার এবাদতের কথা প্রকাশ না করে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে তাহা প্রকাশ করা হয়, তবে এই ক্ষেত্রেও এবাদত বাতিল হওয়ার কোন কারণ নাই। অবশ্য রিয়ামুক্ত অবস্থায় এবাদত সম্পন্ন হওয়ার পর এবাদতকারী যদি নিজের আগ্রহে তাহা প্রকাশ করে, তবে এই ক্ষেত্রে ভয়ের কারণ আছে। হাদীসে পাকের বিবরণ ও মনীষীবর্গের ভাষ্য মতে ইহা এবাদতকে বাতিলও করিয়া দেয়।

একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেনঃ আমি গত রাতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, এই এবাদতে সেই ব্যক্তির অংশ এতটুকুই, সে তাহার অংশ লইয়া গিয়াছে।

হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি আরজ করিল, আমি সারা জীবন রোজা রাখিয়াছি। তিনি এরশাদ করিলেনঃ তুমি রোজাও রাখ নাই এবং রোজাহীন অবস্থায়ও জীবন অতিবাহিত কর নাই। (মুসলিম শরীফ)

মোটকথা, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বক্তব্য এই কথাই প্রমাণ করে যে, এবাদত

করার সময়ই লোকটির অন্তরে রিয়া বিদ্যমান ছিল। এই কারণেই সে এবাদত সম্পন্ন করার পর নিজের সেই এবাদতের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। অন্যথায় এবাদত সম্পন্ন হওয়ার পর অনুষ্ঠিত কোন কর্ম এবাদতের ছাওয়াবকে বাতিল করিয়া দিবে– ইহা কেয়াস ও সাধারণ বিবেচনার পরিপন্থী। বরং কেয়াস তো এই কথাই বলে যে, রিয়ার পূর্বে কৃত আমলের ছাওয়াব সে পাইবে এবং আমল সম্পন্ন করার পর উহাকে রিয়ার মাধ্যম বানাইবার কারণে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

এক ব্যক্তি হয়ত এখলাস ও আন্তরিকতার সহিত নামাজ আদায় করিতেছে। কিন্তু এই নামাজ আদায়রত অবস্থায় যদি কিছু রিয়াও আসিয়া যুক্ত হয়, তবে তাহার নামাজের ছাওয়াব বাতিল হইয়া যাইবে। যেমন– এক ব্যক্তি যখন নফল নামাজ পড়িতেছিল, তখন সেখানে দেশের বাদশাহ বা অন্য কতক মানুষের আগমন ঘটিল। ফলে নামাজী লোকটি মনে মনে এইরূপ কামনা করিল যেন আগন্তুকগণ তাহাকে অবলোকন করে। কিংবা নামাজের মধ্যেই তাহার কোন হারাইয়া যাওয়া বস্তুর কথা স্মরণ হওয়ার পর নামাজ ভঙ্গ করিয়া উহা সন্ধান করার ইচ্ছা হইল। কিন্তু এই আশংকায় সে নামাজ ত্যাগ করিল না যে, এইরূপ করিতে দেখিলে লোকেরা খারাপ মনে করিবে। এই সময় যদি সেখানে কোন মানুষ উপস্থিত না থাকিত, তবে সে নামাজ ভঙ্গ করিয়াই সেই হারাইয়া যাওয়া বস্তুটির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইত। এমতাবস্থায় তাহার নামাজের ছাওয়াব বাতিল হইয়া যাইবে। ফরজ নামাজে এইরূপ হইলে তাহা পুনরায় আদায় করিতে হইবে।

হযরত মোয়াবিয়া ইবনে সুফিয়ান (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

العمل كالوعاء اذا طاب اخره طاب اوله

অর্থঃ "আমল হইল পাত্রের মত। উহার শেষ ভাল হইলে শুরুও ভাল হইবে।" (ইবনে মাজা)

আরেকটি অবস্থা হইল, নামাজের নিয়ত করার সঙ্গে সঙ্গেই রিয়ার ইচ্ছা করা এবং নামাজের শেষ পর্যন্ত এই রিয়ার ইচ্ছা অব্যাহত রাখা। যদি এইরূপ করা হয়, তবে এই ক্ষেত্রে সর্বসম্মত মত হইল– এই নামাজ মূল্যহীন এবং তাহা কাজা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি নামাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই রিয়ার উপর অনুতপ্ত হইয়া এস্তেগফার করে এবং ছালাম ফিরাইবার পূর্বেই রিয়া বর্জন করে, তবে এই নামাজ সম্পর্কে তিন প্রকার মতামত বর্ণিত আছে।

১. কেহ কেহ বলেন, রিয়ার ইচ্ছার সহিত নামাজ শুরু করিলে সেই নামাজ

শুদ্ধ হয় না। এই ক্ষেত্রেও যেহেতু নামাজের সূচনাতেই রিয়ার ইচ্ছা ছিল, সুতরাং তাহার নামাজ হয় নাই। নূতনভাবে নামাজের নিয়ত করিতে হইবে।

২. কেহ কেহ বলেন, এইরূপ ব্যক্তির নিয়ত ঠিক থাকিবে বটে, কিন্তু নামাজের অপরাপর কার্যক্রম যেমন, রুকু-সেজদা ইত্যাদি পুনরায় করিতে হইবে। নিয়ত বাতিল না হওয়ার কারণ হিসাবে তাহারা বলেন, নিয়ত হইল আক্দ বা বন্ধন। আর রিয়া হইল অন্তরের একটি চাহিদার নাম। তো অন্তরের এই চাহিদার কারণে নিয়ত বাতিল হইবে না।

৩. আবার কেহ কেহ বলেন, এইরূপ ব্যক্তির নামাজ পুনরায় দোহরানোর প্রয়োজন নাই। বরং সে মনে মনে এস্তেগফার করিয়া এখলাসের সহিত নামাজ শেষ করিবে। শেষ অবস্থাটিই ধর্তব্য। এই ব্যক্তি যদি এখলাসের সহিত নামাজ শুরু করিয়া রিয়ার উপর শেষ করিত, তবে তাহার নামাজ বাতিল হইয়া যাইত। কিন্তু এখানে উহার বিপরীত অবস্থা বিদ্যমান। অর্থাৎ রিয়া দ্বারা শুরু করিয়া এখলাসের সহিত শেষ করিয়াছে। সুতরাং তাহার নামাজ বাতিল হওয়ার কোন কারণ নাই। উহার উদাহরণ এইরূপ– কোন পরিষ্কার কাপড়ে নাপাকী লাগার পর যদি উহা ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়, তবে উহা সেই আগের পাক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে।

উপরে বর্ণিত শেষোক্ত দুইটি মত ফেকাহের ধারণার পরিপন্থী। বিশেষতঃ "নিয়ত ঠিক থাকিবে কিন্তু রুকু-সেজদা পুনরায় করিতে হইবে" এই উক্তিটি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা, নিয়ত বহাল রাখিয়া যদি রুকু-সেজদা বাতিল করা হয়, তবে এইগুলিকে নামাজ বহির্ভূত কর্ম বলিয়া মানিতে হইবে। আর নামাজ বহির্ভূত কোন কর্ম যদি নামাজের ভিতর করা হয়, তবে নামাজ কেমন করিয়া শুদ্ধ হইবে?

অনুরূপভাবে এই উক্তিটিও সঠিক নহে যে, "এখলাসের সহিত নামাজ শেষ করাই যথেষ্ট এবং শেষ অবস্থাটিই ধর্তব্য।" এই উক্তিটি দুর্বল হওয়ার কারণ হইল, 'রিয়া' নিয়তের বিশুদ্ধতাকে ক্ষুণ্ন করে। তো নিয়তই যদি সঠিক না হয়, তবে নামাজ সঠিক অবস্থায় শেষ হইবে কি রূপে?

ফেকাহের দৃষ্টিতে এই ক্ষেত্রে যেই অবস্থাটি বিশুদ্ধ তাহা হইল– কোন আমল যদি শুধু রিয়ার উদ্দেশ্যেই করা হয়, অর্থাৎ– সেই আমলটি যদি ছাওয়াব হাসিল কিংবা আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে করা না হয়, তবে সেই আমলের সূচনাই সঠিক হইবে না। তো নামাজের সূচনা হইল নিয়ত বা তাহ্রীমা। এখন নামাজের তাহ্রীমাই যদি শুদ্ধ না হয়, তবে উহার পরে যাহা যাহা করা হইবে, উহার কোনটিই শুদ্ধ হইবে না।

উপরোক্ত অবস্থাটির উদাহরণ যেন এইরূপ– মনে করুন, এক ব্যক্তি একা

থাকিলে নামাজ পড়িত না। কিন্তু মানুষের উপস্থিতি দেখিয়া সে নামাজের নিয়ত বাঁধিয়া লইল। এই ক্ষেত্রে মনে করা হইবে যেন তাহার নামাজের নিয়তই হয় নাই। কেননা, নিয়ত বলা হয় দ্বীনের কোন হুকুম পালনের ইচ্ছাকে। কিন্তু এখানে দ্বীনের হুকুম পালনের ইচ্ছা করা হয় নাই। অবশ্য অবস্থা যদি এইরূপ হইত যে, মানুষের উপস্থিতি না হইলেও সে নামাজ পড়িত; কিন্তু মানুষের উপস্থিতির কারণে (তাহাদের প্রশংসা লাভের আশায়) এই নামাজে তাহার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে মনে করা হইবে– এখানে দুইটি ইচ্ছা একত্রিত হইয়াছে। একটি হইল মানুষের প্রশংসা কুড়াইবার ইচ্ছা এবং অপরটি দ্বীনের হুকুম পালন। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাওয়াবের নিয়ত পরিমাণ বিনিময় পাইবে এবং যেই পরিমাণ রিয়ার নিয়ত করিয়াছে সেই পরিমাণ আজাব ভোগ করিবে। একটির কারণে অপরটি বাতিল হইবে না। অর্থাৎ যেই পরিমাণ ভাল আমল করিয়াছে সেই পরিমাণ ছাওয়াব পাইবে এবং মন্দ আমলের পরিমাণ শাস্তি ভোগ করিবে। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ –

অর্থঃ "কেহ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করিলে তাহা দেখিতে পাইবে এবং অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করিলে তাহাও দেখিতে পাইবে।" (সূরা যিলযালঃ আয়াত ৭ – ৮)

নিয়তের ক্রটির কারণে যেই নামাজ বাতিল হইয়া যায় সেই নামাজ যদি নফল হয়, তবে উহার বিধান সদকার মত। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আনুগত্য ও নাফরমানী এই দুইটি অবস্থাই বিদ্যমান। কিন্তু তবুও এইরূপ বলা যাইবে না যে, তাহার নামাজ বাতিল এবং তাহার এক্তেদা শুদ্ধ নহে। মনে করুন, এক ব্যক্তি তারাবীহ-এর নামাজ পড়িল এবং তাহার অবস্থা দ্বারাও বুঝা গেল যে, তাহার উদ্দেশ্য কেবল সুন্দর তেলাওয়াত শুনানো। অর্থাৎ যদি জামায়াতের আয়োজন না হইত, তবে সে তারাবীহ পড়িত না। এইরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে এমন বলা যাইবে না যে, তাহার পিছনে নামাজ হইবে না। এমন ধারণা করাও ঠিক নহে। বরং মুসলমান সম্পর্কে এমন ধারণাই করিতে হইবে যে, নফল নামাজ দ্বারা সে ছাওয়াবেরই নিয়ত করিয়াছে। সুতরাং তাহার নিয়ত বিশুদ্ধ এবং তাহার পিছনে নামাজ পড়াও জায়েজ যদিও তাহার অন্তরে ছাওয়াবের ইচ্ছার পাশাপাশি অন্য ইচ্ছাও যুক্ত থাকে।

পক্ষান্তরে যদি ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে এইরূপ দুইটি অবস্থা একত্রিত হয় এবং একত্রে এই উভয় ইচ্ছার কারণে নামাজ আদায় করা হয়, তবে তাহার ফরজ নামাজ আদায় হইবে না। কেননা, শরীয়তের বিধান হিসাবে ফরজ নামাজ আদায়ের ইচ্ছা তাহার মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় নাই।

অন্তর হইতে রিয়া দূর করার উপায়

উপরের সুদীর্ঘ আলোচনা দ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, রিয়ার কারণে মানুষের আমল বরবাদ হইয়া যায় এবং রিয়াকার আল্লাহর আজাব ও গজবের শিকার হয়। সুতরাং রিয়া হইল মানবাত্মার এক সর্বনাশা ব্যাধি। এই ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষার জন্য উত্তম চিকিৎসা গ্রহণ করা আবশ্যক– চাই তাহা যত কষ্টকরই হউক। কেননা, ঔষধের তিক্ততা রোগের জন্য হিতকর হয়। রিয়া হইতে আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হওয়া সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই আবশ্যক। চাই সে কম বয়সী শিশুই হউক। একজন শিশুর কোন বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে না। সে মানুষকে যাহা করিতে দেখে, উহাই তাহার কচি মানসপটে অঙ্কিত হইয়া যায়। সুতরাং সে যখন দেখে মানুষ একে অপরের সঙ্গে প্রতারণা করিতেছে, তখন সে অবচেতন মনেই বানোয়াট ও প্রতারণার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। শিশুর কচি মানসপটে অঙ্কিত এইসব অবস্থা ক্রমে তাহার অভ্যাসে পরিণত হয় এবং পরিণত বয়সে তাহার আচারআচরণ দ্বারা এইগুলিই প্রকাশ পায়। কিন্তু ক্রমে এই দুষ্ট স্বভাবগুলি মানব প্রকৃতির এমন গভীরে গিয়া বদ্ধমূল হয় যে, তখন আর খুব সহজে ঐগুলি স্বভাব হইতে নির্মূল করা সম্ভব হয় না। এই পর্যায়ে কঠিন মোজাহাদা ও ক্রমাগত চেষ্টার মাধ্যমেই তাহা স্বভাব হইতে দূর করিতে হয়। অবশ্য প্রাথমিক অবস্থায় এই মোজাহাদা খুব কষ্ট কর হইলেও পর্যায়ক্রমে তাহা সহজ হইয়া যায়।

রিয়ার চিকিৎসার দুইটি পদ্ধতি

দুই পদ্ধতিতে রিয়ার চিকিৎসা হইতে পারে। প্রথমতঃ রিয়ার মূল এবং উহার শিকড় সমূহ উপড়াইয়া ফেলা যাহা দ্বারা রিয়ার বিষবৃক্ষটি জীবনী শক্তি আহরণ করে। দ্বিতীয়তঃ উপস্থিত ক্ষেত্রে রিয়ার ক্ষতিকারক বিষয়সমূহ মিটাইয়া দেওয়া।

প্রথম পদ্ধতিঃ রিয়ার মূল ও শিকড় উৎপাটন

এই পদ্ধতিটি অবলম্বন করা যাইবে রিয়ার মূল এবং উহার যাবতীয় উপকরণ সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভের পর। এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রিয়ার প্রধান উপাদান হইল, যশখ্যাতি ও সম্মানের মোহ। এই বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করিলে যেই তিনটি বিষয় আলোচনায় আসে তাহা হইল

১. প্রশংসাপ্রীতি।

২. নিন্দার প্রতি ঘৃণা এবং

৩. মানুষের মালিকানাধীন বস্তুর প্রতি লালসা।

উপরোক্ত তিনটি বিষয় হইল রিয়ার উপকরণ এবং এই সবের ফলেই রিয়া অস্তিত্ব লাভ করে। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা দ্বারাও এই বিষয়টির প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, জনৈক আরব বেদুঈন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! যেই ব্যক্তি হামিয়্যাতের জন্য জেহাদ করে, তাহার সম্পর্কে কি হুকুম? হামিয়্যাত অর্থ হইল– সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই বিষয়ে লজ্জাবোধ করে যে, সে নিজে পরাজিত হইবে কিংবা পরাজয়ের কারণে লোকেরা তাহাকে মন্দ বলিবে। অনুরূপভাবে যেই ব্যক্তি মর্যাদা লাভ ও সুখ্যাতি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে তাহার সম্পর্কে আপনি কি বলেন? মর্যাদা লাভের অর্থ হইলঃ যশ-খ্যাতি ও মানুষের অন্তরে স্থান পাওয়ার বাসনা। আর জিকির অর্থ মৌখিক প্রশংসা লাভের বাসনা।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব বেদুঈনের উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে বলিলেন–

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর পথে আছে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যখন দুই পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন ফেরেশতা অবতীর্ণ হইয়া যোদ্ধাদের হালাত অনুযায়ী তাহাদের অবস্থা লিপিবদ্ধ করে যে, অমুক ব্যক্তি প্রশংসা লাভের আশায় যুদ্ধ করিতেছে এবং অমুক ব্যক্তি দেশের জন্য যুদ্ধ করিতেছে। "দেশের জন্য" দ্বারা পার্থিব ধন-সম্পদের কথা বুঝানো হইয়াছে।

অনেক সময় মানুষ প্রশংসা লাভের বাসনা করে না বটে, কিন্তু নিন্দার পীড়ন হইতে বাঁচিতে চাহে। যেমন কোন কৃপণ যদি এমন কতক দানশীল ব্যক্তিদের মধ্যে আটকা পড়ে, যাহারা আল্লাহর পথে প্রচুর দান করিতেছে, তখন সেই কৃপণ ব্যক্তিটিও কিছু দান করিয়া দেয়, যেন লোকেরা তাহাকে কৃপণ বলিতে না পারে। অর্থাৎ এই ব্যক্তির প্রশংসা লাভের কোন উদ্দেশ্য ছিল না, বরং তাহার উদ্দেশ্য হইল– অপমানের দুর্নাম হইতে নিজেকে রক্ষা করা। অনুরূপভাবে কোন ভীতু হয়ত রণাঙ্গনে কেমন করিয়া দুধর্ষ যোদ্ধাদের কাতারে ঢুকিয়া পড়িল। পরে সে পালাইতে চাহিল কিন্তু মানুষ দেখিয়া ফেলিলে তাহাকে ভীতু বলিবে, এই দুর্নামের ভয়ে পালাইতেও পারিল না। অতঃপর বিশেষ সতর্কতার সহিত নিজেকে বাঁচাইয়া মামুলী ধরনের কিছু আক্রমণও করিল যেন মানুষ তাহাকে 'ভীতু' বলিতে না পারে। এই ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বীর যোদ্ধাদের সারিতে থাকিয়া প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ করিয়া 'বীরযোদ্ধা' খ্যাতিলাভ তাহার

উদ্দেশ্য নহে। বরং কাপুরুষতার দুর্নাম হইতে আত্মরক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। অনেক সময় মানুষ প্রশংসার আনন্দের উপর সবর করিতে পারে বটে, কিন্তু নিন্দার কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। এই কারণেই (নিজের অজ্ঞতার ক্ষেত্রে) অপরের নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সে জিজ্ঞাসা করে না। এমতাবস্থায় এলেম ছাড়াই সে শরীয়তের রায় ঘোষণা করিয়া দেয় এবং নিজেকে শরীয়ত বিষয়ে পণ্ডিত বলিয়া দাবী করে। অথচ শরীয়ত সম্পর্কে তাহার কোন ধারণাই নাই।

রিয়ার বিশেষ চিকিৎসা

ইহা এক অনস্বীকার্য সত্য যে, মানুষ যখন কোন বস্তুকে নিজের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর মনে করে তখনই সে উহা পাওয়ার বাসনা করে। এখন সেই উপকার উপস্থিত ক্ষেত্রেই হউক কিংবা ভবিষ্যতে পাওয়ার আশা হউক। কিন্তু সে যদি এই কথা জানিতে পারে যে, সেই বস্তুর উপকারীতা ক্ষণস্থায়ী এবং ভবিষ্যতের জন্য উহা ক্ষতিকারক তবে উহা পাওয়ার বাসনা ত্যাগ করা তাহার জন্য কষ্টকর হইবে না। যেমন এক ব্যক্তি মধুর গুণাগুণ সম্পর্কে অবগত। কিন্তু সে যদি এই কথা জানিতে পারে যে, উহার সহিত বিষ মিশ্রিত আছে, তবে সে কস্মিণকালেও ঐ মধু ব্যবহার করিবে না।

সুতরাং মনের খাহেশ ও কামনা-বাসনা দূর করার উত্তম উপায় হইল, উপস্থিত লাভ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ভবিষ্যতের ভয়াবহ ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা মানুষ যদি রিয়ার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হয় এবং এই কথা জানিতে পারে যে, রিয়াকার দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে কোনরূপ তাওফীক পাইবে না এবং আখেরাতেও আল্লাহর নৈকট্য হইতে বঞ্চিত হইবে, রোজ কেয়ামতে তাহাকে কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে, আল্লাহ পাক তাহার প্রতি ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইবেন এবং হাশরের দিন সমস্ত মানুষের সম্মুখে তাহাকে অপমান করা হইবে, তাহাকে এই কথা বলিয়া লজ্জা দেওয়া হইবে যে, দুনিয়াতে আল্লাহর আনুগত্যের বিনিময়ে পার্থিব সম্পদ ক্রয় করিতে তোমার কি একটুও লজ্জা হইল না? মানুষের নিকট ভাল হওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর এবাদতের সঙ্গে উপহাস করিলে, তবে কি তুমি আল্লাহর আজাবের শিকার হইয়া মানুষের নিকট প্রিয় হওয়ার প্রত্যাশা করিতেছ? তুমি কি আল্লাহ হইতে দূর হইয়া মানুষের নৈকট্য লাভ করিতেছ এবং মানুষের প্রশংসা লাভের আশায় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ? মানুষের সন্তুষ্টির জন্য তুমি আল্লাহর অসন্তুষ্টি খরিদ করিতেছ?

অর্থাৎ বান্দা যখন এইভাবে নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করিবে এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী উপকার ও আখেরাতের স্থায়ী ক্ষতির তুলনা করিয়া দেখিবে, তখন

আর সে রিয়ার প্রতি মনোযোগী হইতে পারিবে না। রিয়ার কারণে আমল বাতিল হইয়া যাওয়া কোন মামুলী ক্ষতি নহে। আখেরাতের হিসাব দিবসে একটি মাত্র নেকীর কারণেও আমলের পাল্লা ভারী হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং রিয়ার কারণে যদি একটি নেকীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে কি উহাকে সামান্য ক্ষতি মনে করা হইবে?

উপরে রিয়ার দ্বীনী ক্ষতির কথা আলোচনা করা হইল। রিয়ার পার্থিব ক্ষতিও কোন কম নহে। আসলে রিয়া করা হয় মানুষকে তুষ্ট করার জন্যে। কিন্তু মানুষকে তুষ্ট করার এই প্রক্রিয়াটি সকল ক্ষেত্রেই সফল হয় না। উহা বরং পেরেশানীরই কারণ হয়। কোন ক্ষেত্রেই উহা মানুষের জন্য কল্যাণ বহিয়া আনে না। মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন এমনই এক দূরতিক্রম্য পথ যে, উহার শেষ অবধি পৌঁছা সহজসাধ্য নহে। মনে কর, তোমার কোন আমল দ্বারা যদি এক ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়, তবে অপর কেহ হয়ত উহা দ্বারা অসন্তুষ্ট হইবে। অর্থাৎ কতক ব্যক্তিকে অসন্তুষ্ট করিয়াই হয়ত অপর কতক ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হইবে। মানুষকে সন্তুষ্টকারী আমলটি হয়ত আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হইতে পারে। তো যেই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর মানুষের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ পাক তাহার উপর অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তাহার উপর অসন্তুষ্ট করিয়া দেন। সুতরাং উহার পরও মানুষের সন্তুষ্টি ও প্রশংসা দ্বারা কি লাভ অর্জিত হয়, তাহা বোধগম্য নহে। কেননা, মানুষের প্রশংসা ও সন্তুষ্টির কারণে তো হায়াত, দৌলত, রিজিক– ইত্যাদির কিছুই বৃদ্ধি ঘটিবে না।

মানুষের পক্ষ হইতে ধন-সম্পদ লাভের প্রত্যাশার ক্ষেত্রে এই কথা ভাবিয়া দেখা উচিৎ যে, সকল মানুষের অন্তরই আল্লাহ পাকের আয়ত্বে। তিনি কাহাকেও কিছু দেওয়ার ইচ্ছা করিলে মানুষের অন্তরকে তাহার প্রতি অনুরক্ত করিয়া দিবেন এবং ইচ্ছা না করিলে তাহার অন্তরকে ফিরাইয়া রাখিবেন। গোটা মাখলুকাত তাহার ইচ্ছার অধীন এবং তিনিই কেবল মানুষের হায়াত-মউত ও রিজিক দেওয়ার মালিক। যেই ব্যক্তি মানুষের পক্ষ হইতে রিজিক পাওয়ার আশা করিবে, সে নিজেকে অপমান ও জিল্লতী হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। মানুষের পক্ষ হইতে যদি কুত্রাপি কিছু হাসিল হয়ও, তবুও মানুষের অনুগ্রহ ও করুণার অপমান তাহাকে অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে। আর মানুষের পক্ষ হইতে মানুষের সকল চাহিদা পূর্ণ হওয়া, ইহা এক প্রকার অসম্ভবই বটে। উপস্থিত এই চাহিদা পূর্ণ হইলেও এই পূর্ণতার কারণে যেই পরিমাণ শান্তি হাসিল হইবে, তদাপেক্ষা অধিক অশান্তি ও জিল্লতী ভোগ করিতে হইবে মানুষের অনুগ্রহ লাভের কারণে।

বস্তুতঃ মানুষের নিন্দাকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। কেননা, মানুষের

নিন্দার কারণে তোমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটিবে না। তোমার তাকদীরে যাহা নির্ধারণ আছে, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। মানুষের নিন্দার কারণে তোমার হায়াত হ্রাস করা হইবে না এবং তোমার রিজিকও কমিবে না। তুমি যদি জান্নাতী হও, তবে নিছক মানুষের নিন্দার কারণেই তোমাকে ধরিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে না। তুমি যদি আল্লাহর প্রিয় বান্দা হও, তবে মানুষের সাধ্য কি তোমাকে আল্লাহর ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে? আল্লাহ সর্ব শক্তিমান। সর্বাবস্থায় মানুষ তাহার অধীন। মানুষ মানুষের লাভ-লোকসান কিছুই করিতে পারে না এবং মানুষের হায়াত-মউতও অপর কোন মানুষের করায়ত্বে নহে। আর মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে মানুষের হাত থাকার তো কোন প্রশ্নই আসে না। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا وَّ لَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَا حَيٰوةً وَّ لَا نُشُوْرًا *

অর্থঃ "এবং নিজেদের ভালও করিতে পারে না, মন্দও করিতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তাহারা মালিক নহে।" (সূরা আল ফোরকানঃ আয়াত ৩)

মানুষ যদি এইভাবে নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে রিয়ার প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কেননা, আকলমন্দ ও বুদ্ধিমান লোকেরা কখনো এমন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় না যাহা মানুষের জন্য অধিক ক্ষতিকারক ও কম উপকারী হয়। আর মানুষ যদি রিয়াকারের আভ্যন্তরীন অবস্থা জানিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি মনে মনে রিয়া করে এবং মুখে এখলাস ও আন্তরিকতা জাহির করে, তবে এই অবস্তায় অবশ্যই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে থাকিবে। আর এই কথাও সত্য যে, আল্লাহ পাক কোন না কোন সময় অবশ্যই রিয়াকারের অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিবেন যেন মানুষ তাহার মনের রিয়া এবং আল্লাহর দরবারে তাহার মূল্যহীনতার কথা জানিতে পারে। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে মানুষের কেবল রিয়ার অবস্থাই প্রকাশ করা হয় না। বরং তাহার এখলাস ও অন্তরিকতার অবস্থাও প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয়। আর এই এখলাসের কারণেই আল্লাহ পাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মানুষের নিকট প্রিয় বানাইয়া দেন। অতঃপর মানুষের মুখে মুখে তাহার প্রশংসা হইতে থাকে। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও স্মরণ রাখিবার বিষয় **হইল**, মানুষের প্রশংসা প্রাপ্তিও যেমন কোন কৃতিত্বের বিষয় নহে, তদ্রূপ মানুষের নিন্দাও দোষের নহে। এমন নহে যে, মানুষের নিন্দার কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

একদা বনু তামীমের এক কবি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসিয়া এই দাবী করিল যে,

ان مدحى زين و ان قدحي شين

অর্থাৎ– "আমার প্রশংসা মানুষের সৌন্দর্যের উপকরণ এবং আমার নিন্দা মানুষের জন্য অভিশাপ।"

আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে তাহার দাবী খণ্ডন করিয়া বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। এই গুণ এবং এই ক্ষমতা তো কেবল আল্লাহ পাকের জন্য সংরক্ষিত, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা মানুষের জন্য সৌন্দর্যের উপকরণ এবং তাঁহার নিন্দা মানুষের জন্য অভিশাপ।

মানুষের প্রশংসা ও নিন্দায় কিছু আসে যায় না। আল্লাহ পাকের নিকট যদি তুমি নিন্দিত হও এবং তোমার ভাগ্যে জাহান্নাম নির্ধারিত থাকে, তবে মানুষের প্রশংসায় তোমার কোন কল্যাণ হইবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ পাকের নিকট যদি তুমি প্রিয় হও এবং জান্নাত তোমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ থাকে, তবে মানুষের নিন্দায় তোমার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না।

যেই ব্যক্তি আখেরাতের জীবন এবং আখেরাতের অন্তহীন নেয়ামতের কথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তি পার্থিব জীবনের কদর্যতা ও দুনিয়ার তুচ্ছ নাজ-নেয়ামতকে একেবারেই মূল্যহীন মনে করিবে। এবং নিজেব দিল-দেমাগ ও চিন্তা-চেতনাকে সর্বতোভাবে আল্লাহমুখী করিতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ ব্যক্তি রিয়া ও মানুষের অনিষ্ট সাধন হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। অতঃপর তাহার এখলাস ও আন্তরিকতার নূর তাহার অন্তরকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে এবং তাহার অন্তর-চক্ষু খুলিয়া যাইবে। এমতাবস্থায় আল্লাহর সহিত তাহার সম্পর্ক আরো নিবিড় হইয়া বান্দার সঙ্গে দূরত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা এবং আখেরাতের আজমত তাহার অন্তরে বৃদ্ধি পাইবে। এই পর্যায়ে তাহার অন্তরে মাখলুকের জন্য আর কোন স্থানই অবশিষ্ট থাকিবে না এবং তাহার অন্তরে রিয়ার কল্পনাও উদয় হইবে না।

রিয়ার শিক্ষাগত চিকিৎসা

রিয়ার শিক্ষাগত চিকিৎসা হইল, নিজের এবাদত সমূহ গোপন রাখার অভ্যাস গড়িয়া তোলা। অর্থাৎ নিজের আমল-এবাদত এমনভাবে গোপন রাখিবে, যেমন গোনাহের কর্মসমূহ গোপন রাখা হয়। তোমার অন্তর যেন এই কথার উপরই তুষ্ট থাকে যে, তোমার এবাদত সম্পর্কে আল্লাহ পাক অবগত এবং তোমার মন যেন গায়রুল্লাহর অবগতির প্রয়োজন অনুভব না করে।

কথিত আছে যে, একবার হযরত আবু হাফস (রহঃ) এর এক বন্ধু দুনিয়া

ও দুনিয়াদারদের নিন্দা করিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বলিলেন, তুমি এমন কথা প্রকাশ করিয়াছ যাহা গোপন রাখা দরকার ছিল। ভবিষ্যতে আর কোন দিন তুমি আমার নিকট বসিবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল, হযরত আবু হাফস (রহঃ) দুনিয়ার নিন্দা সংক্রান্ত একটি সামান্য কথা বলিতেই কত কঠোর ভাষায় তাহাকে বারণ করিয়াছেন। উহার কারণ হইল, দুনিয়ার নিন্দার দাবী করা যেন নিজের তাকওয়া ও বুজুর্গী জাহির করারই নামান্তর। বস্তুতঃ রিয়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রে "গোপনীয়তা অবলম্বন" অপেক্ষা উত্তম ঔষধ আর কিছু নাই। এই ক্ষেত্রে আত্মসংযম ও মোজাহাদার প্রাথমিক অবস্থায় নিজের এবাদত গোপন রাখার আমলটি অতীব দুরূহ মনে হইবে বটে। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় কিছু দিন তাহা কষ্টকর হইলেও আল্লাহর রহমতে পরে তাহা ক্রমে সহজ হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ যাহারা আমল ও চেষ্টায় নিরত থাকিবে, তাহারা উহার ফল পাইবে। আর অকর্মন্য ও বেআমল লোকেরা কিছুই পাইবে না। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ =

অর্থঃ "আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যেই পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" (সূরা রা'দঃ আয়াত- ১১)

বান্দা যখন মেহনত ও মোজাহাদা করে, তখন আল্লাহ পাক হেদায়েত দ্বারা তাহাদিগকে পুরস্কৃত করেন। বান্দা করাঘাত করিলে আল্লাহ পাক রহমতের দরজা খুলিয়া দেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ =

অর্থঃ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না।"

(সূরা তওবাঃ আয়াত ১২০)

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ রিয়ার অনিষ্ট দমন করা

অর্থাৎ এবাদতের সময় যেই সমস্ত ওয়াসওয়াসা ও আপদ অন্তরে উদয় হইয়া অন্তরকে গায়রুল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট করিয়া দেয়, সেইসব বিষয়গুলি দমন করা। উহা দমন করার পদ্ধতি সকলেরই জানা থাকা আবশ্যক। যাহারা নিজের নফসের সঙ্গে জেহাদ করে, তাহারা অল্পেতুষ্টি, লোভ-লালসা বর্জন, মানুষের নজরে নিজেকে হীন করিয়া তোলা এবং মানুষের প্রশংসা ও নিন্দার প্রতি বেপরওয়া হওয়া ইত্যাদি আমলের মাধ্যমে অন্তর হইতে রিয়ার শিকড় উৎপাটন করিয়া ফেলে। অবশ্য শয়তানতো তাহাদের পিছনে লাগিয়াই থাকে। সে বরং রিয়ার আপদ-উপাদান দ্বারা মানুষকে অনুক্ষণ পেরেশান করিয়া রাখে। তো রিয়ার এইসব অবস্থা এবং ওয়াসওয়াসা ও নফসের খাহেশাত অন্তর হইতে

পরিপূর্ণরূপে দূর হয় না। বরং মোজাহাদা দ্বারা উহা দমন হইয়া থাকে। পরে রিয়ার বাহ্যিক কোন উপসর্গের স্পর্শ পাইলে পুনরায় উহা মাথাচাড়া দিয়া উঠে। এই কারণেই রিয়ার বিপদাপদ এবং উহার উপসর্গ দূর করার পদ্ধতি জানা এবং সেই অনুযায়ী চেষ্টা করা জরুরী।

রিয়ার বিপদাপদ

রিয়ার বিপদ তিনটি। কোন কোন সময় এই তিনটি বিপদ একই সঙ্গে আসিয়া হাজির হয়, কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে উহাকে একটি বিপদ বলিয়াই মনে হয়। আবার কোন কোন সময় এই তিনটি বিপদ পর্যায়ক্রমে একের পর এক আসিয়া উপস্থিত হয়। রিয়ার প্রথম বিপদ হইল– নিজের এবাদত সম্পর্কে মানুষের অবগতি এবং এই অবগতি সম্পর্কে নিজে জ্ঞাত হওয়ার বাসনা। দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রশংসা ও তারীফ এবং মানুষের নিকট মর্যাদা লাভের বাসনা অন্তরে পয়দা হওয়া। তৃতীয়তঃ নফ্স সেই অবস্থাটিকে কবুল করা এবং উহার স্থিতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

উপরোক্ত প্রথম অবস্থাটির নাম মারেফাত এবং দ্বিতীয়টির নাম হালাত। ইহাকে শাহওয়াত ও রগবতও বলা যাইতে পারে। আর তৃতীয়টির নাম হইল ইচ্ছা। আলোচ্য প্রথম বিপদটি দমনের জন্য পর্যাপ্ত শক্তির প্রয়োজন, যেন পরবর্তী দুইটি বিপদ আসিবার কোন সুযোগই না পায় এবং উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে। সুতরাং কাহারো অন্তরে যদি রিয়ার প্রথম বিপদ তথা নিজের এবাদত সম্পর্কে অপরাপর মানুষের অবগতি এবং তাহাদের অবগতি সম্পর্কে নিজে জ্ঞাত হওয়ার অবস্থা পাওয়া যায়, তবে নিজের মনকে এই কথা বলিয়া উহা দূর করার চেষ্টা করিবে যে, মানুষের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? মানুষ তোমার এবাদত সম্পর্কে জানুক বা নাজানুক– তাহাদের জানা নাজানার উপর তো তোমার এবাদত কবুল হওয়া নির্ভর করে না। আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞ এবং তিনি সকল কিছু জানেন। বান্দার এবাদত কবুল করা না করা তাঁহার ইচ্ছাধীন। এই ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর কোন হাত নাই এবং তাহাদের অবগতিতে কোন ফায়দাও নাই। তোমার অন্তরে যদি মানুষের হামদ ও প্রশংসার খাহেশ পয়দা হয়, তবে রিয়ার অনিষ্ট ও বিপদসমূহের কথা স্মরণ করিয়া অন্তর হইতে উহা দূর করার চেষ্টা করিবে। মনে মনে চিন্তা করিবে, আমি যদি এখলাস ও আন্তরিকতার সহিত এবাদত না করি, তবে আমাকে রোজ কেয়ামতে আল্লাহ পাকের ক্রোধ ও গজবের শিকার হইতে হইবে। আর এমন কঠিন সময়ে ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে যখন এই ছাওয়াব ব্যতীত রক্ষা পাওয়ার আর কোন উপায় থাকিবে না। "মানুষ আমার এবাদত সম্পর্কে অবগত হইয়াছে" এই কথা জানার কারণে যেমন অন্তরে রিয়ার প্রতি আগ্রহ পয়দা হয়,

তদ্রূপ রিয়ার অনিষ্ট এবং উহার বিপদের কথা স্মরণ করিলেও রিয়ার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

রিয়ার অনিষ্ট দমন

রিয়ার বিপদাপদ এবং উহার অনিষ্ট দূর করার জন্য তিনটি বিষয় জরুরী। সেই তিনটি বিষয় হইল– মারেফাত বা রিয়ার পরিচয় ঘৃণা এবং অস্বীকৃতি। মানুষ অনেক সময় পাক্কা এরাদা করিয়া এখলাস ও আন্তরিকতার সহিত এবাদত শুরু করে। পরে রিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং সে উহাকে গ্রহণও করিয়া লয়। এই সময় রিয়ার পরিচয় এবং উহার প্রতি তাহার ঘৃণার কথা স্মরণ থাকে না– যাহা ইতিপূর্বে তাহার অন্তরে বিদ্যমান ছিল। উহার কারণ হইল– নিন্দার ভয় ও প্রশংসাপ্রীতি। অর্থাৎ এই সময় রিয়া বা প্রশংসাপ্রীতি মনের উপর এমন প্রবলভাবে ঝাঁকিয়া বসে যে, উহার ফলে তখন মনে অন্য কিছু স্থান পায় না এবং রিয়ার অনিষ্টকর পরিণতির কথা যাহা ইতিপূর্বে অন্তরে বিদ্যমান ছিল তাহা রিয়ার নিকট পরাভূত হয়। এমনকি এক পর্যায়ে তাহা মন হইতে বাহির হইয়া যায় এবং এই সুযোগে রিয়া মনের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া লয়।

উপরের অবস্থাটির উদাহরণ যেন এইরূপঃ এক ব্যক্তি হয়ত অতীব যত্নের সহিত মনে সহনশীলতা লালন করিতেছে এবং সে ক্রোধকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে। সে দৃঢ়তার সহিত এমন প্রতিজ্ঞাও করিয়া রাখিয়াছে যে, আমার সম্মুখে ক্রোধের উপসর্গ উপস্থিত হইলেও আমি পরিপূর্ণভাবেই সহনশীল আচরণ প্রদর্শন করিব। কিন্তু পরে যখন ক্রোধের কোন কারণ আসিয়া হাজির হইল, তখন তাহার অন্তরে সহসা ক্রোধের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং মনের সেই প্রতিজ্ঞার কথা সে একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গেল। মনের কামনা-বাসনা, খাহেশাতের ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ খাহেশাতের সিক্ততায় যখন মন ভরিয়া উঠে, তখন মারেফাতের নূর নির্বাপিত হইয়া যায়।

হযরত জাবের (রাঃ) এক বর্ণনায় উপরোক্ত অবস্থাটির হাকীকত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ আমরা বৃক্ষের নীচে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই মর্মে বাইআত করিয়াছিলাম যে, আমরা জেহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করিব না, মৃত্যুর উপর বাইআত করি নাই। কিন্তু হোনাঈনের যুদ্ধের সময় আমরা সেই বাইআতের কথা ভুলিয়া গিয়া যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়নোদ্যত হইলাম। পরে যখন এই কথা বলিয়া আওয়াজ দেওয়া হইল– হে (বৃক্ষের নীচে) বাইআত গ্রহণকারীগণ! তখন আমরা পুনরায় ময়দানে ফিরিয়া আসিলাম। (মুসলিম শরীফ)

বাইআত গ্রহণ করার পরও যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করার কারণ

হইল, তাহাদের অন্তর ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং ময়দানে জমিয়া থাকার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। পরে সেই বাইআতের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তাহারা পুনরায় ময়দানে ফিরিয়া আসেন।

তো মনের এইসব আবেগ ও কামনা-বাসনা সহসাই উত্তেজিত হয়। অর্থাৎ এইসব আবেগ ও কামনার ফলে যে ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন তাহা স্মরণ থাকে না। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, রিয়ার পরিচয় ও মারেফাত যদি অন্তরে বিদ্যমান না থাকে, তবে অন্তরে রিয়ার প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ পাইবে না। কেননা, এই ঘৃণা তো মারেফাতের কারণেই সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এমনও হয় যে, মানুষ রিয়াতে লিপ্ত থাকে এবং সে এই কথাও জানে যে, তাহার অন্তর যেই অনিষ্টের শিকার হইয়াছে তাহা রিয়ার অনিষ্ট যাহা আল্লাহর আজাবের শিকার হওয়ার কারণ হইবে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও রিয়ার প্রতি মনের আকর্ষণ এমনই প্রবল হয় যে, রিয়ার পরিচয় ও মারেফাতের পরও উহাতে লিপ্ত থাকে। অর্থাৎ এই পর্যায়ে নফসের খাহেশাত তাহার বুদ্ধি-বিবেককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত উপস্থিত সুখ সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। এই সময় সে "ভবিষ্যতে তওবা করিয়া লইবে" এইরূপ প্রবোধ দ্বারা নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়া রাখে। কিংবা এমন কোন পন্থা অবলম্বন করে, যাহার ফলে রিয়া হইতে প্রাপ্ত উপস্থিত সুখের অনিষ্টের কথা তলাইয়া দেখারও সুযোগ পায় না।

এমন অনেক আলেম আছেন যাহাদের সকল কর্মের সহিতই রিয়ার সংমিশ্রণ থাকে। অথচ তাহারা রিয়ার অনিষ্ট সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত। কিন্তু তবুও রিয়া হইতে পরহেজ করিতে পারেন না। বরং ক্রমাগতভাবে রিয়া করিতেই থাকেন। তাহাদের এই "বারংবার কর্ম" তাহাদের বিরুদ্ধে বিরাট দলীল হইবে। কেননা, তাহাদের মধ্যে রিয়ার অনিষ্টের এলেম থাকা সত্ত্বেও তাহারা রিয়া করিতেছেন। এই কারণেই বলা হয়, কেবল মারেফাত বা রিয়ার অনিষ্ট বিষয়ে জানা থাকিলেই চলিবে না। বরং এই মারেফাতের পাশাপাশি রিয়ার প্রতি ঘৃণাও থাকিতে হইবে। আবার অনেক সময় রিয়া মারেফাত এবং উহার প্রতি ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও মানুষ রিয়াতে জড়াইয়া পড়ে। উহার কারণ হইল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নফসের খাহেশাতের শক্তির তুলনায় রিয়ার প্রতি ঘৃণার শক্তিটি অনেক দুর্বল থাকে। অর্থাৎ রিয়ার প্রতি ঘৃণার এইরূপ দুর্বল শক্তি খাহেশাতের প্রবল শক্তির সঙ্গে মোকাবেলা করিতে পারে না। এই কারণেই মারেফাত ও ঘৃণার উপস্থিতির পরও সে রিয়ার সহিত জড়াইয়া পড়ে। সুতরাং ঘৃণা এমন শক্তিশালী হইতে হইবে যেন উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে রিয়া হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারে। তবে শুধু ঘৃণা থাকিলেও চলিবে না। রিয়ার মা'রেফাতও থাকিতে হইবে। অর্থাৎ এই বিষয়ে শেষ কথা হইল– রিয়ার মারেফাত, রিয়ার প্রতি ঘৃণা এবং রিয়া করিতে অস্বীকৃতি– এই তিনটি উপাদান এক যোগে

বিদ্যমান থাকিলেই রিয়া হইতে নিরাপদ থাকা যাইবে।

রিয়ার প্রতি অস্বীকৃতি হইল ঘৃণার ফসল এবং ঘৃণা হইল মারেফাতের ফসল। তো মানুষের ঈমান ও আমলের নূর যেই পরিমাণ শক্তিশালী হইবে, মারেফাতও সেই পরিমাণই শক্তিশালী হইবে। অনুরূপভাবে মানুষ দুনিয়াকে যেই পরিমাণ মোহাব্বত করিবে, আখেরাতের প্রতি সেই পরিমাণ গাফেল হইবে। আর আল্লাহ পাকের এনাম ও পুরস্কার হইতে যেই পরিমাণ মুখ ফিরাইয়া রাখিবে এবং পারলৌকিক জীবনের নাজ-নেয়ামতকে যেই পরিমাণ উপেক্ষা করিবে; তাহার মারেফাতও সেই পরিমাণেই দুর্বল হইবে। ইহা এমন এক ক্রমধারা যে, ইহার একটি কড়া অপরটির সহিত জড়িত এবং একটি অপরটির ফসল। আর এই সবের মূল হইল দুনিয়ার মোহাব্বত ও খাহেশাতের প্রাবল্য। আর ইহাই হইল যাবতীয় পাপাচারের ভিত্তি। কেননা, সুনাম-সুখ্যাতি ও পার্থিব ইজ্জত-সম্পদের মোহই মানুষের মনকে দ্বীন হইতে ফিরাইয়া রাখিয়া মানুষের ঈমানী শক্তিকে নিঃশেষ করিয়া দেয়। এই পর্যায়ে মানুষ দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগে এমন ভাবে মাতিয়া উঠে যে, অতঃপর আর সে আখেরাতের কথা ভাবিয়া দেখিবারও সুযোগ পায় না।

ওয়াসওয়াসার কারণে শাস্তি দেওয়া হইবে না

মনে কর এক ব্যক্তি রিয়াকে খারাপ মনে করে এবং এই খারাপ মনে করার কারণেই কখনো সে রিয়া করে না, বরং সর্বদা রিয়া বর্জন করিয়া চলে। কিন্তু তবুও তাহার মন রিয়ার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অবশ্য রিয়ার প্রতি মনের এই আকর্ষণকেও সে খারাপ মনে করে। এখন এই ব্যক্তি রিয়াকারদের মধ্যে গণ্য হইবে কিনা।

উপরোক্ত প্রসঙ্গে প্রথম কথা হইল, আল্লাহ পাক কাহাকেও উহার শক্তির অতিরিক্ত কোন কাজের নির্দেশ দেন নাই। অর্থাৎ মানুষকে এমন কোন কর্মের সম্পাদক নিযুক্ত করা হয় নাই, যাহা তাহার শক্তি ও ক্ষমতার বাহিরে। শয়তানকে ওয়াসওয়াসা দেওয়া হইতে বারণ করা এবং মনকে কোন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতে না দেওয়া, ইহা মানব-ক্ষমতার বহির্ভূত কর্ম। মানুষের দায়িত্ব হইল, নিজের কামনা-বাসনা ও খাহেশাতকে মনের সেই ঘৃণা দ্বারা মোকাবেলা করা যাহা সে ঈমান-এলেম ও মারেফাত দ্বারা হাসিল করিয়াছে। কোন ব্যক্তি যদি এইরূপ করিতে পারে, তবে মনে করা হইবে, সে যেন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করিয়াছে। নিম্নের বিবরণ এই বক্তব্যের দলীল।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, একবার কতক ছাহাবী নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিজেদের অবস্থার বিবরণ দিয়া আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মনে অনেক সময় এমন

এমন খেয়াল পয়দা হয় যে, আমরা উহা মুখে প্রকাশ করিতে পারিব না। সেইসব খেয়ালকে ভাষায় রূপ দেওয়া অপেক্ষা ইহা উত্তম হইবে যে, আমাদিগকে যেন আকাশ হইতে নিক্ষেপ করা হয় বা কোন পাখী আমাদিগকে ছিনাইয়া লইয়া যায় কিংবা ঝড়ো হাওয়া যেন আমাদিগকে উড়াইয়া লইয়া দূরে কোথাও নিয়া নিক্ষেপ করে।

ছাহাবায়ে কেরামের উপরোক্ত বক্তব্য শুনিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি সেইসব খেয়ালকে খারাপও মনে কর? ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, হাঁ! আমরা উহাকে খারাপ মনে করি বটে। তিনি এরশাদ করিলেনঃ তবে তো ইহা সুস্পষ্ট ঈমান।

(মুসলিম শরীফ)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল, ছাহাবায়ে কেরামের অন্তরে ওয়াসওয়াসা এবং উহার প্রতি ঘৃণা বিদ্যমান ছিল। এখন ইহা তো কোনক্রমেই সম্ভব নহে যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামের মনের ওয়াসওয়াসাকে ঈমান বলিবেন। সুতরাং এই কথা মানিতেই হইবে যে, তিনি ছাহাবায়ে কেরামের মনের সেই ঘৃণাকেই পরিষ্কার ঈমান বলিয়াছেন যাহা তাহাদের অন্তরে ওয়াসওয়াসার পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল। রিয়া যদিও নিন্দনীয় কিন্তু উহা আল্লাহর ব্যাপারে ওয়াসওয়াসা করা অপেক্ষা কম নিন্দনীয়। তো ওয়াসওয়াসার প্রতি মনে ঘৃণা পোষণ করার কারণেই যদি উহার অনিষ্ট দূর হইয়া যায়, তবে তো এই ঘৃণার কারণে রিয়ার অনিষ্ট আরো উত্তম রূপেই দূর হইবে।

আবু হাজিব (রহ) বলেন, যেই অনিষ্টকে তোমার অন্তর খারাপ মনে করে এবং উহা যদি শত্রুর পক্ষ হইতে আগত হয়, তবে তোমার জন্য তাহা ক্ষতিকারক নহে। আর যেই অনিষ্টের উপর তোমার অন্তর সন্তুষ্ট, উহা তোমার জন্য ক্ষতিকর। এই বিষয়ে তুমি স্বীয় নফসকে তিরস্কার করা উচিৎ। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, শয়তানের ওয়াসওয়াসাকে যদি নফস খারাপ মনে করে তবে এমতাবস্থায় উহা আর মানুষের জন্য ক্ষতিকর থাকে না। তবে শর্ত হইল, শয়তান ও নফস যেন ঘৃণা ও অস্বীকৃতির উপর প্রবল হইতে না পারে। এখানে স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল– এমনসব উপকরণ যেইগুলির আলোচনা ও স্মরণ দ্বারা রিয়ার উদ্ভব ঘটে, উহা শয়তানের পক্ষ হইতেই হয়। আর রিয়ার সেইসব উপকরণের প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়া ইহা নফসের কর্ম। একইভাবে রিয়ার প্রতি ঘৃণা পোষণ– ইহা ঈমান ও আকলের ফসল।

এই পর্যায়ে শয়তান মানুষকে প্রতারিত করার জন্য যেই জ্বাল বিস্তার করে উহা হইল– শয়তান যখন দেখিতে পায় যে, আবেদ রিয়া করিতে অস্বীকার করিতেছে এবং কোনক্রমেই সে আবেদকে রিয়ায় জড়াইতে পারিতেছে না,

তখন সে আবেদের অন্তরে এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, শয়তান তোমাকে যেই কুমন্ত্রণা দিবে তুমি উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। অর্থাৎ এইভাবেই সে আবেদকে শয়তানের সহিত এক দীর্ঘসূত্রী বিবাদে লিপ্ত করিয়া তাহাকে এবাদত ও প্রার্থনা হইতে বঞ্চিত রাখার কৌশল অবলম্বন করে। ইহা শয়তানের এক সূক্ষ্ম চাল। কেননা, শয়তানের সঙ্গে বিবাদে জড়াইয়া এবাদত হইতে বঞ্চিত থাকা আবেদের জন্য সুস্পষ্ট ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নহে।

রিয়া হইতে আত্মরক্ষাকারীদের স্তর

যাহারা রিয়ার অনিষ্ট দমন করিয়া উহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাহে, তাহারা চারিস্তরে বিভক্ত।

প্রথম স্তর

প্রথমতঃ সেই সমস্ত লোক যাহারা রিয়ার অনিষ্ট সমূহ শয়তানের দিকেই ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে মিথ্যুক প্রতিপাদন করে। শয়তানকে কেবল মিথ্যুক বলিয়াই ক্ষান্ত হয় না, বরং তাহার সঙ্গে এই বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়। আর এই বিবাদকে এই মনে করিয়া দীর্ঘায়িত করে যে, তাহাদের ধারণায় শয়তানের সঙ্গে এইরূপ বিবাদে লিপ্ত থাকিলেই আত্মা নিরাপদ থাকিবে। আসলে এই ধারণা সঠিক নহে এবং ইহাতে ক্ষতি ছাড়া লাভের কোন অংশ নাই। কেননা, শয়তানের সঙ্গে দীর্ঘসূত্রী বিবাদে লিপ্ত হওয়ার ফলে আবেদ আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয় এবং এইভাবে সময় নষ্ট করার ফলে এমনসব কল্যাণ হইতে বঞ্চিত থাকে যাহা হাসিল করা তাহার নিজের জন্য আবশ্যক ছিল।

কোন মুসাফির যদি পথে চোর-ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইতে বিলম্ব ঘটিবে। এমনও হইতে পারে যে, পথে এইভাবে বিবাদে জড়াইয়া থাকার ফলে হয়ত নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইতেই পারিবে না। সুতরাং মুসাফিরের কর্তব্য হইতেছে, পথে চোর-ডাকাতদের সঙ্গে কোন রূপ বিবাদে না জড়ানো এবং যথাসম্ভব তাহাদিগকে এড়াইয়া নিজের গন্তব্যে পৌঁছিয়া যাওয়া।

দ্বিতীয় স্তর

দ্বিতীয়তঃ সেই সমস্ত লোক যাহারা কোনরূপ হানাহানী ও সংঘর্ষকে সাধনার পথে ক্ষতিকর মনে করে। এই কারণে তাহারা শয়তানকে কেবল মিথ্যুক সাব্যস্ত করিয়া এবং তাহার কুমন্ত্রণার প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হয়। অর্থাৎ শয়তানের সঙ্গে কোন রূপ বিরাদে লিপ্ত হইয়া নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে না।

তৃতীয় স্তর

তৃতীয়তঃ সেই সমস্ত লোক যাহারা শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রতিবাদ এবং তাহাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করার কাজেও লিপ্ত হয় না। কেননা, ইহাও একটি বিঘ্ন বটে এবং এই বিঘ্নের ফলে স্বল্প মাত্রায় হইলেও নিজেদের কাজের ক্ষতি হইবে। সুতরাং তাহারা রিয়ার প্রতি ঘৃণা এবং শয়তানকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করার কাজটি নিজেদের অন্তরেই গোপন রাখিয়া কর্তব্যকাজে লিপ্ত থাকে।

চতুর্থ স্তর

চতুর্থতঃ সেই সমস্ত লোক যাহারা মনে করে, রিয়ার উপকরণ সমূহের বিরুদ্ধাচরণ করিলে শয়তান আমাদের সঙ্গে হিংসা করিবে এবং আমাদের পিছনে লাগিয়া থাকিবে। এই শ্রেণীর লোকেরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া লয় যে, শয়তান আমাদের সঙ্গে যত শত্রুতাই করুক, আমরা এখলাসের সহিত আমাদের এবাদতে লিপ্ত থাকিব। আমরা গোপনে দান-খয়রাত করিব এবং গোপনেই এবাদত-বন্দেগী করিতে থাকিব। যেন উহা দেখিয়া শয়তান নিজের ক্রোধের আগুনে জ্বলিয়া ছারখার হইতে থাকে। আমাদের এইরূপ এখলাসপূর্ণ আমল শয়তানকে নিরাশ করিয়া দিবে এবং বাধ্য হইয়া সে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

একবার হযরত ফোজায়েল ইবনে যাওয়ানের নিকট কেহ আসিয়া বলিল, অমুক ব্যক্তি আপনার নিন্দা করিয়াছে। হযরত ফোজায়েল সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করিলেন, আমি ঐ ব্যক্তিকে জ্বালাইয়া দিব যেই ব্যক্তি আমার নিন্দাকারীকে এই গোনাহে লিপ্ত করিয়াছে। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, সেই ব্যক্তিকে কে এই গোনাহে লিপ্ত করিয়াছে আর আপনি কাহাকেইবা আগুনে জ্বালাইবেন? হযরত ফোজায়েল বলিলেন, আমি শয়তানকে জ্বালাইব; শয়তানই ঐ ব্যক্তিকে এই গোনাহে লিপ্ত করিয়াছে। অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তির জন্য এইরূপ দোয়া করিলেন– আয় আল্লাহ! যেই ব্যক্তি আমার নিন্দা করিয়াছে, তাহাকে তুমি ক্ষমা করিয়া দাও। দোয়া শেষে তিনি বলিলেন, আমার এই দোয়ার কারণে শয়তানের গায়ে আগুন জ্বলিয়া গিয়াছে। শয়তান যখন মানুষকে এইরূপ করিতে দেখে, তখন সে ঐ ব্যক্তির এবাদত বৃদ্ধির কারণ হওয়ার আশংকায় তাহার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ায়।

হযরত ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, শয়তান মানুষকে গোনাহের কাজে আহবান করে। কিন্তু মানুষ যদি শয়তানের এই আহবান প্রত্যাখ্যান করিয়া নেক আমলে মশগুল হইয়া যায়, তবে শয়তান আর তাহার নিকটেও ঘেঁষিতে পারে না। হযরত তাইমী আরো বলিয়াছেন, তুমি যখন কোন কাজে দোদুল্যমান অবস্থায় থাক, তখন শয়তান তোমাকে দেখিয়া আনন্দ পায়। পক্ষান্তরে শয়তান

তোমাকে যখন কোন কাজে স্থির দেখে, তখন সে নিরাশ হইয়া চলিয়া যায়।

আলোচ্য স্তর সমূহের উদাহরণ

হারাস মুহাসাবী উপরোক্ত চারি স্তরের লোকদের একটি চমৎকার উদাহরণ পেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মনে কর, চার ব্যক্তি হেদায়েত, বরকত ও ফজিলত হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন দরসে কোরআনে যোগদান করিতে রওয়ানা হইল। পথিমধ্যে কোন গোমরাহ বেদআতী ঐ চার ব্যক্তিকে মাহফিলে যাইতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, তাহারা যদি ঐ দ্বীনের মজলিসে গিয়া সত্যের সন্ধান লাভ করিয়া আসে, তবে আমি আর তাহাদিগকে গোমরাহ করিতে পারিব না। সুতরাং যে কোন উপায়ে তাহাদের গতিরোধ করা আবশ্যক। অতঃপর সে আগাইয়া গিয়া এক জনের সঙ্গে কথা বলিল। অতি কৌশলে সে তাহাকে ঐ মজলিসে না গিয়া গোমরাহীর পথে চলার দাওয়াত দিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি লোকটির দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইল। সে মনে করিল, এখন দ্বীনের মাহফিলে না গিয়া এই বেদআতীর ভ্রান্ত মতামত খণ্ডন করা অধিক জরুরী।

এদিকে বেদআতী লোকটির উদ্দেশ্যও এইরূপই ছিল যে, কোনক্রমে তাহাকে বিতর্কে জড়াইয়া রাখিতে পরিলেই সে দ্বীনের মজলিসের নূর হইতে বঞ্চিত হইবে। অর্থাৎ স্বল্প সময়ের জন্যও যদি তাহাকে আটকাইয়া রাখা যায় তবুও দ্বীনের নূর হইতে সে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং ইহাও আমার জন্য কম সাফল্য নহে।

অতঃপর সে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট গিয়া তাহাকেও দ্বীনের মজলিসে যাইতে বাধা দিল এবং এই ব্যক্তিকেও বিতর্কে জড়াইতে চাহিল। কিন্তু এই ব্যক্তি বেদআতীর সঙ্গে কোনরূপ বিতর্কে জড়াইল না এবং তাহাকে ধাক্কা দিয়া পথ হইতে সরাইয়া সামনে আগাইয়া গেল। কিন্তু বেদআতী এই সামান্য বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিয়াও মনে মনে খুশী হইল যে, তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে ধাক্কা দিতে যেই সময় ব্যয় হইয়াছে, অন্ততঃ তাহার এই পরিমাণ সময়ও সে নষ্ট করিতে পারিয়াছে। ইহাও তো কোন অংশে কম নহে।

অতঃপর সে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট গিয়া তাহাকে ফিরাইতে চাহিল। কিন্তু এই ব্যক্তি বেদআতীর কথায় কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সোজা মজলিসের দিকে চলিয়া গেল। অর্থাৎ এই তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে বেদআতীর আকাঙ্খা নিরাশায় পরিণত হইল।

অবশেষে চতুর্থ ব্যক্তির নিকট গিয়া সে একইভাবে তাহাকে বাধা দিতে চাহিল। কিন্তু এই ব্যক্তি তাহার কথায় তো কান দিলই না, বরং উল্টা তাহাকে অপ্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে পূর্বাধিক দ্রুত গতিতে হাঁটিয়া যথাসম্ভব অল্প সময়ের

মধ্যে মজলিসে পৌঁছাইবার প্রয়াস পাইল। অর্থাৎ বেদআতীর দাওয়াতের ফলে যেন তাহার নেক আমলে আরো গতি সঞ্চার হইল।

এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, ঘটনাক্রমে কোন দিন যদি এই বেদআতী বর্ণিত চার ব্যক্তিকে একই সঙ্গে সেই মজলিসে যাইতে দেখে, তবে প্রথম পদক্ষেপেই সে ঐ তিন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলিবে বটে, কিন্তু সেই চতুর্থ ব্যক্তির নিকটেও ঘেষিবে না। কেননা, এই ক্ষেত্রে সে পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণেই এইরূপ আশংকা করিবে যে, আমি যদি তাহাকে গোমরাহীর পথে দাওয়াত দেই, তবে উহা বরং তাহার নেকী বৃদ্ধির কারণও ঘটিতে পারে।

শয়তান হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হইবে কি-না

এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলেন, এমন কামেল স্তরের আবেদ জাহেদ যাহাদের আপাদমস্তক আল্লাহর মোহাব্বতের সাগরে নিমজ্জিত, তাহারা শয়তানের প্রতারণা হইতে নিরাপদ। বৃদ্ধ আবেদগণকে যেমন শরাব ও ব্যভিচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যায় না, তদ্রূপ এই শ্রেণীর মজবুত আবেদগনকেও গোনাহের পথে আনা সম্ভব হয় না। সুতরাং তাহাদের পক্ষে শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করা নিরর্থক।

আবার কেহ কেহ বলেন, শয়তানকে অবশ্যই ভয় করিতে হইবে। যাহাদের একীন ও তাওয়াক্কুল দুর্বল তাহারা শয়তানের প্রতারণা হইতে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। অপর এক দল বুজুর্গ বলেন, "এমন কামেল আরেফ যাহাদের অন্তরে দুনিয়ার কোন মোহাব্বত নাই, তাহারা শয়তান হইতে নিরাপদ" এই উক্তি নিছক শয়তানের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নহে। কেননা, এইরূপ ধারণার ফলে ভয়ানক বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার যথেষ্ট আশংকা রহিয়াছে। আল্লাহর নবীগণই যখন শয়তানের ওয়াসওয়াসা হইতে বাঁচিতে পারেন নাই, সুতরাং অন্যরা উহা হইতে কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে? তা ছাড়া শয়তান কেবল পার্থিব স্বাদ-সম্ভোগের ব্যাপারেই ওয়াসওয়াসা দেয় না; বরং সে আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের ব্যাপারেও সন্দেহের দরজা খুলিয়া দেয়। অনুরূপভাবে বিবিধ বেদআত ও গোমরাহীর ব্যাপারেও সে ওয়াসওয়াসা পয়দা করে। মোটকথা, কোন মানুষই শয়তানের অনিষ্ট হইতে নিরাপদ নহে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَّلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِيْ أُمْنِيَّتِهِ، فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهِ =

অর্থঃ "আমি আপনার পূর্বে যেই সমস্ত রাসূল ও নবী প্রেরণ করিয়াছি, তাহারা যখনই কোন কল্পনা করিয়াছে তখনই শয়তান তাহাদের কল্পনায় কিছু

মিশ্রণ করিয়া দিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ দূর করিয়া দেন শয়তান যাহা মিশ্রণ করে। ইহার পর আল্লাহ্ তাঁহার আয়াত সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।"

(সূরা হজ্বঃ আয়াত ৫২)

আল্লাহর নবীগণও শয়তানের প্রতারণা হইতে বাঁচিতে পারেন নাই। হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) জান্নাতে বসবাস করিতেছিলেন, যেখানে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার কোন অভাব ছিল না। আল্লাহ পাক তাঁহাদের নিকট এই বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন যে,

اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى * اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى * وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُ فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى *

অর্থঃ "এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন বাহির করিয়া না দেয় তোমাদের জান্নাত হইতে। তাহা হইলে তোমরা কষ্টে পতিত হইবে। তোমাকে এই দেওয়া হইল যে, তুমি ইহাতে ক্ষুধার্ত হইবে না এবং বস্ত্রহীন হইবে না। এবং তোমার পিপাসাও হইবে না এবং রৌদ্রেও কষ্ট পাইবে না।"

(সূরা তোয়া হাঃ আয়াত ১১৭ -১১৯)

হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে বেহেশতের সমস্ত নেয়মত ভোগ করার সুযোগ দিয়া শুধু একটি বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। কিন্তু শয়তান তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া সেই বৃক্ষের ফল খাইতে উদ্বুদ্ধ করিল। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, একজন নবী বেহেশতে থাকিয়াও যদি শয়তানের প্রতারণার শিকার হইয়া থাকেন, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে ফেৎনা-ফাসাদে ভরপুর এই বালা-মুসীবতের দুনিয়াতে থাকিয়া শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর উক্তি নকল করিয়াছেন–

هذا من عمل الشيطن

অর্থঃ "ইহা শয়তানের কাজ।"

এই কারণেই আল্লাহ্ পাক সমস্ত মাখলুককে শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া ফরমাইয়াছেন–

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ =

অর্থঃ "হে বনী-আদম! শয়তান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে।"

(সূরা আল-আরাফঃ আয়াত ২৭)

শয়তান সম্পর্কে আরো বলা হইয়াছে–

اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ =

অর্থঃ "সে এবং তাহার দলবল তোমাদিগকে দেখে, যেখান হইতে তোমরা তাহাদিগকে দেখ না।" (সূরা আল-আরাফঃ ২৭)

পবিত্র কোরআনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকার এবং তাহাকে ভয় করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এমতাবস্থায় কোন্ ব্যক্তি এমন দাবী করিতে পারে যে, শয়তানের ব্যাপারে তাহার কোন ভয় নাই এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা হইতে সে নিরাপদ? আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী শয়তান হইতে আত্মরক্ষা করা– আল্লাহর মোহব্বতে মশগুল হওয়ার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী নহে। কেননা, আল্লাহর মোহাব্বতের কারণেই তো সে আল্লাহর হুকুম পালন করিতেছে। মানুষের চির শত্রু শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে এমন নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যেমন কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির সহিত মোকাবেলা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ

অর্থঃ "তাহারা যেন আত্মরক্ষার হাতিয়ার সঙ্গে নেয়।" (সূরা নিসাঃ আয়াত ১২০)

আরো এরশাদ হইয়াছে–

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ =

অর্থঃ "আর প্রস্তুত কর তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য হইতে এবং পালিত ঘোড়া হইতে।"

(সূরা আনফাল ঃ আয়াত ৬০)

ইহা দ্বারা প্রমাণ হইয়া গেল যে, এমন কাফের দুশমন যাহাকে তুমি দেখিতে পাও; তাহার অনিষ্ট হইতে বাঁচিয়া থাকা যদি জরুরী হয়, তবে এমন দুশমনের অনিষ্ট হইতে বাঁচিয়া থাকা আরো অধিক জরুরী হইবে– যাহাকে তুমি দেখিতে পাওনা কিন্তু সে তোমাকে দেখিতে পায়। কারণ, শত্রুকে তুমি দেখিতে পাওনা, কিন্তু শত্রু তোমাকে দেখিতে পায়– ইহা তোমার জন্য অত্যন্ত বিপদজনক।

মোহাম্মদ ইবনে মুহাইরিজ (রহঃ) বলেন, এমন শিকার তুমি সহজে কাবু করিতে পারিবে যাহাকে তুমি দেখিতে পাও কিন্তু সে তোমাকে দেখিতে পায় না। পক্ষান্তরে এমন শিকার তোমার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে, যে তোমাকে দেখিতে পায় কিন্তু তুমি তাহাকে দেখিতে পাওনা। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, মানুষের পক্ষে শয়তানকে কাবু করা সহজসাধ্য নহে। শয়তান মানুষের জন্য কাফের

শত্রুর চাইতেও অধিক ভয়ংকর। কেননা, তুমি যদি গাফেল অবস্থায় কাফেবের হাতে নিহত হও, তবে শাহাদাতের মর্যাদা পাইবে। পক্ষান্তরে গাফেল অবস্থায় শয়তান যদি তোমাকে গোমরাহ করে, তবে তোমাকে দোজখের কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে।

সারকথা হইল, আল্লাহ তায়ালার এবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকার জন্য ইহা জরুরী নহে যে, তিনি যাহাকে ভয় করিতে বলিয়াছেন এবং যাহার অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষা করিতে বলিয়াছেন তাহাকে ভয় করিতে হইবে না এবং তাহার অনিষ্ট হইতেও আত্মরক্ষা করিতে হইবে না। এমন মনে করিবারও কোন কারণ নাই যে, এই ক্ষেত্রে "শত্রু হইতে সতর্কতা অবলম্বন" আল্লাহর এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী হইবে।

পার্থিব উপকরণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নহে

যাহারা বলে, "তদ্বির ও পার্থিব উপায়-উপকরণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী" তাহাদের এই ধারণা সঠিক নহে। তাহাদের জানা উচিৎ যে, আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রণাঙ্গণে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, শত্রু হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাল ব্যবহার করিয়াছেন, সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং শত্রুর গতি রোধ করার জন্য পরিখা খনন করিয়াছেন। অর্থাৎ শত্রু পক্ষের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য তিনি এই ধরনের আরো অনেক রণকৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তবে কি তাঁহার এইসব কৌশল ও পার্থিব উপায়-উপকরণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী ছিল? স্বয়ং আল্লাহ পাক যেই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, সেই বিষয়ে সতর্ক হওয়া এবং আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা কখনো তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী হইতে পারে না। যাহারা মনে করে- তাওয়াক্কুলের অর্থ হইতেছে, "যাবতীয় উপায়-উপকরণ বর্জন" তাহারা মারাত্মক বিভ্রান্তিতে নিপতিত। আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন- و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل (আর প্রস্তুত কর তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য হইতে এবং পালিত ঘোড়া হইতে)- ইহা কখনো তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নহে। তবে শর্ত হইল, মনে এইরূপ বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, লাভ-ক্ষতি, হেদায়েত ও গোমরাহী ইত্যাদি সবই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এই ক্ষেত্রে যাবতীয় উপায়-উপকরণ ও চেষ্টা-তদ্বির কেবল উসিলামাত্র। অন্যথায় আল্লাহ পাক যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই হইবে।

শয়তান হইতে সতর্ক হওয়ার পদ্ধতি

শয়তান হইতে আত্মরক্ষা করা ও সতর্ক হওয়ার ব্যবস্থা করা যাইবে কি-না,

এই বিষয়ে উপরে একাধিক মতামত উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহারা মনে করেন, শয়তান হইতে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে, তাহাদের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে যে, ঐ ব্যবস্থার ধরণ ও প্রক্রিয়া কি হইবে? এই শ্রেণীটির কতক লোক মনে করেন, আল্লাহ পাক যেহেতু আমাদিগকে শয়তানকে ভয় করিতে বলিয়াছেন, সেহেতু আমাদের অন্তরে শয়তানের ভয় এবং শয়তানের কথা স্মরণ রাখা ছাড়া অন্য কিছু আমাদের অন্তরে প্রবল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। শয়তানের ব্যাপারে যদি আমরা এক মুহূর্তও গাফেল হই, তবে সে আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে।

আবার কতক লোক মনে করেন, অনুক্ষণ শয়তানের ভয় এবং তাহার খেয়াল আমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল করিয়া দিবে। আর শয়তানেরও লক্ষ্য হইল, যে কোন কৌশলেই হউক বান্দাকে আল্লাহর স্মরণ হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারিলেই হইল। সুতরাং আমাদের কর্তব্য, সর্বদা আল্লাহর এবাদত-আনুগত্য ও তাঁহার স্মরণে নিমগ্ন থাকা এবং শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। অর্থাৎ আল্লাহর এবাদত ও জিকিরের পাশাপাশি শয়তানের প্রতারণার কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে। বরং সর্বদাই এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। তবে এমন যেন না হয় যে, শয়তানের ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল হইয়া যাই। অর্থাৎ শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক খেয়াল এবং আল্লাহর স্মরণ- এই দুইটি অবস্থা একই সঙ্গে বিদ্যমান থাকিতে হইবে। কেননা, আমরা যদি শয়তানের কথা ভুলিয়া থাকি, তবে এমনও হইতে পারে যে, এই সুযোগে শয়তান আমাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিবে। অনুরূপভাবে যদি শয়তানের প্রতারণা হইতে বাঁচার উদ্দেশ্যে সর্বদা শয়তানের খেয়াল করিয়া বসিয়া থাকি, তবে উহার ফলে আমরা আল্লাহর স্মরণ হইতে বঞ্চিত হইব। এই কারণেই শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এই ব্যাপারে যথাযথ সতর্কতা এবং আল্লাহর জিকির ও স্মরণ- এই দুইটি বিষয় একই সঙ্গে বিদ্যমান হওয়া জরুরী।

শয়তানের প্রতারণা হইতে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে কি উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে, এই প্রসঙ্গে উপরে দুইটি শ্রেণীর মতামত উল্লেখ করা হইল। কিন্তু মোহাক্কেক ওলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন, উপরোক্ত দুইটি শ্রেণীই চরম বিভ্রান্তিতে নিপতিত। প্রথমোক্ত শ্রেণীটির বিভ্রান্তি হইল, তাহারা কেবল শয়তানের কথা স্মরণ রাখাকেই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন এবং আল্লাহর জিকির ও স্মরণকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। এই শ্রেণীটির বিভ্রান্তি সুস্পষ্ট। কেননা, আল্লাহ পাক আমাদিগকে এই কারণে শয়তান হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হুকুম করিয়াছেন যেন আমরা আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল হইয়া না যাই। পক্ষান্তরে

আমাদের অন্তরে যদি সকল কিছু অপেক্ষা শয়তানের স্মরণই প্রবল হয়, তবে ইহা আমাদের জন্য কেবল ক্ষতিরই কারণ হইবে। কেননা, আমাদের অন্তরে যদি শয়তানের স্মরণই প্রবল হয়, তবে উহার স্বাভাবিক পরিণতিতে আমাদের জেহেন ও চিন্তা-চেতনা হইতে আল্লাহর নূর একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। শয়তান তো এই ধরনের অন্তরই খুঁজিয়া বেড়ায় যেই অন্তরে আল্লাহর জিকির-ফিকির এবং আল্লাহর নূর না থাকে। আর শয়তান যে এই ধরনের অন্তরকে সহজেই গ্রাস করিয়া লইবে, ইহাতে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নাই। আমাদিগকে এমন হুকুম করা হয় নাই যে, আমরা কেবল শয়তানের জন্যই অপেক্ষা করিতে থাকিব এবং সর্বদা কেবল তাহার কথাই স্মরণ করিব।

দ্বিতীয় শ্রেণীটিও প্রথমোক্ত শ্রেণীর মত বিভ্রান্তিতে নিপতিত। তাহারাও আল্লাহর স্মরণ ও শয়তানের স্মরণ– এই দুইটি বিষয়কে একত্রিত করিয়াছে। উহার অর্থ দাঁড়াইতেছে– মানুষের অন্তরে যেই পরিমাণ শয়তানের স্মরণ বিদ্যমান হইবে, তাহার অন্তর সেই পরিমাণেই আল্লাহর স্মরণ ও জিকিরের নূর হইতে বঞ্চিত হইবে। অথচ আল্লাহ্ পাক মানুষকে তাঁহার জিকির ও স্মরণের হুকুম করিয়াছেন। সুতরাং মোমেনের অন্তরে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন কিছুই বিদ্যমান হওয়ার যোগ্য নহে। চাই তাহা শয়তানের স্মরণ হউক বা অন্য কিছু।

সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে উপরে দুই শ্রেণীর অবস্থা বর্ণনা করা হইল। এই ক্ষেত্রে সঠিক মতামত হইল– মানুষ শয়তানকে ভয় করিবে এবং শয়তান যে মানুষের চির শত্রু এই কথাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করিবে। এই একীন ও বিশ্বাস যখন মোমেনের অন্তরে বিদ্যমান হইবে, তখন সে কেবল আল্লাহর কথাই স্মরণ রাখিবে এবং তাঁহার জিকিরেই নিরত থাকিবে। এমতাবস্থায় শয়তানের কথা সে কল্পনাও করিবে না এবং শয়তানের ভয় নিজের উপর আরোপ করার কোন প্রয়োজন হইবে না। কেননা, শয়তান যে তাহার চির শত্রু এই কথা তাহার অন্তরের গভীরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় শয়তান তাহাকে ওয়াসওয়াসা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সে তাহা জানিতে পারিবে এবং উহার মোকাবেলায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। আল্লাহর ইয়াদ ও স্মরণে নিমগ্ন হইলেই শয়তানের ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাইবে না– এমন কোন কথা নাই। মনে কর, রাতে শয়নকালে কোন ব্যক্তির মনে যদি এই আশংকা বিদ্যমান থাকে যে, আমি যদি প্রভাতের প্রথম প্রহরে জাগ্রত হইতে না পারি, তবে আমার অমুক গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বিষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তবে রাতে কিছুক্ষণ পরপরই তাহার নিদ্রা টুটিয়া যাইবে এবং ঘুমের মধেই সে বার বার চমকাইয়া উঠিবে। অথচ নিদ্রাবস্থায় সে এককভাবেই নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে এবং তখন তাহার সেই কাজের কথা স্মরণে থাকে না। কিন্তু তবুও যথা সময় জাগ্রত না হওয়ার আশঙ্কায় বার বার তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া

যাইতেছে। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহর ইয়াদ ও জিকিরে নিমগ্ন হওয়া– শয়তানের ওয়াসওয়াসার ব্যাপারে অবগতি লাভের পথে অন্তরায় নহে।

কেবল সেই সকল অন্তরই শয়তানের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারে যাহারা আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকে, যাহাদের অন্তর নফসানী খাহেশাত হইতে মুক্ত এবং যাহাদের এলেম ও আকলের নূর খাহেশাতের তমশাকে মিটাইয়া দিয়াছে। নফসানী খাহেশাত হইতে অন্তর পাক হওয়ার উদাহরণ হইল কোন কূপকে নাপাকী হইতে পাক করার মত। তো যাহাদের অন্তরে শয়তানের স্মরণ বিদ্যমান থাকে তাহাদের অন্তর নাপাকী মিশ্রিত। সুতরাং যাহাদের অন্তরে আল্লাহর জিকির ও শয়তানের স্মরণ একই সঙ্গে বিদ্যমান থাকে তাহাদের অবস্থা যেন এইরূপ– মনে কর, কোন ব্যক্তি কূপ পাক করার সময় যদি এক দিক হইতে পানি পরিষ্কার করে এবং অন্য দিক হইতে উহাতে নাপাকী প্রবেশ করিতে থাকে তবে এইভাবে কখনো কুপ পাক হইবে না। বরং এইভাবে তাহার পরিশ্রম পণ্ড হইবে এবং উদ্দেশ্যও সফল হইবে না। সুতরাং উহা পাক করার উপায় হইল– আগে নাপাকী প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া উহা পরিষ্কার করার পর পাক পানি দ্বারা উহা ভরিয়া দিতে হইবে। অতঃপর নাপাকী আসিলেও উহা প্রবেশ করার পথ পাইবে না এবং কূপও আর নাপাক হইবে না।

এবাদত প্রকাশ করা যেই ক্ষেত্রে জায়েজ

এবাদত গোপনে করাই এখলাস ও আন্তরিকতার পরিচায়ক এবং গোপনে এবাদত করার মধ্যেই যেমন রিয়া হইতে মুক্ত থাকার উপকারিতা বিদ্যমান, তদ্রূপ এবাদত প্রকাশ করার মধ্যেও অপরের জন্য উহা অনুসরণ করা ও আমলের প্রতি উৎসাহিত হওয়ার উপকারিতা বিদ্যমান। অবশ্য এবাদত প্রকাশ করার মধ্যে রিয়ার আশংকা থাকে বটে। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, মুসলমানগণ এই কথা ভাল করিয়াই জানে যে, এবাদত গোপন রাখাই নিরাপদ। তবে উহা প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও একটি ভালর দিক আছে। এই কারণেই পবিত্র কোরআনে গোপন ও প্রকাশ্য এই দুই প্রকার এবাদতেরই প্রশংসা করিয়া এরশাদ হইয়াছে–

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ، وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

অর্থঃ “যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর তবে তাহা কতইনা উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়া দাও, তবে তাহা তোমাদের জন্য আরো উত্তম।” (সূরা বাক্বারাঃ আয়াত ২৭১)

এবাদত প্রকাশ করার দুইটি উপায় হইতে পারে। প্রথমতঃ মূল এবাদতটিই প্রকাশ করা। দ্বিতীয়তঃ এবাদত করার পর তাহা মানুষকে বলিয়া দেওয়া। নিম্নে

আমরা পৃথক শিরোণামে উহার উপর আলোচনা করিব।

মূল এবাদত প্রকাশ করা

মূল এবাদত প্রকাশ করার উদাহরণ হইল, প্রকাশ্যে লোকজনের সম্মুখে দান-সদকা করা যেন উহা দেখিয়া অপরাপর লোকেরাও দান-খয়রাত করার প্রতি উৎসাহিত হয়। এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার জনৈক আনসারী নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া একটি টাকার থলি পেশ করিলেন। অতঃপর তাহার দেখাদেখি উপস্থিত অপরাপর ছাহাবীগণও দান করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন–

من سن سنة حسنة فعمل بها كان له اجرها و اجر من اتبعه

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি একটি সৎকর্ম প্রচলন করে, অতঃপর মানুষ উহার উপর আমল করে, তবে সেই আমলের ছাওয়াব তো পাইবেই; যাহারা উহার অনুসরণ করে, তাহাদের ছাওয়াবও পাইবে।" (মুসলিম শরীফ)

অনুরূপভাবে নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি এবাদতগুলির অবস্থাও তদ্রূপ। কিন্তু দান-খয়রাতের অবস্থাটা একটু ভিন্ন রকম। কেননা, এই ক্ষেত্রে মানুষ একে অপরের অনুসরণ করিয়া থাকে এবং একজনের দেখাদেখি অন্যরাও দান করার প্রতি উৎসাহিত হয়। একজন যোদ্ধা যখন আল্লাহর পথে জেহাদ করার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন তাহার পক্ষে সকলের সম্মুখেই উহার প্রস্তুতি গ্রহণ করা উত্তম। যেন তাহার দেখাদেখি অন্যরাও জেহাদের প্রতি উৎসাহিত হয়। এই এবাদত প্রকাশ করা এই কারণে ক্ষতিকর নহে যে, বস্তুতঃ জেহাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ এমন একটি প্রকাশ্য এবাদত যাহা গোপনে করার কোন উপায় নাই। সুতরাং সকলের সম্মুখে জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা "এবাদত প্রকাশ করা" নহে। উহার ফলে বরং দর্শকগণও জেহাদের প্রতি উৎসাহিত হইবে। অনুরূপভাবে রাতে তাহাজ্জুদের নামাজে শব্দ করিয়া ক্বেরাত পড়া যেন ঘরের অন্যরাও জাগিয়া উঠিয়া তাহার অনুসরণ করে– ইহাও ক্ষতিকর নহে।

মোটকথা, যেইসকল এবাদত গোপনে করা সম্ভব নহে যেমন– জেহাদ, হজ্ব, জুমুআর নামাজ ইত্যাদি; এইগুলি অপরকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে করা উত্তম। আর যেই সকল এবাদত গোপনে করা সম্ভব, যেমন দান-খয়রাত, এইগুলি প্রকাশ্যে করিলে যদিও অপরের জন্য উৎসাহের কারণ হয় কিন্তু বিত্তহীন লোকেরা যদি এইগুলি দেখিয়া ব্যথা পায়, তবে গোপনে করাই উত্তম। কেননা, কাহাকেও কষ্ট দেওয়া হারাম। যদি অপরের জন্য কোনরূপ কষ্টের কারণ না হয় তবে এই ক্ষেত্রে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, অপরের জন্য উৎসাহের

কারণ হইলেও গোপনে করাই ভাল। আবার কেহ কেহ বলেন, প্রকাশ্যে করা যদি অপরের জন্য উৎসাহের কারণ না হয়, তবে গোপনে করাই ভাল। আর অপরের জন্য উৎসাহের কারণ হইলে প্রকাশ্যে করা ভাল। উহার দলীল হইল, আল্লাহ পাক পয়গম্বরগণকে প্রকাশ্যে ইবাদত করার হুকুম করিয়াছেন, যেন অন্যরা তাঁহাদের অনুসরণ করে। নবীগণ সম্পর্কে এইরূপ ধারণা করার অবকাশ নাই যে, তাঁহারা উত্তম আমল হইতে বঞ্চিত হইবেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে যেইরূপ আমল করার হুকুম করা হইয়াছিল উহা উত্তমই ছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটিও প্রকাশ্য আমল উত্তম হওয়ার দলীল–

له اجرها و اجر من عمل بها

অর্থাৎ– "সে ঐ আমলের ছাওয়াব তো পাইবেই, যাহারা উহার অনুসরণ করে তাহাদের ছাওয়াবও পাইবে।" (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু দারদা ও হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ–

ان عمل السر يضاعف على عمل العلانية سبعين ضعفا و يضاعف عمل العلانية اذا استن بعامله علي عمل السر سبعين ضعفا

অর্থঃ গোপন আমলের ছাওয়াব প্রকাশ্য আমলের তুলনায় সত্তরগুণ বেশী। কিন্তু যেই প্রকাশ্য আমল অন্যরা অনুসরণ করে, উহার ছাওয়াব গোপন আমলের তুলনায় সত্তর গুণ বেশী। (বায়হাকী)

উপরোক্ত হাদীছের ব্যাপারে মতানৈক্যের কোন অবকাশ নাই। কেননা, অন্তর যদি রিয়া হইতে পবিত্র হয় এবং প্রকাশ্য ও গোপন উভয় আমলই যদি এখলাসের সহিত সম্পন্ন হয়, তবে প্রকাশ্য আমলই উত্তম হইবে। কারণ, এই ক্ষেত্রে অন্যদের জন্য অনুসরণের সুযোগ রহিয়াছে। অর্থাৎ এই আমল দেখিয়া অন্যরাও এইরূপ আমল করিতে উৎসাহিত হইবে। প্রকাশ্য আমলের ক্ষেত্রে ভয় শুধু রিয়ার। আমলের সহিত যদি রিয়ার মিশ্রণ থাকে, তবে এই রিয়াযুক্ত আমল দ্বারা নিজে ধ্বংস হইয়া অপরকে অনুসরণের সুযোগ দেওয়াতে কোন ফায়দা নাই।

প্রকাশ্য আমলের শর্ত

আমল প্রকাশের ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রথম বিষয়

এমন লোকদের সামনে আমল প্রকাশ করা যাহাদের সম্পর্কে উহা

অনুসরণের নিশ্চিত বিশ্বাস কিংবা সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। কেননা, এককভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষের আমল সকলেই অনুসরণ করিবে– এমন হওয়া সম্ভব নহে। যেমন, এক ব্যক্তিকে হয়ত ঘরের লোকেরা অনুসরণ করে কিন্তু প্রতিবেশীগণ তাহাকে অনুসরণ করে না। আবার কোন ব্যক্তিকে হয়ত প্রতিবেশীগণ অনুসরণ করে কিন্তু বাজারের লোকদের নিকট সে অনুসরণীয় নহে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তিকে হয়ত তাহার মহল্লার লোকেরাই অনুসরণ করে কিন্তু মহল্লার বাহিরের লোকেরা তাহাকে অনুসরণ করে না।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও প্রসিদ্ধ আলেমগণকে প্রায় সকলেই অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি আলেম নহেন তিনি যদি নিজের কোন আমল প্রকাশ করেন, তবে এমনও হইতে পারে যে, সাধারণ লোকেরা হয়ত উহাকে রিয়া মনে করিয়া বসিবে এবং উহার ফলে তাহাকে অনুসরণের পরিবর্তে হয়ত তাহার নিন্দা করিতে শুরু করিবে। এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে কস্মিনকালেও নিজের আমল জাহির করা উচিৎ নহে। কেননা, লোকেরা তাহার এবাদত কবুল করিবে না। সুতরাং যেই উদ্দেশ্যে আমল প্রকাশ করা হয় তাহা পূরণ হইবে না। মানুষের অনুসরণের নিয়তে কেবল এমন ব্যক্তিই নিজের আমল প্রকাশ করিতে পারিবে, যার মধ্যে মানুষের নিকট অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্যতা আছে। অর্থাৎ আমভাবে ইহা সকলের কাজ নহে।

দ্বিতীয় বিষয়

দ্বিতীয়তঃ সর্বদা নিজের অন্তর ও আমলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন উহা রিয়া দ্বারা আক্রান্ত না হয়। কেননা, এমনও হইতে পারে যে, মনের গহিন কোণে হয়ত রিয়া বিদ্যমান এবং সেই রিয়ার কারণেই হয়ত আমল জাহির করা হইতেছে– যদিও প্রকাশ্যে মানুষের অনুসরণের কথা বলা হইতেছে। অর্থাৎ সে হয়ত মনে মনে কামনা করিতেছে– আমার এই নেক আমল প্রকাশ হওয়ার ফলে আমি মানুষের নিকট অনুসরণীয় হইতে পারিব। অধিকাংশ লোকই সাধারণ মানুষের নিকট অনুসরণীয় হইতে পারিবে। অধিকাংশ লোকই সাধারণ মানুষের নিকট অনুসরণীয় হওয়ার আশায় এইভাবে নিজের আমল প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহাদের অন্তরে এখলাস আছে, তাহারা কখনো এইরূপ করিতে পারে না।

দুর্বলমনাদের অবস্থা যেন এইরূপ– কোন ব্যক্তি হয়ত নিজে ভালভাবে সাঁতার কাটিতে পারে না। কিন্তু যখন কতক ব্যক্তিকে পানিতে ডুবিয়া যাইতে দেখিল, তখন উত্তাল তরঙ্গমালায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সেই বিপন্ন লোকদেরকে উদ্ধার করিতে আগাইয়া গেল। এমতাবস্থায় বিপন্ন লোকদের সকলেই প্রাণে রক্ষা পাওয়ার আশায় সেই ব্যক্তিকে জড়াইয়া ধরিবে এবং উহার ফলে সে

নিজেও ডুবিয়া মরিবে এবং অন্যরাও পানিতে তলাইয়া প্রাণ হারাইবে। তো পানিতে ডুবিয়া প্রাণ হারাইবার কষ্ট স্বল্প সময়ের। কিন্তু রিয়ার কারণে যদি কেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহাকে অনন্তকাল আজাবের শিকার হইতে হইবে।

রিয়া এক সর্বনাশা ব্যাধি

রিয়া এমন এক সর্বনাশা ব্যাধি যে, উহাতে আলেম-আবেদ নির্বিশেষে সকলেই আক্রান্ত। একজন রিয়াকার মনে করে আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন একজন বুজুর্গ যেইভাবে নিজের আমল প্রকাশ করেন, আমরাও সেইভাবেই নিজের আমল জাহির করিব। অথচ এই রিয়াকারের অন্তরে এখলাসের কোন শক্তি নাই। এমতাবস্থায় আমল প্রকাশ করিলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে। অন্তরে রিয়ার উপস্থিতি অনুমান করা বড় কঠিন। আমল প্রকাশের ক্ষেত্রে রিয়ার সংমিশ্রণ আছে কিনা তাহা জানিবার উপায় হইল, এই সময় আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিবে যে, এখন যদি অন্য কোন আবেদ নিজের আমল প্রকাশ করিয়া মানুষের অনুসরণীয় হয়, তবে উহার পরও তুমি নিজের আমল প্রকাশ করার খাহেশ করিবে, না গোপন আমলকেই অগ্রাধিকার দিবে? অর্থাৎ উহার পরও যদি নফস এইরূপ খাহেশ করে যে, আমিই মানুষের অনুসরণীয় হইব, তবে মনে করিতে হইবে যে, এ স্থলে আমল প্রকাশের ক্ষেত্রে এখলাস বিদ্যমান নহে এবং ছাওয়াব প্রাপ্তিও উদ্দেশ্য নহে। বরং শুধুই রিয়ার জন্য আমল প্রকাশ করা হইতেছে। এই ক্ষেত্রে বরং তোমার উদ্দেশ্য এইরূপও নহে যে, তোমার আমল প্রকাশের ফলে মানুষের মধ্যে অনুকরণের অভ্যাস গড়িয়া উঠুক এবং তাহারাও যেন অপরের দেখাদেখি নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত হয়। কেননা, এই উৎসাহ তো আবেদগণকে দেখিয়াও হইতে পারে।

সুতরাং নফসের প্রতারণা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। প্রকাশ্য আমল খুব কমই বিপদমুক্ত হইয়া থাকে। এই কারণে সর্বদা আমলের নিরাপত্তার দিকটিকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে এবং এমন কোন বিষয়ের প্রত্যাশা করা সঙ্গত হইবে না যাহা দ্বারা নিজের কৃত আমল ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। বস্তুতঃ গোপনীয়তার মধ্যেই আমলের নিরাপত্তা নিহিত। আমল প্রকাশ করিয়া দিলে উহা এমন সব বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে যাহা অতিক্রম করা হয়ত আমাদের মত দুর্বলমনা লোকদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। সুতরাং আমল গোপন রাখিয়া উহা হেফাজত করাই সকলের কর্তব্য।

আমল করার পর তাহা প্রকাশ করা

আমল করার পর তাহা মৌখিকভাবে প্রকাশ করা যে, আমি অমুক আমল করিয়াছি– ইহার বিধানও প্রকাশ্যে আমল করার অনুরূপ। এই ক্ষেত্রে বিপদের আশংকাও অধিক। কেননা, মুখে কিছু প্রকাশ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়

না এবং এই বলার ক্ষেত্রে অনেক সময় অতিরঞ্জনও হইয়া থাকে। কিন্তু তবুও এই মৌখিক প্রকাশ যদি রিয়ার কারণে হয়, তবে এই মৌখিক প্রকাশের কারণে বিগত এবাদতসমূহ বরবাদ হইবে না। এই হিসাবে ইহা ইতিপূর্বে বর্ণিত "মূল এবাদত প্রকাশ করা" এর তুলনায় কম বিপদজনক। তো যেই ব্যক্তির অন্তর মজবুত, পরিপূর্ণ এখলাসের অধিকারী এবং মানুষের প্রশংসা ও নিন্দা যার নিকট সমান, সেই ব্যক্তি এমন লোকদের নিকট নিজের আমলের কথা প্রকাশ করিতে পারিবে, যাহাদের পক্ষ হইতে এই আমল অনুসরণের আশা করা যাইতে পারে এবং প্রকৃত অর্থেই যাহারা সৎ কাজের প্রতি উৎসাহী। অর্থাৎ নিয়ত পরিষ্কার ও মন বিপদমুক্ত হইলে এইভাবে নিজের আমল অপরের নিকট প্রকাশ করা জায়েজ ও মোস্তাহাব। আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণও এইভাবে আমল প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

হযরত সায়াদ ইবনে মোয়াজ (রাঃ) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর এমন কোন নামাজ পড়ি নাই, যেই নামাজে কেবল নামাজ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা আমার মনে উদিত হইয়াছে এবং এমন কোন জানাজার পিছনে যাই নাই, যাহাতে মাইয়্যাতের সাওয়াল-জওয়াবের চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয় আমার মনে আসিয়াছে। আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাহাকিছু শুনিয়াছি, উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি কখনো এই বিষয়ে পরওয়া করি নাই যে, আমি গরীব না বিত্তবান। কেননা, এই দুইটি অবস্থার মধ্যে কোন্‌টি আমার জন্য কল্যাণকর তাহা আমার জানা নাই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি সর্বদা বর্তমান অবস্থা হইতে পরবর্তী অবস্থায় উন্নীত হওয়ার বাসনা পোষণ করিয়াছি। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে বাইআত হওয়ার পর আমি কখনো জিনা করি নাই, মিথ্যা কথা বলি নাই এবং ডান হাতে আপন লজ্জাস্থান স্পর্শ করি নাই।

হযরত সুফিয়ান (রাঃ) মৃত্যুর সময় নিজের গৃহবাসীকে বলিলেন, আমার জন্য ক্রন্দন করিও না। কেননা, ইসলাম গ্রহণের পর আমি কোন গোনাহের কর্মে সংশ্লিষ্ট হই নাই। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বলেন, আমার জীবনে কখনো এইরূপ হয় নাই যে, আল্লাহ পাক আমার উপর কোন হুকুম করিয়াছেন আর আমি এইরূপ কামনা করিয়াছি যে, আজ এই হুকুম না হইয়া অন্য কোন হুকুম হইলে ভাল হইত।

মোটকথা, এইসব বিবরণ দ্বারা নিজের উত্তম অবস্থা প্রকাশ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কোন রিয়াকার যদি নিজের এবাদতের কথা প্রকাশ করে, তবে তাহা যঘন্য রিয়ার মধ্যে গণ্য হইবে। আর কোন পরহেজগার-মোত্তাকী ও

অনুসরণীয় ব্যক্তি যদি নিজের এবাদত প্রকাশ করে, তবে তাহা অপরের জন্য উৎসাহের কারণ হইবে।

সারকথা হইল, পরিপূর্ণ এখলাসের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে অপরকে উৎসাহিত করার নিয়তে নিজের এবাদত জাহির করা জায়েজ। তবে এই ক্ষেত্রেও সেইসকল শর্ত প্রযোজ্য হইবে– যাহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমল প্রকাশ করার পথ একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া এই কারণে সঙ্গত নহে যে, অনুকরনপ্রীয়তা হইল মানুষের একটি স্বভাবজাত গুণ এবং মানুষ সাধারণতঃ অপরের দেখাদেখি আমল করিয়া থাকে। এমনকি কোন রিয়াকার যদি নিজের এবাদত প্রকাশ করে আর মানুষ যদি না জানে যে, সে রিয়া করিতেছে, তবে উহা দ্বারাও মানুষ উপকৃত হইবে। অবশ্য রিয়াকার তাহার রিয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বটে। আল্লাহর অনেক নেক বান্দা এমনও আছেন, যাহারা কোন রিয়াকারের আমলের অনুসরণ করিয়া এখলাস ও একীনের উচ্চস্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছেন।

এক সময় এমন ছিল, যখন ফজরের নামাজের পর বসরা শহরের প্রতিটি ঘর হইতে কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ ভাসিয়া আসিত। পরে এক ব্যক্তি রিয়ার অনিষ্টের উপর একটি কিতাব লিখিবার পর সেই আওয়াজ বন্ধ হইয়া যায় এবং মানুষ নীরবে তেলাওয়াত করিতে শুরু করে। অথচ তেলাওয়াতের এই আওয়াজ অপরের জন্য উৎসাহের কারণ ছিল। পরবর্তীতে এই অবস্থার উপর এক ব্যক্তি মন্তব্য করিলেন, রিয়ার অনিষ্ট সম্পর্কে কিতাব না লিখিলেই ভাল হইত। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, কোন রিয়াকার যদি তাহার আমল প্রকাশ করে, তবে উহা দ্বারাও অন্যরা উপকৃত হইতে পারিবে। তবে এই ক্ষেত্রে শর্ত হইল, অপরাপর লোকেরা সেই ব্যক্তির রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ হইতে হইবে। এতদ্ সম্পর্কিত এক হাদীসে আছে–

ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

অর্থঃ "আল্লাহ তায়ালা পাপী লোক দ্বারা দ্বীনের শক্তি যোগাইবেন।"

গোনাহ গোপন করার বৈধতা এবং মানুষকে গোনাহ সম্পর্কে অবহিত করার নিন্দা

এখলাসের মূল কথা হইল, মানুষের ভিতর-বাহিরে এক রকম নিয়ত হওয়া। যেমন একবার হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি প্রকাশ্য আমলকে নিজের জন্য আবশ্যক করিয়া লও। লোকটি আরজ করিল, প্রকাশ্য আমল কি? তিনি বলিলেন, প্রকাশ্য আমল হইল, যেই আমল সম্পর্কে অপর কেহ জানিতে পারিলে আমলকারী লজ্জিত হয় না।

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রহঃ) বলেন, আমার আমল সম্পর্কে অপর কেহ অবগত হইলে এই বিষয়ে আমি কিছুমাত্র পরওয়া করি না। অবশ্য স্ত্রীসহবাস ও মলত্যাগ– কেবল এই দুইটি বিষয় অপর কেহ অবগত হওয়া আমি পছন্দ করি না। চারিত্রিক উৎকর্ষতার ইহা এমন এক স্তর যে, সকলের পক্ষে এই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব হয় না।

মানুষের স্বভাবই হইল এইরূপ যে, সে অন্তর ও অঙ্গ-অবয়ব দ্বারা গোনাহ করিয়া তাহা গোপন রাখে। কেননা, তাহার পাপাচার সম্পর্কে অপর কেহ অবগত হউক, ইহা তাহার কাম্য নহে। অথচ আল্লাহ পাক মানুষের সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। নিজের দোষ অপরের দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখা ইহাও রিয়ার মধ্যে গণ্য। অবশ্য ইহা প্রকৃত রিয়া নহে। এখানে রিয়া হইল– নিজেকে পরহেজগার ও মোত্তাকী হিসাবে জাহির করার উদ্দেশ্যে নিজের গোনাহসমূহ গোপন করিয়া রাখা। অর্থাৎ এখানে সে নিজের দোষ-ক্রুটি গোপন রাখিয়া নিজেকে যেইরূপ বুজুর্গ হিসাবে জাহির করিতেছে, প্রকৃতপক্ষে সে ঐরূপ বুজুর্গ নহে। যেই ব্যক্তি সৎ এবং রিয়াকার নহে, সেই ব্যক্তির পক্ষেও নিজের গোনাহ গোপন রাখা উচিৎ। নিজের গোনাহ গোপন করা এবং এই গোনাহ সম্পর্কে মানুষের অবগতির ফলে দুঃখিত ও পেরেশান হওয়া আট কারণে সঠিক হইতে পারে।

প্রথম কারণ

প্রথম কারণ হইল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই কারণে খুশী ছিল যে, আল্লাহ পাক তাহার অপরাধসমূহ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যখনই তাহার সেই অপরাধসমূহ প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন সে দুঃখিত ও পেরেশান হইল যে, আল্লাহ পাক তাহার গোপন অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এখন তাহার ভয় হইতেছে যে, রোজ কেয়ামতেও তাহাকে এইভাবে অপমানিত হইতে হয় কি-না। যেমন এক হাদীসে আছে–

ما ستر الله على عبد ذنبا في الدنيا الا ستره عليه في الاخرة

অর্থঃ "দুনিয়াতে আল্লাহ যেই গোনাহ গোপন রাখেন আখেরাতেও সেই গোনাহ গোপন রাখিবেন।" (মুসলিম শরীফ)

এই পেরেশানীও ঈমানী শক্তি হইতেই উৎসারিত। যেই ব্যক্তির ঈমান দুর্বল, এইসব কারণে তাহার মন পেরেশান হইবে না।

দ্বিতীয় কারণ

দ্বিতীয় কারণ হইল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইহা জানে যে, আল্লাহ পাক গোনাহ প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। বরং গোনাহ গোপন রাখাই তিনি পছন্দ করেন।

অর্থাৎ এই ব্যক্তি যদিও আল্লাহর নাফরমানী করিয়াছে, কিন্তু অন্তর দ্বারা এমন বিষয়কেই পছন্দ করে– যাহা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন। ইহাও ঈমানী শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। এই ব্যক্তি ইহা কামনা করে না যে, তাহার গোনাহ প্রকাশ হউক। কেননা, আল্লাহ পাক গোনাহ প্রকাশ করা পছন্দ করেন না।

তৃতীয় কারণ

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মানুষের নিন্দার কারণে দুঃখিত হয়। কেননা, তাহার পাপাচার দেখিয়া লোকেরা তাহাকে মন্দ বলে এবং তাহাদের এই নিন্দাবাদ মন ও বিবেককে আল্লাহর আনুগত্য হইতে ফিরাইয়া রাখে। অর্থাৎ মানুষের নিন্দার কারণে মনে কষ্ট অনুভব হয় এবং এই কষ্টের কারণেই সে বিবেকের সঙ্গে বিবাদ করিয়া উহাকে আল্লাহর আনুগত্য করিতে দেয় না। তবে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে এই ব্যক্তির সততা ও সুস্থ বিবেচনার পরিচয় হইল– মানুষের নিন্দার কারণে যেমন সে কষ্ট অনুভব করে, তদ্রূপ মানুষের প্রশংসার কারণেও কষ্ট অনুভব করা উচিৎ– যাহা আল্লাহর স্মরণ হইতে মানুষের অন্তরকে গাফেল করিয়া দেয়। কেননা, এখানে মানুষের নিন্দার কারণে যেই অবস্থাটি সৃষ্টি হয়, উহা মানুষের প্রশংসার মধ্যেও বিদ্যমান। তো মানুষের আত্মার এই অবস্থাটি ঈমানী শক্তি হইতেই উৎসারিত।

চতুর্থ কারণ

চতুর্থ কারণ হইল, মানুষ এই কারণে গোনাহ গোপন করিতে চাহে যে, মানুষের নিন্দা তাহার নিকট ভাল লাগে না। কেননা, উহার কারণে মনে এমন কষ্ট অনুভব হয়– যেমন প্রহার করিলে দেহে কষ্ট অনুভব হয়। নিন্দার কারণে মনে কষ্ট অনুভব হওয়ার আশংকা করা নিষিদ্ধ নহে এবং এই আশংকার কারণে মানুষ গোনাহগার হইবে না। অবশ্য নিন্দার আশংকার কারণে যদি কোন নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হয়, তবে অবশ্য গোনাহগার হইবে। মোটকথা, মানুষের উপর ইহা ওয়াজিব নহে যে, অপর কাহারো নিন্দার কারণে দুঃখিত ও মর্মাহত হওয়া যাইবে না। তবে এই ক্ষেত্রে মানুষের মমতা ও আন্তরিকতার পরিচয় হইল, মানুষের নিকট প্রশংসনীয় হওয়ার বাসনা বর্জন করা এবং প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী এই উভয় ব্যক্তিকেই এক রকম মনে করা। কেননা, তাহার তো এই কথা জানা আছে যে, একমাত্র আল্লাহ পাকই মানুষের লাভ-লোকসানের মালিক এবং এই ক্ষেত্রে মানুষের কোন হাত নাই। অবশ্য এইরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ মানুষই লোক নিন্দার কারণে মনে কষ্ট অনুভব করে। কেননা, মানুষের নিন্দার কারণেই সে নিজের ক্রুটি বিষয়ে জ্ঞাত হয়।

অবশ্য আমরা বলিব, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের নিন্দার কারণে দুঃখিত হওয়া উত্তম বটে। বিশেষতঃ এই নিন্দা যখন কোন দ্বীনদার-পরহেজগার ও মোখলেস

ব্যক্তির পক্ষ হইতে হয়। কেননা, নেককার বান্দাগণ আল্লাহর সাক্ষী হইয়া থাকেন এবং তাহাদের নিন্দার কারণে ইহা জানা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর নিকটও নিন্দনীয়। এই কারণেই আল্লাহর ওলীদের নিন্দার কারণে দুঃখিত হওয়া চাই। অবশ্য এমন দুঃখকে নিন্দনীয় বলা হইবে, যেই দুঃখ এই কারণে অনুভূত হয় যে, "অমুক ব্যক্তি আমার তাকওয়া ও পরহেজগারীর প্রশংসা করে নাই।" কেননা, ধর্মীয় আনুগত্য ও এবাদতের উপর প্রশংসা কামনা করা, যেন আল্লাহর এবাদত করিয়া গায়রুল্লাহর নিকট বিনিময় প্রার্থনা করারই নামান্তর। কাহারো অন্তরে যদি এই ধরনের বিপদ উপস্থিত হয়, তবে উহাকে ক্ষতিকর মনে করিতে হইবে।

অবশ্য গোনাহের কারণে মানুষের নিন্দাকে খারাপ মনে করা ইহা মানুষের স্বভাবজাত অবস্থা। ইহাকে নিন্দনীয় বলা যাইবে না। কারণ, মানুষের নিন্দার ভয়ে গোনাহ গোপন করা জায়েজ। তবে মানুষের পক্ষে ইহা সম্ভব যে, সে মানুষের প্রশংসার প্রত্যাশী হয় না বটে কিন্তু মানুষের নিন্দাকে খারাপ মনে করে। কিংবা এইরূপ কামনা করা যে, মানুষ যেন আমার প্রশংসাও না করে এবং নিন্দাও না করে। মানুষের প্রশংসা না পাইয়া ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তি নিন্দার কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করিতে পারে না। কেননা, মানুষ এক প্রকার সুখ লাভের জন্যই প্রশংসা কামনা করে। কিন্তু এইসুখ হাসিল না হইলে কষ্ট অনুভব হয় না। কিন্তু নিন্দার কারণে কষ্ট অনুভব হয়। যেই ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করিয়া মানুষের প্রশংসা কামনা করে সেই ব্যক্তি উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই আনুগত্যের বিনিময় প্রাপ্ত হয় বটে। কিন্তু গোনাহের কারণে নিন্দাকে খারাপ মনে করার ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা বিদ্যমান নহে। সেই ক্ষেত্রে কেবল এই আশংকা থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের গোনাহ সম্পর্কে মানুষের অবগতির আশংকার কারণে আল্লাহর অবগতি বিষয়ে গাফেল হইয়া যায় কি-না। যদি এইরূপ হয়, তবে ইহা মানুষের জন্য যারপর নাই ক্ষতিকারক। সুতরাং মানুষের কর্তব্য- নিজের গোনাহ সম্পর্কে মাখলুকের অবগতি অপেক্ষা আল্লাহর অবগতিতে অধিক পেরেশান হওয়া।

পঞ্চম কারণ

মানুষের নিন্দাকে এই কারণে খারাপ মনে করা যে, নিন্দাকারী আল্লাহর নাফরমানী করিতেছে। অর্থাৎ এই অনুভূতির উৎসমূলও সেই ঈমানী শক্তি। এই ঈমানী চেতনার আলামত হইল- নিজের নিন্দাকে যেমন খারাপ মনে করা হয়, তদ্রূপ অপর মানুষের নিন্দাকেও খারাপ মনে করা। কেননা, এই উভয় ক্ষেত্রের মূল কারণ অভিন্ন। সুতরাং নিজের নিন্দার কারণে যেই পরিমাণ কষ্ট অনুভব হয়, অপরের নিন্দার কারণেও সেই পরিমাণই কষ্ট অনুভব হওয়া চাই।

ষষ্ঠ কারণ

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই কারণে নিজের গোনাহ গোপন করে যে, এই গোনাহের কারণে যেন অপর কেহ তাহার সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে। ইহা নিন্দার কষ্ট হইতে পৃথক ও ভিন্ন একটি অনুভূতি। নিন্দার কষ্ট এই কারণে অনুভূত হয় যে, সে মনে করে, এই নিন্দার ফলে লোকেরা তাহার ত্রুটি সম্পর্কে জ্ঞাত হয়- যদিও নিন্দাকারীর অনিষ্ট হইতে সে নিরাপদ থাকে। অনেক সময় এইরূপও হয় যে, কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক যদি তাহার অপরাধ ও ত্রুটি সম্পর্কে জানিতে পারে, তবে সে মৌখিক নিন্দার পাশাপাশি অন্য কোন দুর্ব্যবহারও করিতে পারে। এইরূপ অনিষ্টের ভয়ে নিজের গোনাহ গোপন করা জায়েয।

সপ্তম কারণ

সপ্তম কারণ হইল, লজ্জার কারণে নিজের গোনাহ গোপন করা। লজ্জা মানুষের একটি উত্তম স্বভাব বটে। শৈশব অতিক্রম করিয়া মানুষ যখন বুদ্ধি-বিবেচনার জগতে পা রাখে, তখনই মানুষের অন্তরে এই লজ্জা পয়দা হয়। অন্তরে এই লজ্জা পয়দা হওয়ার পর তাহার কোন আয়েব ও দোষ-ত্রুটি অপর কেহ জানিতে পারিলে সে লজ্জা অনুভব করে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন-

الحياء خير كله অর্থাৎ- "লজ্জার পরিপূর্ণটাই মঙ্গল। (মুসলিম শরীফ)

অন্য হাদীছে আছে-

الحياء شعبة من الايمان অর্থঃ "লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।" (বোখারী, মুসলিম)

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন-

ان الله يحب الحي الحليم

অর্থঃ "আল্লাহ তায়ালা লজ্জাশীল ও সহনশীল ব্যক্তিকে পছন্দ করেন।" (তাবরানী)

বোখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে-

الحياء لا يأتى الا بخير অর্থঃ "লজ্জার পরিণাম শুধুই কল্যাণ।"

যেই ব্যক্তি অপরাধকর্মে লিপ্ত, আর এই বিষয়ে সে বিন্দু মাত্র পরওয়া করে না যে, মানুষ তাহার অপরাধ সম্পর্কে অবগত; তবে সে যেন গোনাহের কাজের পাশাপাশি নির্লজ্জতারও শিকার হইয়াছে। এই ব্যক্তি এমন মানুষের তুলনায় নিকৃষ্ট, যে নিজের অপরাধ গোপন রাখে এবং মানুষকে লজ্জা পায়।

এই ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল- লজ্জা রিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ

সাদৃশ্যপূর্ণ। খুব কম মানুষই এই দুইটি বিষয়কে পৃথক করিতে পারে। অধিকাংশ মানুষই মনে করে বাস্তবিক পক্ষেই আমি লজ্জাশীল এবং এই লজ্জাশীলতার কারণেই আমি উত্তম রূপে এবাদত করি। অথচ তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। লজ্জাশীলতা এমন এক উত্তম স্বভাব যাহা শরীফ ও সম্ভ্রান্ত লোকদের অন্তরে পয়দা হয়। এই লজ্জাশীলতার পরই অন্তরে রিয়া ও এখলাসের উপকরণসমূহের আগমন ঘটে। সুতরাং এমনও সম্ভব যে, মানুষ লজ্জাশীলতার কারণে রিয়াকার হইয়া যাইবে এবং ইহাও সম্ভব যে, এই লজ্জার কারণেই সে এখলাসের অধিকারী হইবে।

উপরোক্ত অবস্থাটির উদাহরণ যেন এইরূপ– মনে কর, এক ব্যক্তি তাহার কোন বন্ধুর নিকট কিছু অর্থ করজ চাহিল। বন্ধুর ইচ্ছা নহে তাহাকে করজ দেওয়া। কিন্তু সে তাহাকে সরাসরি নিষেধ করিতে লজ্জা পাইতেছে। সে ইহাও জানে যে, বন্ধুটি যদি না আসিয়া অন্য কাহারো মাধ্যমে করজ চাহিয়া পাঠাইত, তবে সরাসরি তাহাকে নিষেধ করিয়া দিত। অর্থাৎ লোক দেখানো রিয়া কিংবা ছাওয়াবের আশায় তাহাকে করজ দিত না। এমতাবস্থায় এই করজদাতাকে কয়েকটি অবস্থায় বিবেচনা করা হইবে–

(এক) করজ দিতে পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করিয়া দেওয়া এবং লজ্জা-শরমের কোন পরওয়া না করা। অর্থাৎ যেই ব্যক্তির লজ্জা-শরম কম, সেই ব্যক্তিই এইভাবে সরাসরি অস্বীকার করিয়া দিতে পারিবে। কেননা, একজন লজ্জাশীল ব্যক্তি হয় তাহাকে করজ দিয়া দিবে কিংবা করজ না দেওয়ার কারণ হিসাবে কোন ওজর পেশ করিবে যে, অমুক অসুবিধার কারণে করজ দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। পক্ষান্তরে এই ব্যক্তি যদি করজ দিয়া দেয়, তবে মনে করিতে হইবে– তাহার লজ্জার সঙ্গে রিয়ার সংমিশ্রণ আছে। অর্থাৎ লজ্জার কারণেই তাহার রিয়া ক্রিয়াশীল হইয়াছে এবং মনে এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে যে, করজপ্রার্থী বন্ধুটিকে ফেরৎ দেওয়া ঠিক হইবে না। বরং তাহাকে করজ দিয়া দেওয়াই উচিৎ যেন তাহার প্রশংসা করে এবং তাহাকে একজন উদার ব্যক্তি বলিয়া তাহার সুখ্যাতি করে। কিংবা তাহাকে এই কারণে করজ দিয়া দেওয়া উচিৎ যেন সে তাহার নিন্দা করার সুযোগ না পায় এবং তাহাকে 'কৃপণ' আখ্যা দিয়া তাহার দুর্ণাম করিতে না পারে। অর্থাৎ এই অবস্থায় যদি সে বন্ধুকে করজ দেয়, তবে তাহার এই আমলটি রিয়ার সহিতই যুক্ত হইবে।

(দুই) দ্বিতীয় অবস্থা হইল– লজ্জার কারণে করজ দিতে অস্বীকারও করিতে পারিতেছে না, আবার কৃপণতার কারণে করজ দিতেও মন আগাইতেছে না। এই দ্বৈত অবস্থার টানাপোড়নের এক পর্যায়ে তাহার অন্তরে এখলাসের দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং মনে এই ধারণা সৃষ্টি হইল যে, দান করার ছাওয়াব এক গুণ

এবং করজ দেওয়ার ছাওয়াব আঠার গুণ। অর্থাৎ করজ দেওয়ার ছাওয়াবও বেশী এবং ইহাতে বন্ধুর মনও রক্ষা হইবে। বন্ধুর মন রক্ষা করা ইহা আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দনীয় আমল। মোটকথা, অন্তরে এখলাস ক্রিয়াশীল হওয়ার পর সে করজ দিতে উদ্বুদ্ধ হইল।

(তিন) তৃতীয় অবস্থা হইল– এই ক্ষেত্রে তাহার ছাওয়াব পাওয়ারও কোন আশা নাই এবং নিন্দারও ভয় নাই। এমনকি প্রশংসা প্রাপ্তিরও কোন খাহেশ নাই। বন্ধুর পরিবর্তে যদি তাহার কোন প্রতিনিধি করজ চাহিতে আসিত, তবে কস্মিনকালেও সে তাহাকে করজ দিত না। এমতাবস্থা নিছক লজ্জার কারণেই সে করজ দিতেছে। যদি কোন অপরিচিত ও সাধারণ মানুষ তাহার নিকট করজ চাহিত, তবে স্পষ্ট অস্বীকার করিয়া দিত– যদিও এই করজ দেওয়ার কারণে তাহার প্রচুর ছাওয়াব হইত কিংবা দেশময় তাহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই ক্ষেত্রে করজ দেওয়ার পিছনে তাহার লজ্জাশীলতাই কাজ করিয়াছে। লজ্জার এই অবস্থাটি কেবল মন্দ কর্মের ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়। যেমন– কৃপণতা বা অন্য কোন পাপকর্ম। কিন্তু একজন রিয়াকার মোবাহ ও বৈধ কর্মের ক্ষেত্রেও লজ্জা পায়। সুতরাং সে যখন কোন কারণে দৌড়াইতে থাকে, তখন কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলামাত্র সে গতি শ্লথ করিয়া স্বাভাবিকভাবে হাঁটিতে থাকে। কিংবা হাস্য করার সময় কেহ দেখিয়া ফেলিলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ করিয়া ফেলে। আর তাহার ধারণায় লজ্জার কারণেই সে এইরূপ করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ইহা লজ্জা নহে, ইহা বরং সুস্পষ্টভাবেই রিয়া।

এখানে স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল– সকল ক্ষেত্রেই কিন্তু লজ্জা ভাল নহে। ধর্ম-কর্মে লজ্জা করা নিন্দনীয়। যেমন– মানুষকে নসীহত করিতে লজ্জা করা কিংবা নামাজের ইমামতি করিতে লজ্জা করা ইত্যাদি। এই জাতীয় লজ্জা নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে শোভনীয় বটে। জ্ঞানবান লোকদের ক্ষেত্রে এইরূপ লজ্জা পছন্দনীয় নহে। অনেক সময় হয়ত কোন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে গোনাহ করিতে দেখিয়াও কেবল তাহার বার্ধক্যের কারণেই কিছু বলা হয় না। এইরূপ লজ্জা ভাল। কেননা, কোন বৃদ্ধ মুসলমানকে তাজীম করা আল্লাহকে তাজীম করার মতই। কিন্তু এতদঅপেক্ষা উত্তম হইল আল্লাহকে লজ্জা করা। মানুষকে লজ্জা করিয়া সৎ কাজের আদেশের ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হওয়া ঠিক নহে। যাহারা ক্ষমতাবান, তাহাদের পক্ষে মানুষকে লজ্জা না করিয়া আল্লাহকে লজ্জা করাই উত্তম। অবশ্য যাহারা দুর্বল তাহাদের কথা ভিন্ন।

অষ্টম কারণ

অষ্টম কারণ হইল, নিজের গোনাহ প্রকাশ হইয়া পড়ার ক্ষেত্রে এই কারণে শঙ্কিত হওয়া যে, তাহার দেখাদেখি অপরাপর লোকেরাও গোনাহ করিতে শুরু

করিবে। ইহা সেই 'কারণ' যেই কারণের ভিত্তিতে এবাদত জাহির করা বৈধ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এবাদত জাহির করা এই কারণে বৈধ করা হয় যে, উহা দেখিয়া যেন অপরাপর লোকেরাও উৎসাহিত হইয়া এবাদত করিতে শুরু করে। অবশ্য ইহা সকলের কাজ নহে। ইহা কেবল শরীয়তের ইমাম ও নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের কাজ। এই কারণের ভিত্তিতেই নিজের অপরাধ পরিবার-পরিজনের নিকট হইতে গোপন করা জায়েয। কেননা, পরিবারের লোকেরা তাহার অনুকরণ করিবে।

উপরে গোনাহ গোপন করার আটটি কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অষ্টম কারণটি ব্যতীত অন্য কোন কারণেই আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদত প্রকাশ করা যাইবে না। কোন ব্যক্তি যদি নিজের পাপাচার গোপন করিয়া নিজেকে বুজুর্গ হিসাবে জাহির করার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে রিয়াকার বলা হইবে। যদি বলা হয় যে, মানুষ নিজের তাকওয়া-পরহেজগারী ও যোগ্যতার অনুপাতে মানুষের প্রশংসা কামনা করা এবং মানুষও সেই অনুপাতেই তাহার প্রশংসা করা জায়েজ হওয়া উচিৎ। যেমন এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল–

دلنى على ما يحبني الله عليه و يحبنى الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله و انبذ اليهم هذا الحطام يحبوك

অর্থঃ আমাকে এমন একটি আমল বলিয়া দিন, সেই আমলের কারণে যেন আল্লাহ আমাকে মোহাব্বত করেন এবং মানুষও আমাকে মোহাব্বত করে। তিনি এরশাদ করিলেনঃ তুমি দুনিয়াতে যুহদ (বা সংসারের প্রতি উদাসীনতা) অবলম্বন কর, আল্লাহ তোমাকে মোহাব্বত করিবেন। আর দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ মানুষের দিকে নিক্ষেপ কর, ফলে লোকেরা তোমাকে মোহাব্বত করিবে।

(ইবনে মাজা)

উপরোক্ত বক্তব্যের জবাবে আমরা বলিব, এইভাবে মানুষের প্রশংসা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করা বৈধ, পছন্দনীয় কিংবা নিন্দণীয়ও হইতে পারে। পছন্দনীয় হওয়ার ছুরত হইল– তুমি যদি মানুষের মোহাব্বতকে আল্লাহরই মোহাব্বত মনে করিয়া এইরূপ চিন্তা কর যে, আল্লাহ পাক যখন তাহার কোন বান্দাকে মোহাব্বত করেন, তখন মানুষের অন্তরেও তাহার প্রতি মোহাব্বত পয়দা করিয়া দেন। পক্ষান্তরে তুমি যদি নিজের হজ্ব, জেহাদ কিংবা কোন নামাজের কারণে মানুষের প্রশংসা প্রত্যাশা কর, তবে তোমার এই প্রত্যাশা হইবে নিন্দনীয়। কেননা, এখানে আল্লাহর এবাদতের বিনিময়ে ছাওয়াবের পরিবর্তে মানুষের নিকট উহার বিনিময় প্রার্থনা করা হইতেছে। অনুরূপভাবে মোবাহ ছুরত হইল–

নিজের কোন উত্তম গুণ কিংবা নির্দিষ্ট কোন এবাদতের কারণ ছাড়াই মানুষের মোহাব্বতের প্রত্যাশী হওয়া।

রিয়ার ভয়ে এবাদত বর্জন করা

এক শ্রেণীর মানুষ রিয়াকার হইয়া যাওয়ার ভয়ে আমলই বর্জন করিয়া বসে। এইভাবে আমল বর্জন করা ঠিক নহে এবং ইহা প্রকারন্তরে শয়তানের সহযোগিতাই বটে। কোন বিপদাশংকার কারণে আমল ত্যাগ করা যাইবে কি-না, ইহা একটি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ বিষয়। নিম্নে আমরা এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করিব।

আমল দুই প্রকার

প্রথমতঃ এমন আমল যেই আমলের মধ্যে কোন আনন্দ নাই। যেমন– নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জেহাদ ইত্যাদি। এইসব আমলের মধ্যে কেবল মোজাহাদা-মোশাক্কাত ও শ্রম-সাধনাই বিদ্যমান। এই সব আমল উপস্থিত ক্ষেত্রে আনন্দদায়ক না হইলেও এই হিসাবে আনন্দদায়ক বলা যাইতে পারে যে, ইহা মানুষের প্রশংসা অর্জনের উপকরণ। মানুষের প্রশংসা দ্বারা আনন্দ অর্জিত হওয়া সুস্পষ্ট। আর মানুষ সংশ্লিষ্ট আমল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরই আমলকারীর প্রশংসা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এমনসব আমল যেইগুলি স্বয়ং আনন্দদায়ক। এই সব আমল দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, বরং সাধারণ মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট। যেমন– খলিফা, বিচারপতি ও শাসক নিযুক্ত হওয়া বা নামাজের ইমাম, উপদেষ্টা ও শিক্ষক হওয়া ইত্যাদি। এই সকল বিষয় যেহেতু সাধারণ মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট, সুতরাং উহার বিপদাশংকাও যেমন বেশী, তদ্রূপ এইগুলিতে আনন্দের উপকরণও বেশী।

দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট এবাদত

এমনসব এবাদত যেইগুলি সরাসরি দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং দেহ ব্যতীত অন্য কিছুর সহিত যেইগুলির কোন সম্পর্ক নাই এবং উপস্থিত উহাতে কোন আনন্দও নাই। যেমন– রোজা, নামাজ, জেহাদ ইত্যাদি। এই সকল এবাদতের মধ্যে তিন অবস্থায় রিয়া আসিয়া যুক্ত হয়।

প্রথম অবস্থা

আমলের পূর্বেই রিয়া আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই আমল শুরু করা হয়। এইরূপ আমলের পিছনে যেহেতু কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য নাই, সুতরাং এই আমল পরিত্যাগ করা উচিৎ। কেননা, ইহাতে কোন এবাদত নাই এবং ইহা পরিষ্কার গোনাহ। ইহা বরং এবাদতের নামে মর্যাদা

লাভের অপচেষ্টামাত্র। এখন কোন ব্যক্তি যদি অন্তর হইতে এই রিয়া দূর করিতে পারে এবং অন্তরকে এই কথা বুঝাইতে পারে যে, মানুষের জন্য আমল না করিয়া বরং আল্লাহর জন্য আমল করা উচিৎ; অতঃপর যদি তাহার অন্তর খালেছ আল্লাহর জন্য এবাদত করিতে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে আমল করাতে কোন ক্ষতি নাই।

দ্বিতীয় অবস্থা

প্রথমতঃ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই আমল করার নিয়ত ছিল, কিন্তু আমল শুরু করার পর কিংবা সূচনাতেই রিয়া আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় আমল বর্জন করা উচিৎ নহে। কেননা, এই আমলের ভিত্তিমূলে ধর্মীয় উদ্দেশ্য বিদ্যমান। পরে যেই রিয়া আসিয়া যুক্ত হইয়াছে উহা দূর করার জন্য চেষ্টা-তদ্বির করিতে হইবে।

তৃতীয় অবস্থা

প্রথমতঃ এখলাসের সাথেই আমল শুরু করা হইয়াছিল। কিন্তু আমলের মাঝামাঝি আসিয়া রিয়া যোগ হইয়াছে। এই অবস্থায়ও রিয়া দূর করার জন্য চেষ্টা চালাইতে হইবে এবং আমল বর্জন করা যাইবে না। কেননা, শয়তান প্রথমেই মানুষকে আমল ত্যাগ করাইতে চাহে। কিন্তু মানুষ যদি শয়তানের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করিয়া আমলে জমিয়া থাকে, তবে এই পর্যায়ে শয়তান তাহাকে রিয়ার দিকে আহ্বান করে। এই আহ্বানও উপেক্ষা করিলে শয়তান তাহাকে বলে, হে আদম সন্তান! তোমার আমলে কোন এখলাস নাই, তুমি রিয়াকার। সুতরাং তোমার এই এবাদতের সমুদয় আয়োজন-উদ্যোগ কেবল পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নহে। অর্থাৎ এইভাবেই শয়তান মানুষকে আমল বর্জনের কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।

রিয়ার ভয়ে আমল বর্জনকারীর উদাহরণ

যেই ব্যক্তি রিয়ার ভয়ে আমল বর্জন করে, তাহার উদাহরণ যেন এইরূপ– মনে কর, কোন মনিব তাহার গোলামকে কিছু গম দিয়া বলিল, এইগুলি ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া আন। গোলাম মনে করিল, আমার পক্ষে যেহেতু এইগুলি পরিষ্কার করা সম্ভব নহে, সুতরাং আমি ইহা ধরিয়াও দেখিব না। তো ঐ ব্যক্তির অবস্থাও এই গোলামের মত– এখলাস না থাকার কারণে যে আমলই বর্জন করিয়া বসে। ঐ ব্যক্তিও এই শ্রেণীভুক্ত, যেই ব্যক্তি নিছক এই আশংকার কারণে আমল বর্জন করে যে, লোকেরা আমাকে রিয়াকার বলিবে এবং আমিও এইরূপ আমল করিয়া রিয়াকার হইব। এই সবই হইল শয়তানের প্রতারণা।

উপরোক্ত প্রসঙ্গে প্রথম কথা হইল, কোন মুসলমান সম্পর্কে অকারণে

এইরূপ কুধারণা করা ঠিক নহে যে, সে কোন মোখলেস ব্যক্তিকে রিয়াকার বলিবে। যদি কেহ এইরূপ বলেও, তবে তাহাকে বলিতে দাও। তাহার এইরূপ বলার কারণে তোমার আমল ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। সুতরাং কি কারণে তুমি নিজের আমল বন্ধ করিয়া ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে? তদুপরি এই কারণে আমল ত্যাগ করা যে, "মানুষ আমাকে রিয়াকার বলিবে"– ইহাই বরং সুস্পষ্ট রিয়া। তোমার মধ্যে যদি মানুষের প্রশংসার খাহেশ ও নিন্দার ভয় না থাকিবে, তবে তো কস্মিনকালেও তুমি তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিবে না– চাই তাহারা তোমাকে রিয়াকার বলুক বা মোখলেস বলুক। "মানুষ রিয়াকার বলিবে" এই আশংকায় আমল বর্জন করা গুরুতর অপরাধ। অর্থাৎ এই সবই হইল শয়তানের প্রতারণা। সাধারণতঃ জাহেল আবেদগণই এইরূপ প্রতারণার শিকার হইয়া থাকে।

আমল ত্যাগ করা শয়তান হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় নহে

আমল ত্যাগ করিলেই কি ইহা প্রমাণ হইবে যে, তুমি শয়তানের প্রতারণা হইতে রক্ষা পাইয়াছ? শয়তান তো এই অবস্থায়ও তোমাকে ত্যাগ করিবে না। বরং এই সময় সে তোমাকে বলিবে, তুমি আমল ত্যাগ করিয়াছ অকপট ও মোখলেস আখ্যা পাওয়ার জন্য। এইভাবে সে কুমন্ত্রণা দিতে দিতে এক সময় হয়ত তোমাকে লোকালয় ত্যাগ করাইয়া কোন বনে-জঙ্গলে নিয়া ছাড়িবে। এখানেই শেষ নহে। এই পর্যায়ে শয়তান তোমাকে পরামর্শ দিয়া বলিবে, আসলে মারেফাত হাসিল করার মধ্যেই মূল আনন্দ। তুমি যদি বিরান ভূমিতে পড়িয়া থাক, আর মানুষ তোমার কঠিন সাধনা ও কামিয়াবীর কথা যদি জানিতে না পারে, তবে তোমার কি লাভ হইবে? সুতরাং কোন উপায়ে মানুষের নিকট তোমার সম্পর্কে এই সংবাদ প্রচার হওয়া আবশ্যক যে, অমুক ব্যক্তি মানুষের ভয়ে লোকালয় ত্যাগ করিয়া বিরান ভূমিতে গিয়া সাধনায় ব্রতী হইয়াছে। এখন বল, শয়তানের আক্রমণ হইতে তুমি কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে? সুতরাং মুক্তির একমাত্র উপায় হইল, রিয়া সম্পর্কে তোমার সুস্পষ্ট ধারণা থাকিতে হইবে যে, রিয়া দ্বারা দুনিয়াতে কোন ফায়দা হয় না এবং পরকালের জন্যও উহা ক্ষতিকর। অর্থাৎ শয়তানের প্রতারণা ও রিয়ার অনিষ্ট সম্পর্কে যদি এইভাবে নিজের মনকে বুঝাইতে পার, তবে অন্তর হইতে রিয়া দূর হইয়া তদস্থলে এখলাস পয়দা না হওয়ার কোন কারণ নাই। তোমার কাজ হইল, পাবন্দির সহিত নিজের আমলে জমিয়া থাকা এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসার কোন পরওয়া না করা। শয়তান তোমার পিছনে লাগিয়া থাকিলেও কোন ভ্রূক্ষেপ করিবে না। কেননা, শয়তানের ওয়াসওয়াসা তো কোন

দিনই বন্ধ হইবে না। এই ওয়াসওয়াসার কারণেই যদি আমল বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তবে তো আমলের সেলসেলা একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে।

শয়তান যদি তোমার অন্তরে এইরূপ ওয়াসওয়াসা পয়দা করে যে, "তুমি রিয়াকার" তবে মনে করিবে, ইহা শয়তানের প্রতারণা। অর্থাৎ এই সময় যদি তোমার অন্তরে রিয়ার অনিষ্ট এবং উহা অস্বীকার করার শক্তি বিদ্যমান থাকে, তবে ইহা শয়তানের উক্তি মিথ্যা হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে তোমার অন্তরে যদি রিয়ার অনিষ্ট এবং আল্লাহর ভয় মওজুদ না থাকে, কিংবা তোমার আমলের প্রেরণাদাতা যদি দ্বীন না হয়, তবে এমতাবস্থায় তোমার পক্ষে আমল বর্জন করা কর্তব্য। তবে এমন ঘটনা খুব কমই হইয়া থাকে। কেননা, যেই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য আমল শুরু করে, তাহার অন্তরে ছাওয়াবের নিয়ত অবশ্যই থাকিবে।

বুজুর্গানে দ্বীন কর্তৃক আমল বর্জনের ঘটনা

কেহ হয়ত বলিতে পারে, আমাদের বুজুর্গানে দ্বীন খ্যাতির ভয়ে আমল বর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। যেমন– একবার হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি সাক্ষাত করিতে আসিলে তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করিয়া দেন। এই ঘটনার কারণ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, আগন্তুক যেন জানিতে না পারে যে আমি সর্বদা তেলাওয়াতে মশগুল থাকি।

হযরত ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, যখন তোমার নিকট কথা বলিতে ভাল লাগিবে, তখন চুপ করিয়া থাকিবে। আর চুপ থাকিতে ভাল লাগিলে কথা বলিতে শুরু করিবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, কোন কোন বুজুর্গ পথের উপর কষ্টদায়ক বস্তু পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াও খ্যাতির ভয়ে তাহা সরাইয়া দিতেন না। আবার কাহারো অবস্থা ছিল এইরূপ– আবেগে কান্না আসিয়া পড়িলে কেবল খ্যাতির ভয়েই হাস্য করিতেন। এই জাতীয় আরো বহু ঘটনা উল্লেখ আছে। সুতরাং এইসব ঘটনা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কেমন করিয়া আমল প্রকাশ করাকে উত্তম বলা যাইবে?

এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, আমল বর্জন করা সংক্রান্ত উপরোক্ত কয়েকটি ঘটনা– আমল প্রকাশ না করার জন্য দলীল হইতে পারে না। তা ছাড়া আমল প্রকাশ করারও অসংখ্য ঘটনা মাওজুদ আছে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর উক্তি হইতে জানা যায় যে, হাসা ও পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু সরাইয়া দেওয়ার মধ্যে খ্যাতির আশংকা বিদ্যমান। অথচ এই উক্তির পরও হযরত হাসান কিন্তু নিজে ঐ দুইটি আমল বর্জন করেন নাই।

মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট এবাদত

যেই সকল এবাদত মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট সেইগুলিতে বিপদাশংকাও বেশী। তবে এইগুলির কোন কোনটিতে বিপদের মাত্রা বেশী আবার কোনটিতে উহার মাত্রা কম। সর্বাধিক বিপদ হইল খেলাফতের মধ্যে। অতঃপর যথাক্রমে শাসক, ইমামতি, বিচারপতি, শিক্ষকতা ও ফতোয়া দানের মধ্যে। খেলাফতের অর্থ হইতেছে মুসলমানদের নেতা হওয়া। এই খেলাফত যদি ইনসাফ, এখলাস এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তবে উহা উত্তম আমল। হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

عبادة اليوم من امام عادل خير من عبادة الرجل وحده ستين عاما

অর্থঃ "ন্যায়পরায়ন খলীফার এক দিন, এক ব্যক্তির একাকী ষাট বৎসর এবাদতের সমান।" (তাবরানী, বায়হাকী)

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, এতদ্ অপেক্ষা বড় এবাদত আর কি হইতে পারে যে, একজন ন্যায়পরায়ন বাদশাহর এক দিনের এবাদত ষাট বৎসর এবাদতের সমান। অপর এক হাদীসে আছে–

اول من يدخل الجنة ثلاثة الامام المقسط احدهم

অর্থঃ "সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে। ইনসাফকার খলীফা তাহাদের একজন।" (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل احدهم

অর্থঃ "তিন ব্যক্তির দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় না। ন্যায়পরায়ন খলীফা তাহাদের একজন।" নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করিয়াছেন–

اقرب الناس منى مجلسا يوم القيامة امام عادل

অর্থঃ "রোজ কেয়ামতে আমার অধিক নিকটে বসিবে ন্যায়পরায়ণ খলীফা।"

মোটকথা, খেলাফত যেমন একটি মহান এবাদত, তদ্রূপ উহার বিপদাশংকাও বেশী। এই কারণেই বুজুর্গানেদ্বীন সর্বদা এই দায়িত্ব হইতে দূরে ছিলেন। খেলাফত ও শাসন ক্ষমতা লাভের পর ভোগ-বিলাসের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং যশপ্রীতি, নেতৃত্ব ও হুকুম খাটানো ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি মন

আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অতঃপর মনের চাহিদা মিটাইতে গিয়া অনেক সময় সত্য বিষয়ও বর্জন করা হয়। অর্থাৎ নিজের স্বার্থ, ক্ষমতা ও পদমর্যাদার পরিপন্থী মনে করা হইলে ন্যায় ও হক বিষয় বর্জন করিয়া অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করা হয় না। এইভাবেই একজন খলীফা জালেম শাসকে রূপান্তরিত হয়। উপরে বর্ণিত হাদীসের মাফহুম দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, জালেম শাসকের একদিন, একজন ফাসেকের ষাট বৎসর পাপকর্মের সমান। এই ভয়াবহ বিপদাশংকার কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন– এই পদে যখন এত বিপদ, তখন ইহা কে গ্রহণ করিবে? নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা এই পদের বিপদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাইবে। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ما من وال عشرة الا جاء يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه اطلقه
عدله او اوبقه جوره

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি দশ ব্যক্তিরও শাসক হয়, সেই ব্যক্তিও কেয়ামতের দিন এমতাবস্থায় হাজির হইবে যে, তাহার হাত ঘাড়ের সহিত বাঁধা থাকিবে। তাহার ন্যায়পরায়ণতা তাহাকে মুক্ত করিবে কিংবা তাহার জুলুম তাহাকে ধ্বংস করিবে।" (আহমাদ)

একবার হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মাকেল ইবনে য়াসারকে কোন প্রদেশের শাসক নিযুক্ত করার প্রস্তাব করিলে তিনি আরজ করিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! এই বিষয়ে আপনিই আমাকে পরামর্শ দিন। আমার পক্ষে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিৎ কি-না। খলীফা বলিলেন, আমার পরামর্শের উপরই যদি তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ নির্ভর করে, তবে আমি বলিব, এই দায়িত্ব গ্রহণ না করাই ভাল। আর আমার এই পরামর্শের কথা অপর কাহাকেও বলিও না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কোন এলাকার শাসক নিযুক্ত করিতে চাহিলে লোকটি আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে বলিয়া দিন, শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করা আমার পক্ষে কল্যাণকর হইবে কি-না। এরশাদ হইলঃ ঠিক আছে, তুমি বস। (তাবরানী)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ছামুরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

يا عبد الرحمن لا تسئل الامارة فانك ان توتيتها من غير مسألة اعنت
عليها و ان توتيتها عن مسألة وكلت عليها

অর্থঃ "হে আব্দুর রহমান! শাসক পদ প্রার্থনা করিও না। যদি প্রার্থনা ছাড়াই প্রাপ্ত হও; তবে উহার জন্য তুমি গায়েব হইতে সাহায্য পাইবে। আর যদি প্রার্থনা করার পর পাও, তবে উহার হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হইবে।"

(বোখারী, মুসলিম)

একবার হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) রাফে' ইবনে ওমরকে বলিলেন, দুই ব্যক্তির উপরও শাসক হইও না। কিন্তু পরে হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজে যখন খলীফা নিযুক্ত হইলেন, তখন রাফে' ইবনে ওমর আরজ করিলেন, আপনি তো আমাকে দুই ব্যক্তির উপরও শাসক হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তো আপনি গোটা উম্মতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে এখনো আমি সেই কথাই বলি যে, দুই ব্যক্তির উপরও শাসক হইও না। কেননা, যেই ব্যক্তি শাসক নিযুক্ত হওয়ার পর ইনসাফ করে না, তাহার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়।

শাসনক্ষমতা গ্রহণ করিতে বারণ এবং উহার প্রতি উৎসাহ প্রদান পরস্পর বিরোধী নহে

উপরের আলোচনা দ্বারা দেখা যায়, কতক হাদীসে শাসক হওয়ার ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে। আবার কতক হাদীসে শাসক হইতে বারণ করা হইয়াছে। স্বল্প বিদ্যার লোকেরা হয়ত এইসব বিবরণকে পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে করিতে পারে। আসলে এইসব বিবরণে কোন বৈপরীত্য নাই। এখানে প্রকৃত অবস্থা হইল, এমন বিশেষ ব্যক্তিবর্গ– দ্বীনের উপর যাহাদের মজবুতী আছে, তাহারা শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা উচিৎ নহে। আর দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে যাহারা দুর্বল, তাহারা অবশ্যই উহা হইতে দূরে থাকা উচিৎ। কেননা, এই শ্রেণীর লোকেরা শাসনক্ষমতা গ্রহণ করিলে দ্বীনের উপর মজবুতী না থাকার কারণেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

এমন ব্যক্তিগণই দ্বীনের উপর মজবুত, দুনিয়ার লোভ-লালসা যাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না এবং আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে যাহারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করে না। এই শ্রেণীর লোকেরা দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না এবং নিজের নফসের কামনা-বাসনাকে দমন করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহারা শয়তানের প্রতারণার জালকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং শয়তান তাহাদের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রতিটি কর্ম ন্যায় ও সত্যের জন্য নিবেদিত এবং সত্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতেও তাহারা কোন পরওয়া করে না। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তিদের পক্ষে খেলাফত ও শাসনক্ষমতা গ্রহণ করা উচিৎ এবং এই শ্রেণীর লোকদের জন্যই উহার ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে যাহাদের মধ্যে

এইসব গুণ নাই, তাহাদের পক্ষে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিৎ নহে।

যেই ব্যক্তি নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাইয়াছে যে, সে ন্যায় ও সত্যের উপর অটল থাকিতে সক্ষম এবং প্রবৃত্তির চাহিদা হইতে মুক্ত– কিন্তু এই ব্যক্তি এখনো কোন দিন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই; বরং এই বিষয়ে যথেষ্ট আশংকা আছে যে, একবার ক্ষমতার স্বাদ পাইলে উহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইবে এবং ক্ষমতা হারাইবার আশঙ্কা হইলে সে উহা আঁকড়াইয়া থাকারই চেষ্টা করিবে। এমন ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণ করা উচিৎ কি-না এই বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণের সুযোগ পাইয়াও তাহা ত্যাগ করা ওয়াজিব নহে। কেননা, উপস্থিত ক্ষেত্রে এই ব্যক্তির মধ্যে এমনসব গুণ-বৈশিষ্ট ও যোগ্যতা বিদ্যমান– যাহা একজন ন্যায়পরায়ন খলীফার মধ্যে থাকা আবশ্যক। অবশ্য ভবিষ্যতে তাহার এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটার যথেষ্ট আশংকা রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে সঠিক মতামত হইল, এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতা গ্রহণ হইতে বিরত থাকা উচিৎ। কেননা, মানুষের মন এবং উহার মতিগতির কোন ঠিকঠিকানা নাই। মানুষ সব সময়ই ন্যায় ও সৎ পথে চলার অঙ্গীকার করে। কিন্তু ভবিষ্যতেও সেই অঙ্গীকার বহাল থাকিবে কি-না তাহা নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না। বরং এই অঙ্গীকার ভঙ্গের আশংকা থাকিয়াই যায়। সুতরাং খেলাফত ও শাসন ক্ষমতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করাই সঙ্গত। কেননা, একবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর উহা বর্জন করা খুবই কঠিন। পদাবনতি যেন মানুষের নিকট মৃত্যুতুল্য কষ্টকর বলিয়া মনে হয়। কথায় বলে– পদ হইতে অপসারণ পুরুষের জন্য তালাকের মত অবমাননাকর। সুতরাং একবার ক্ষমতা গ্রহণের পর কেহই উহা আর হারাইতে চাহে না। বরং উহা আঁকড়াইয়া থাকার জন্য মানুষ সত্য বিষয়ও বর্জন করিয়া জাহান্নামের খড়ি হইতে সম্মত হয়– তবুও ক্ষমতা ও পদ হারাইতে রাজি হয় না।

সুতরাং কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতা ও পদের জন্য প্রার্থী হইতে এবং উহা লাভ করার জন্য পেরেশান হইতে দেখিলে মনে করিবে, এই ব্যক্তির নেতৃত্বে শুধুই অনিষ্ট নিহিত এবং তাহার দ্বারা কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। এই কারণেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

انا لا نولى امرنا من سألناه

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি আমার নিকট হুকুমত প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে হাকিম বানাই না।" (বোখারী, মুসলিম)

দ্বীনের ব্যাপারে মজবুতী ও দুর্বলতার উপরোক্ত পার্থক্য জানার পর এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত রাফে

ইবনে ওমরকে কি কারণে শাসনভার গ্রহণ করিতে বারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং কি কারণে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিচারক

বিচারকের পদটি শাসনকর্তার নিম্নে অবস্থিত হইলেও উহার বিধানও শাসনকর্তার মতই। কেননা, ইহাতেও শাসন ক্ষমতা বিদ্যমান এবং বিচারকের ফায়সালাও বাস্তবায়ন করা হয়। বিচারকের পদে বসিয়া যদি ইনসাফ ও সত্যের অনুসরণ করা হয়, তবে ইহা একটি অতিবড় ছাওয়াবের কাজ। আর এই ক্ষমতা বলে যদি অন্যায় ও অবিচার করা হয়, তবে ইহার আজাবও কঠিন। রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

القضاة ثلاثة، قاضيان في النار و قاض في الجنة

অর্থঃ "বিচারক তিন প্রকার। উহার মধ্যে এক প্রকার জান্নাতে এবং দুই প্রকার জাহান্নামে যাইবে।" (আসহাবে সুনান)

অপর এক হাদীসে আছে–

من استقضى فقد ذبح بغير سكين

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি নিজে বিচারক হওয়ার আবেদন করে, সে ছুরি ছাড়াই জবাই হইয়া যায়।" (আসহাবে সুনান)

মোটকথা, দ্বীনের মধ্যে যাহাদের মজবুতী নাই এবং এমন সব ব্যক্তি যাহাদের নজরে দুনিয়া এবং উহার স্বাদ-সম্ভোগের বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আছে তাহাদের পক্ষে বিচারকের পদ গ্রহণ করা উচিৎ নহে। পক্ষান্তরে দ্বীনের মধ্যে যাহাদের মজবুতী আছে এবং ন্যায় ও সত্যের ক্ষেত্রে যাহারা তিরস্কারকের তিরস্কারকে কিছুমাত্র ভয় করে না, তাহারা এই পদ গ্রহণে সম্মত হওয়া উচিৎ।

বাদশাহ যদি জালেম হয় এবং বিচারক যদি ইহা জানিতে পারে যে, বিচারকার্য পরিচালনায় সত্য মিথ্যা যাহাই হউক, বাদশাহর মর্জিরই অনুসরণ করিতে হইবে এবং বাদশাহর আপন জন ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের কারণেই অনেক সময় বিচারের সঠিক ফায়সালা এড়াইয়া যাইতে হইবে এবং এইভাবে চলিতে পারিলেই এই পদে বহাল থাকা যাইবে। তদুপরি বিচারকের যদি ইহাও জানা থাকে যে, আমি যদি বাদশাহ ও তাহার আমলাদের কোন মোকদ্দমায় ন্যায়বিচার করি, তবে তাহারা আমাকে বরখাস্ত করিয়া দিবে কিংবা তাহারা আমার ফায়সালা মানিবে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে বিচারকের পদ গ্রহণ না করাই উচিৎ। আর এইরূপ ক্ষেত্রেও যদি বিচারকের পদ গ্রহণ করা হয়, তবে তাহার কর্তব্য হইল– বাদশাহ ও তাহার আমলাগণকে হক ও ন্যায়ের ফায়সালা

মানিতে বলিবে এবং বিচারকের পদ হারাইবার আশংকা করিবে না। বরং ন্যায়ের পথে অটল থাকার কারণে পদচ্যুত হইলে মনে করিবে, আল্লাহ পাক মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কোন বিচারক পদচ্যুত হওয়ার কারণে যদি মনে কষ্ট অনুভব করে এবং পদ রক্ষার জন্য যদি ন্যায় বিচারের কোন পরওয়া না করে তবে এই ব্যক্তি প্রকৃত বিচারক নহে। বরং এই ব্যক্তি নফসের খাহেশাতের পুজারী ও শয়তানের অনুসারী। বিচারকার্য পরিচালনার বিনিময়ে এই ব্যক্তি কোন ছাওয়াব তো পাইবেই না, বরং জালেমদের সঙ্গে দোজখের নিম্নস্তরে অবস্থান করিবে।

ওয়াজ, ফতোয়া ও শিক্ষকতা

ওয়াজ, ফতোয়া প্রদান, হাদীছ বর্ণনা ও শিক্ষকতার মধ্যেও যশ-খ্যাতি ও মর্যাদা প্রাপ্তির উপাদান বিদ্যমান বিধায় এই ক্ষেত্রেও খেলাফত ও শাসন ক্ষমতার মতই বিপদাশংকা বিদ্যমান। এই বিপদাশংকার কারণেই আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের অনেকে যথাসম্ভব এইসব কাজ হইতে বিরত থাকিতেন।

হযরত বিশর (রাঃ) কয়েক আলমিরা হাদীস দাফন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, আমি এই কারণে হাদীস বর্ণনা করি না যে, আমার মন হাদীস বর্ণনা করিতে ভালবাসে। আমার মনে যদি হাদীস বর্ণনা করার বাসনা পয়দা না হয়, তবে অবশ্যই আমি হাদীস বর্ণনা করিব। একজন ওয়ায়েজ যখন জানিতে পারে যে, তাহার ওয়াজের প্রভাবে শ্রোতাগণ আবেগ-আপ্লুত হইয়া উঠিতেছে এবং আজাব ও গজবের বয়ানের কারণে শ্রোতাদের মধ্যে আহাজারী ও ক্রন্দনের রোল পড়িয়া যাইতেছে তখন সে এমন এক অনাবিল আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি অনুভব করে যে, উহার সঙ্গে অপর কোন আনন্দের তুলনা হইতে পারে না। এই শ্রেণীর ওয়ায়েজগণ কেবল এমন ওয়াজ করিয়া বেড়ায় যাহা শুনিয়া মানুষ আনন্দ পায়– যদিও তাহা ভ্রান্ত হয়। আর যেইসব ওয়াজ শুনিয়া মানুষ তৃপ্ত হয় না তাহা আবশ্যকীয় ও জরুরী হইলেও সেইগুলি পরিহার করিয়া চলে। অর্থাৎ এইসব ওয়ায়েজগণ কেবল সুনাম-সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যেই শ্রোতাদের চাহিদা অনুযায়ী ওয়াজ করিয়া বেড়ায়। কোথাও কোন হাদীস ও হেকমতের কথা পাইলে এই কারণে আনন্দিত হয় যে, এখন আমি এই হাদীস ও হেকমতের কথা বয়ান করিয়া শ্রোতাদের বাহ্বা কুড়াইব। অথচ তাহার উচিৎ ছিল এই ভাবিয়া আনন্দিত হওয়া যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমি একটি মূল্যবান হাদীস এবং একটি হেকমতের কথা জানিতে পারিয়াছি। এখন আমি প্রথমে নিজে উহার উপর আমল করিব এবং পরে আল্লাহ তাওফীক দিলে অপর ভাইদের নিকটও উহা পৌঁছাইয়া দিব যেন তাহারাও উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে।

মোটকথা, ওয়াজ-নসীহত ও শিক্ষকতা ইত্যাদির মধ্যেও শাসনক্ষমতার মত ফেৎনার আশংকা বিদ্যমান এবং এই ওয়াজ-নসীহত ও শিক্ষকতার হুকুমও শাসনক্ষমতার অনুরূপ। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি নিছক যশ-খ্যাতি ও মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে ওয়াজ-নসীহতের সুযোগ সন্ধান করে এবং উহাকে জীবিকার মাধ্যম বানায়, তাহার উচিৎ যতদিন তাহার অন্তরে খাহেশাতের পরিবর্তে আখেরাতের ভয় প্রবল না হইবে ততদিন এইসব কর্ম হইতে বিরত থাকা।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আলেম সমাজকে যদি ওয়াজ-নসীহত, ফতোয়া ও শিক্ষকতা ইত্যাদি হইতে বিরত রাখা হয়, তবে তো দুনিয়া হইতে এলেম নিশ্চিহ্ন হইয়া খায়ের ও কল্যাণের ধারা বন্ধ হইয়া যাইবে। সমস্ত পৃথিবী জেহালাত ও মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া ধর্মীয় চেতনা ও সভ্যতার অবসান ঘটিবে। এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমতা ও রাজত্ব প্রার্থনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ক্ষমতা ও রাজত্বের অনিষ্টের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি এরশাদ করিয়াছেন–

انكم تحرصون على الامارة و انها حسرة و ندامة يوم القيامة الا من اخذها بحقها .

অর্থঃ "তোমরা রাজত্বের লোভ করিতেছ, অথচ কেয়ামতের দিন উহা দুঃখ ও লজ্জার কারণ হইবে। তবে যেই ব্যক্তি উহাকে সৎ উপায়ে গ্রহণ করে (তাহার জন্য দুঃখ ও লজ্জার কারণ নাই)"। (বোখারী)

ইহা একটি সুস্পষ্ট কথা যে, রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসন যদি দুর্বল হইয়া যায়, তবে দ্বীন-দুনিয়ার সব কিছুতেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং দেশব্যাপী চরম অরাজকতা ও হানাহানি সৃষ্টি হইয়া দেশ হইতে শান্তি ও নিরাপত্তা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পার্থিব জীবন ও জীবনের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই এই রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজন আছে। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজত্ব ও ক্ষমতার পদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রাঃ) শুধু এই কারণে উবাই ইবনে কা'বকে তিরস্কার করিয়াছিলেন যে, তাহার গোত্রের কতক লোক তাহার পিছনে পিছনে চলিতেছিল। অথচ উবাই ইবনে কা'ব সম্পর্কে তিনি নিজেই বলিতেন যে, উবাই মুসলমানদের নেতা। হযরত ওমর (রাঃ) উবাই ইবনে কা'বকে কোরআন শরীফ শোনাইতেন। সেই উবাই ইবনে কাবের পিছনে কতক ব্যক্তিকে অনুগামী হইতে দেখিয়া তিনি বাঁধা দিয়া বলিলেন, এখানে যাহারা আনুগত্য প্রকাশ করিতেছে তাহাদের জন্য উহা অপমানের কারণ হইবে এবং

যাহার আনুগত্য করা হইতেছে তাহার জন্য ফেৎনার আশংকা রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) খোৎবা দিতেন এবং লোকসমাগমে ওয়াজ নসীহত করিতেন। কিন্তু এক ব্যক্তি তাহার নিকট প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর ওয়াজ করার অনুমতি চাহিলে তিনি লোকটিকে বারণ করিয়া বলিলেন, আমার আশংকা হইতেছে যে, উহার কারণে তুমি ফুলিয়া উঠিবে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর এই উক্তির কারণ হইল, সেই ব্যক্তির মধ্যে যশ-প্রীতি ও জনপ্রিয় হওয়ার আগ্রহ বিদ্যমান ছিল।

মোটকথা, ওয়াজ-নসীহত, শিক্ষকতা ও ফতোয়া যেমন দ্বীনের জন্য আবশ্যক, তদ্রূপ মানুষের দ্বীনের হেফাজতের জন্যও খেলাফত ও বিচারকের প্রয়োজন রহিয়াছে। জাগতিক বিবেচনায় এই দুইটি ক্ষেত্র যেমন লোভনীয়, তদ্রূপ উহাতে বিপদাশংকাও যথেষ্ট বিদ্যমান। এই হিসাবে এই দুইটি ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং প্রশ্নকর্তার এই উক্তি সঠিক নহে যে, ওয়াজ-নসীহত, শিক্ষকতা ও ফতোয়া হইতে বিরত রাখা হইলে দ্বীন মিটিয়া যাইবে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচারকের পদ গ্রহণ করিতে বারণ করিয়াছিলেন। এখন তাহার এই নিষেধবাণীর কারণে কি বিচার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল? বরং বাস্তব অবস্থা তো এই কথাই স্বাক্ষ্য দেয় যে, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মোহ মানুষকে বিচারক পদের প্রার্থী হইতে বাধ্য করিয়াছিল। অনুরূপভাবে যশ-খ্যাতি ও নেতৃত্বের মোহের কারণেই মানুষ এলেম মিটাইতে দিবে না। বরং মানুষের পায়ে বেড়ী লাগাইয়া বন্দী করিয়াও যদি তাহাদিগকে এলেমের অন্বেষণ হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়, তবুও তাহা সম্ভব হইবে না। মানুষ যে কোন উপায়ে এই বন্ধন ছিন্ন করিয়া এলেমের অন্বেষণ ও দ্বীন শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করিবেই। আল্লাহ পাক ওয়াদা করিয়াছেন, তিনি এমন লোক দ্বারা দ্বীনের সাহায্য করাইবেন– দ্বীনের মধ্যে যাহাদের কোন অংশ নাই। সুতরাং তোমরা মানুষের চিন্তা করিও না। আল্লাহ পাক তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন না। তোমরা বরং নিজেদের ফিকির কর যেন তোমরা নিজেরা ধ্বংস হইয়া না যাও।

মনে কর, কোন শহরে যদি বেশ কিছু সংখ্যক ওয়ায়েজ থাকেন, আর তাহাদিগকে ওয়াজ করিতে নিষেধ করা হয়, তবে খুব স্বল্প সংখ্যক ওয়ায়েজই এই নিষেধাজ্ঞা পালন করিবেন এবং অধিকাংশ ওয়ায়েজই যশ-খ্যাতি, সম্মান ও ক্ষমতার মোহে ওয়াজ-নসীহত চালাইয়া যাইবেন। তবে গোটা শহরে যদি কেবল একজন ওয়ায়েজই থাকেন এবং তাহার আকর্ষণীয় ওয়াজ যদি মানুষের জন্য উপকারী বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং সেই সঙ্গে যদি ইহাও মনে করা হয় যে, এই ব্যক্তি নেহায়েত এখলাসের সঙ্গেই ওয়াজ করেন এবং পার্থিব

লোভ-লালসার সঙ্গে তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, তবে এইরূপ ব্যক্তিকে কেহই ওয়াজ করিতে নিষেধ করিবে না। বরং সকলেই তাহাকে বলিবে যে, আপনি নিয়মিত ওয়াজ চালাইয়া যান। এই ব্যক্তি যদি এই কথা বলিয়া নিজের অপারগতা প্রকাশ করে যে, আমি আমার নফস ও প্রবৃত্তির ব্যাপারে নিশ্চিত নহি, তবুও লোকেরা তাহাকে বলিবে যে, আপনি ওয়াজ-নসীহত করিতে থাকুন এবং সেই সঙ্গে নফসের এস্‌লাহের জন্য মোজাহাদা করিতে থাকুন, তবুও ওয়াজ বন্ধ করিবেন না। কেননা, এই ক্ষেত্রে লোকেরা মনে করিবে যে, এই একমাত্র ব্যক্তিটি যদি তাহার ওয়াজ বন্ধ করিয়া দেয়, তবে শহরের লোকেরা দ্বীন হইতে দূরে সরিয়া ক্রমে বিপথগামী হইতে থাকিবে। কারণ, এই জনপদের মানুষকে ধর্মের পথ দেখাইবার মত দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তি নাই। এই ব্যক্তি যদি যশ-খ্যাতি অর্জনের জন্য ওয়াজ করিতে থাকে এবং উহার পরিণতিতে সে ধ্বংস হইয়া যায়, তবুও লোকেরা উহার কোন পরওয়া করিবে না। কেননা, লোকেরা এই এক ব্যক্তির দ্বীনের নিরাপত্তার তুলনায় সকলের দ্বীনের নিরাপত্তার বিষয়টিকেই অধিক গুরুত্ব দিবে। মানুষ মনে করিবে, আমরা শহরের সকল অধিবাসীদের দ্বীনের হেফাজতের জন্য এই ব্যক্তিকে না হয় উৎসর্গ করিলাম। কেননা, এই ব্যক্তির ওয়াজ-নসীহতের অনুসরণের মাধ্যমেই সকলের পারলৌকিক জীবন দুরস্ত হইবে। সম্ভবতঃ এই ধরনের লোকদের সম্পর্কেই হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

ان الله يؤيد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم

অর্থঃ "আল্লাহ পাক এমন লোকদের দ্বারা দ্বীনের সাহায্য করাইবেন, দ্বীনের মধ্যে যাহাদের কোন অংশ নাই।" (নাসাঈ শরীফ)

ওয়ায়েজের সংজ্ঞা

প্রকৃত অর্থে ওয়ায়েজ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যিনি নিজের কথা, কর্ম ও বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা মানুষকে আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করে এবং ব্যক্তি জীবনের সর্ব অঙ্গনে নিজে তাকওয়া ও পরহেজগারীর অনুসারী হয়। কিন্তু হাল জমানার ওয়ায়েজগণ কেবল ভাষা ও চটকদার বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমেই মানুষকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস চালায়। আলোচনার ফাকে ফাকে সুমধুর কণ্ঠে শের-বয়াত পাঠ করিয়া শ্রোতাগণকে মাতাইয়া রাখার চেষ্টা করা হয়। এইসব কুশলী বয়ানকে চমৎকার ওয়াজ বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা দ্বারা না দ্বীনের কোন ফায়দা হয়, না দ্বীনদারদের আত্মিক কোন উপকার হয়। আর না মুসলমানদের অন্তরে আখেরাতের ভয় পয়দা হয়। বরং এইসব পোশাকী ওয়াজের ফলে মানুষের অন্তরে পাপাচারের দুঃসাহস এবং খাহেশাতের আকাঙ্ক্ষাই বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের ওয়ায়েজগণকে শহর হইতে তাড়াইয়া

দেওয়া উচিত। ইহারা দাজ্জালের নায়েব ও শয়তানের খলীফা। অর্থাৎ এইসব ওয়ায়েজগণের পরিচয় হইল– তাহাদের কথা, বর্ণনাভঙ্গি, উপস্থাপনা ও বাহ্যিক ছুরত খুবই চমৎকার বটে, কিন্তু ওয়াজের মাধ্যমে তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে শুধুই যশ-খ্যাতি ও সম্মান প্রাপ্তি। আমার রচিত "কিতাবুল ইলম" শীর্ষক পুস্তিকায় "ওলামায়ে ছু' বা এই ধরনের অসৎ আলেমদের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

হযরত ঈসা (আঃ) এই শ্রেণীর আলেম সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, হে ওলামায়ে ছু! তোমরা রোজা-নামাজ ও দান-সদকা কর, কিন্তু মানুষকে যাহা করিতে বল, নিজেরা উহার উপর আমল কর না। মানুষকে সৎ পথে চলার উপদেশ দাও কিন্তু নিজেরা ন্যায় ও সত্যের বিপরীতে অবস্থান করিতেছ। তোমরা মুখে তওবা কর বটে, কিন্তু অন্তরে নফসের খাহেশাতের আনুগত্য কর। তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা যতই সুন্দর হউক, কিন্তু তোমাদের অন্তর যদি পবিত্র না হয়, তবে তোমরা কেমন করিয়া মঙ্গলের আশা করিতে পার? আমি সত্য বলিতেছি! তোমরা এমন চালনিতে পরিণত হইও না, যেই চালনি হইতে ভাল আটাগুলি বাহির হইয়া উহাতে কেবল ভুসিগুলি অবশিষ্ট থাকে। তোমাদের অবস্থা কিন্তু সেইরূপই মনে হইতেছে। তোমাদের মুখ হইতে হেকমতের কথা বাহির হইয়া অন্তরে যাহা অবশিষ্ট থাকে উহা শুধুই নেফাক ও কপটতা ছাড়া আর কিছুই নহে। হে দুনিয়ার গোলামগণ! যেই ব্যক্তি এখনো দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও খাহেশাত ত্যাগ করিতে পারে নাই এবং সর্বদা কেবল দুনিয়ার পিছনেই ছুটিতেছে, সেই ব্যক্তি কেমন করিয়া পরকালে লাভবান হইবে? আমি সত্য বলিতেছি! তোমাদের অন্তর তোমাদের আমলের অবস্থা দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছে। দুনিয়াকে তোমরা জিহ্বার নীচে রাখিয়া আমলকে পায়ের নীচে দলিত করিতেছ। দুনিয়াকে সজ্জিত করিয়া আখেরাতকে বরবাদ করিতেছ। পরকালের তুলনায় পার্থিব মঙ্গলকেই তোমরা অধিক প্রিয় মনে করিতেছ। সুতরাং তোমাদের তুলনায় হতভাগা আর কে হইতে পারে? হায় আফসোস! তোমরা যদি নিজেদের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে জানিতে পারিতে! আর কতকাল তোমরা অন্ধকারের পথচারীকে পথ দেখাইবে, আর নিজেরা উদভ্রান্তের মত দাঁড়াইয়া থাকিবে? তোমরা যেন ইহাই কামনা করিতেছ যে, দুনিয়াদারগণ তোমাদের জন্য দুনিয়া রাখিয়া চলিয়া যায় আর তোমরা উহা ভোগ করিতে থাকিবে। এইবার ক্ষান্ত হও, আর অগ্রসর হইও না। তোমরা কি ইহা জান না যে, যেই ব্যক্তি ঘরের ছাদের উপর প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে, তাহার ঘরের অন্ধকার কখনো দূর হয় না? তোমাদের এলেমের নূর যদি তোমাদের মুখেই থাকে, আর তোমাদের অন্তর সেই নূরের কোন অংশ না পায়, তবে এমন এলেম দ্বারা তোমাদের কি লাভ হইবে? হে দুনিয়ার গোলামগণ! তোমরা না মোত্তাকী বান্দা, আর না তোমরা গাইরুল্লাহর গোলামীর জিঞ্জির হইতে মুক্ত হইয়া সভ্য মানুষ হইতে পারিয়াছ। তোমাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যেন দুনিয়া তোমাদিগকে নীতিচ্যুত করিয়া উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিবে। তোমাদের গোনাহ তোমাদের কপালের চুল টানিয়া ধরিয়া এবং এলেম পিছন হইতে ধাক্কা দিয়া প্রকৃত বাদশাহর নিকট সোপর্দ করিবে। তোমাদের মাথায় না টুপি থাকিবে, না পায়ে জুতা থাকিবে। অতঃপর তোমাদের পাপাচার সম্পর্কে অবহিত করিয়া উহার শাস্তি প্রদান করা হইবে।

হযরত হারাস মুহাসাবী নিজের এক কিতাবে উপরোক্ত বিবরণ উল্লেখ করার পর লিখেনঃ এইসব "ওলামায়ে ছু" হইল মানবরূপী শয়তান এবং মানুষের জন্য ইহারা এক ফেৎনা। ইহারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও পার্থিব ইজ্জত-সম্মানের প্রতি আকৃষ্ট এবং আখেরাতের উপর দুনিয়ার শান-শওকতকেই প্রাধান্য দেয়। সকল ক্ষেত্রেই তাহারা দুনিয়ার জন্য দ্বীনকে অপমান করিয়াছে। এইসব লোকেরা দুনিয়াতেও অপমানিত হইয়াছে এবং তাহাদের আখেরাতও বরবাদ হইবে।

এখন কেহ হয়ত বলিতে পারে যে, আমরা না হয় দুনিয়ার এই সব বাহ্যিক বিপদাপদ মানিয়া লইলাম। কারণ, হাদীস শরীফে তো ওয়াজ নসীহতের বহু ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে। যেমন হযরত সহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

لان يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا و ما فيها

অর্থঃ তোমার দ্বারা যদি এক ব্যক্তি হেদায়েত প্রাপ্ত হয়, তবে তোমার জন্য উহা দুনিয়া এবং উহার মধ্যস্থিত সকল কিছু অপেক্ষা উত্তম।" (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত অপর একটি হাদীস এইরূপ–

ايما داع دعا الى هدى و اتبع عليه كان له اجبره و احبر من اتبعه

অর্থঃ "যেই দায়ী' দাওয়াত দেয় এবং লোকেরা তাহার অনুসরণ করে, তবে দায়ী' ইহার ছাওয়াব পাইবে এবং যাহারা তাহার অনুসরণ করিবে উহার ছাওয়াবও পাইবে। (ইবনে মাজা)

এলেমের ছাওয়াব ও ফজিলত সংক্রান্ত এই ধরনের বহু রেওয়ায়েত উল্লেখ আছে। সুতরাং একজন আলেমকে এই পরামর্শ দেওয়া উচিৎ যেন সে নিজের এলেম বর্জন না করিয়া বরং উহাতে নিমগ্ন থাকে এবং মানুষের মঙ্গলার্থে রিয়া বর্জন করিয়া চলে। যেমন একজন রিয়াকার নামাজীকে বলা হয় যে, তুমি আমল বর্জন না করিয়া বরং উহা সম্পন্ন কর এবং রিয়া হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য

চেষ্টা করিতে থাক।

এই প্রসঙ্গে আমরা বলিব, এলেমের ফজিলত যেমন অপরিসীম তদ্রূপ উহার বিপদাশংকাও কম নহে। যেমন খেলাফত ও রাষ্ট্রক্ষমতা উত্তম আমলের বাহন বটে, কিন্তু উহার বিপদাশংকাও ভয়াবহ। আমরা আল্লাহর কোন বান্দাকে এই কথা বলি না যে, এলেম বর্জন কর। কারণ, সত্ত্বাগতভাবে এলেমের মধ্যে কোন বিপদ নাই। বিপদ হইল, ওয়াজ-নসীহত, শিক্ষকতা ও হাদীস বর্ণনায় উহা জাহির করার ক্ষেত্রে। সুতরাং কাহারো অন্তরে যদি রিয়ার পাশাপাশি এলেমও মওজুদ থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রেও আমরা আমল বর্জন করিতে বলিব না। বরং এই ক্ষেত্রেও এলেম জাহির করিয়া দেওয়া উচিৎ। কিন্তু শুধুই রিয়ার কারণে যদি আমল করা হয়, তবে এই ক্ষেত্রে এলেম জাহির না করাই উত্তম ও নিরাপদ। নফল নামাজের বিধানও অনুরূপ। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি শুধু রিয়ার কারণেই নফল নামাজ পড়ে, তবে এই নামাজ বর্জন করা উচিৎ। তবে এই রিয়া যদি নামাজ পাঠরত অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অন্তরে রিয়ার প্রতি ঘৃণাও থাকে, তবে এই ক্ষেত্রে নামাজ ত্যাগ করিবে না। কেননা, এবাদতের মধ্যে রিয়ার বিপদ তুলনামূলকভাবে দুর্বল। আর হুকুমত, রাজত্ব ও এলেমের সহিত সংশ্লিষ্ট উচ্চ পদমর্যাদা সমূহের ক্ষেত্রে উহার বিপদাশংকা অধিক ও শক্তিশালী।

এখলাস ও সততার পরিচয়

একজন আলেম ও ওয়ায়েজের মধ্যে এখলাস ও সততা আছে কি-না এবং তিনি রিয়া হইতে মুক্ত কি-না তাহা কেমন করিয়া জানা যাইবে? মোটামুটি কয়েকটি আলামত দ্বারা এই বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাইতে পারে। যেমন কোন আলেম বা ওয়ায়েজের নিকট যদি এমন কোন আলেম বা ওয়ায়েজ আসেন যিনি এই ব্যক্তির তুলনায় ভাল আলেম ও ভাল ওয়ায়েজ, তবে এহেন আলেম ও ওয়ায়েজের আগমনের ফলে এই ব্যক্তি যদি খুশী হয় এবং কোনরূপ হিংসা না করে, তবে এই ব্যক্তির এখলাস ও সততা প্রমাণিত হইবে। অবশ্য হিংসার পরিবর্তে যদি ঈর্ষা হয় তবে কোন ক্ষতি নাই। ঈর্ষা বলা হয়– কাহারো মধ্যে কোন যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়া নিজেও সেইরূপ হওয়ার প্রত্যাশী হওয়া। ইহা দোষনীয় নহে।

আরেক লক্ষণ হইল, ওয়াজ করার সময় যদি বড় কেহ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহার ওয়াজের ধরণ পরিবর্তন না করিয়া আগের মতই ওয়াজ করিতে থাকা। অর্থাৎ সকল মানুষই তাহার নজরে বরাবর হওয়া। ইহাও বক্তার সততা ও এখলাসের আলামত। অনুরূপভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ প্রত্যাশা না করা যে, পথে-ঘাটে লোকেরা তাহার পিছনে পিছনে চলিতে থাকিবে। মোটকথা ওয়ায়েজ ও আলেমের এখলাস ও সততার পরিচয় পাওয়ার আরো

অসংখ্য আলামত আছে। এখানে নমুনা হিসাবে উহার কয়েকটি উল্লেখ করা হইল।

হযরত সাঈদ ইবনে মারওয়ান বলেন, একবার আমি হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর সম্মুখে বসা ছিলাম। এমন সময় মসজিদের এক দরজা দিয়া হাজ্জাজ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাহার সঙ্গে একদল নিরাপত্তা প্রহরীও ছিল। হাজ্জাজ চতুর্দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন, হযরত হাসান বসরীর মজলিসে যেই পরিমাণ শ্রোতা বসা আছে, অপর কোন মজলিসে সেই পরিমাণ শ্রোতা নাই। অতঃপর তিনি স্বাভাবিকভাবেই হযরত হাসানের মজলিসের দিকে আগাইয়া আসিলেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হাজ্জাজকে এদিকে আসিতে দেখিয়া বক্তৃতা অব্যাহত রাখিয়াই একটু সরিয়া নিজের পাশে কিছুটা জায়গা ছাড়িয়া দিলেন। হযরত সাঈদ বলেন, আমিও তাহার জন্য সামান্য জায়গা ছাড়িয়া সরিয়া বসিলাম। অতঃপর হাজ্জাজ আসিয়া আমাদের উভয়ের মাঝে আসন গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হাজ্জাজের আগমনের ফলে হযরত হাসান কিছুমাত্র প্রভাবিত হইলেন না এবং আগের মতই বয়ানের ধারা অব্যাহত রাখিলেন। আমি মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, হযরত হাসান নিশ্চয়ই এখন বয়ানের প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করিবেন যেন উহার ফলে হাজ্জাজের নৈকট্য লাভ করা যায়। কিংবা হাজ্জাজের ভয়ে হয়ত কথা সংক্ষেপ করিবেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরীর মধ্যে এইসবের কোন কিছুই লক্ষ্য করা গেল না। বরং তাহার আলোচনার ধারা দেখিয়া ইহাই মনে হইল যে, তিনি একবার ভাবিয়াও দেখেন নাই যে, আজ তাহার পাশে কে আসিয়া উপবেশন করিয়াছেন। অবশেষে যথাসময় বয়ান শেষ হইলে হাজ্জাজ হযরত হাসানের কাঁধ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, শায়েখ যাহা বলিয়াছেন তাহা অতীব সত্য ও যথার্থ এবং তিনি অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি শ্রোতা সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! এমন মজলিসেই বসা উচিৎ। আজ তোমরা এখানে যাহা শুনিলে উহা যেন তোমাদের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। আমার নিকট এই রেওয়ায়েত পৌঁছিয়াছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ان مجالس الذكر رياض الجنة

অর্থঃ "নিশ্চয়ই জিকিরের মজলিস হইল জান্নাতের বাগান।"

অতঃপর হাজ্জাজ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমরা তো সবসময় রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকি। এই কারণে তোমরা আমাদের তুলনায় অগ্রগামী হওয়ার সুযোগ পাইয়াছ। অন্যথায় তোমাদের তুলনায় আমরাই এইসব মজলিসে অধিক অংশ গ্রহণ করিতাম। কেননা, এইসব মজলিসের গুরুত্ব

আমাদের ভালভাবেই জানা আছে। এই কথা বলার পর তিনি একটু মৃদুহাস্য করিলেন। অতঃপর উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে তিনি এমন এক জ্ঞানগর্ভ বয়ান করিলেন যে, তাহার বয়ান শুনিয়া হযরত হাসানসহ সকলে অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। বয়ান শেষ করার পরই হাজ্জাজ মজলিস হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে এক বৃদ্ধের আগমন ঘটিল। লোকটি ছিল সিরিয়ার অধিবাসী। ইতিপূর্বে হাজ্জাজ যেখানে দাঁড়াইয়া বয়ান করিয়াছিলেন, লোকটি সেখানে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, হে মুসলমানগণ! তোমরা কি এই কথা জানিয়া বিস্মিত হইবে না যে, আমি একজন বয়োবৃদ্ধ দুর্বল মানুষ, কিন্তু সব সময় আমাকে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হয়। যুদ্ধের জন্য ঘোড়া ও তাবু আমার খুবই প্রয়োজন। আমার নিকট তিনশত দেরহাম আছে– যাহা লোকেরা আমাকে দান করিয়াছে। ঘরে আমার সাতটি কন্যা। তাহাদের ভরণ-পোষণের আয়োজনও আমাকেই করিতে হয়। আর কন্যাদের ভবিষ্যতের ভাবনা তো আছেই। অর্থাৎ এইভাবে সে নিজের অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দশার কথা এমনভাবে বর্ণনা করিল যে, উহা শুনিয়া হযরত হাসানসহ অন্য সকলে যারপর নাই মর্মাহত হইল। এতক্ষণ হযরত হাসান মস্তক নত করিয়াছিলেন। লোকটির বক্তব্য শেষ হওয়ার পর তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, হায় আক্ষেপ! আমীরগণ আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের গোলাম বানাইয়া রাখিয়াছে। তাহাদের বিনাশ হউক। তাহারা মনে করিয়াছে, তাহাদের নিকট যেই সম্পদ গচ্ছিত রাখা হইয়াছে, উহা তাহাদেরই সম্পদ। মানুষের নিকট হইতে সম্পদ আহরণের জন্য তাহারা যুদ্ধ করে। শত্রুগণ আসিয়া যখন চড়াও হয়, তখন তাহারা মূল্যবান তাবুর নীচে বসিয়া আরাম করিতে থাকে। দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া তাহারা ভ্রমণ করে। আর যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের ঘোড়া ও তাবুর কোন ব্যবস্থা হয় না। অর্থাৎ এইভাবে তিনি শাসক শ্রেণীর সমালোচনা করিয়া তাহাদের ত্রুটিসমূহ তুলিয়া ধরিলেন। এই সময় মজলিস হইতে এক ব্যক্তি উঠিয়া গিয়া হাজ্জাজের নিকট হযরত হাসানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে, তিনি প্রশাসনের সমালোচনা করিয়া জনগণকে আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছেন। উহার কিছুক্ষণ পরই শাহী দূত আসিয়া হযরত হাসানকে জানাইল যে, হাজ্জাজ আপনাকে তলব করিয়াছেন। শাহী ফরমান পাইয়া হযরত হাসান সঙ্গে সঙ্গে রওনা হইলেন।

হযরত সাঈদ বলেন, এই সময় আমরা আশংকা করিতেছিলাম যে, হাজ্জাজ হয়ত হযরত হাসানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিবে এবং তাঁহাকে শাস্তি দিবে। কিছুক্ষণ পরই হযরত হাসান সহাস্য বদনে আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ইতিপূর্বে আর কখনো তাঁহাকে এমন উৎফুল্ল দেখা যায় নাই। অতঃপর তিনি সকলকে লক্ষ্য করিয়া এক আবেগময় ভাষণ দিলেন। প্রথমেই তিনি আমানতের

গুরুত্বের উপর আলোকপাত করিয়া বলিলেন, তোমরা যেখানেই উপবেশন কর, একজন আমানতদার হিসাবেই অবস্থান কর। তোমরা হয়ত মনে করিয়াছ, কেবল টাকা-পয়সার মধ্যেই খেয়ানত হয়। অথচ সবচাইতে কঠিন খেয়ানত হইল– এক ব্যক্তি আমাদের নিকট আসিয়া বসিল, আমরা তাহাকে আমানতদার ও বিশ্বস্ত মনে করিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সে চোগলখোরী করিয়া আমাদের কথা অন্যের নিকট গিয়া লাগাইল। হাজ্জাজ আমাকে তলব করার পর আমি তাহার নিকট গিয়া হাজির হইলাম। সে আমাকে বলিলঃ তুমি বেলাগাম কথা বলিও না এবং সাধারণ মানুষকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিও না। অবশ্য মানুষের বিরোধিতার আমি কিছুমাত্র পরওয়া করি না বটে। যাহাই হউক, ঘটনাটি আর সামনে আগাইল না এবং এখানেই উহার সমাপ্তি ঘটিল।

একবার হযরত হাসান বসরী (রহঃ) গাধার উপর সওয়ার হইয়া বাড়ী যাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি পিছনে ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন, এক দল মানুষ তাহার পিছনে পিছনে আসিতেছে। তিনি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকেরা কি কারণে আমার পিছনে পিছনে আসিতেছে? আমার নিকট কি তাহাদের কোন প্রয়োজন আছে? কিংবা তাহারা কি আমার নিকট কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করিবে? তাহারা যদি অকারণেই আমার পিছনে আসিয়া থাকে, তবে তাহাদের ফিরিয়া যাওয়া উচিৎ। কেননা, এইভাবে কাহারো অনুগামী হওয়া সেই ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

উপরে যেই সমস্ত লক্ষণের বিবরণ দেওয়া হইল, উহা দ্বারা মোটামুটিভাবে মানুষের বাতেনী অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাইবে। তুমি যখন দেখিতে পাইবে যে, আলেমগণ একে অপরকে সহ্য করিতে পারিতেছেন না এবং পরস্পরে অবর্গ ও বৈরীভাব পোষণ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে মিল-মোহাব্বত ও সৌহার্দ ভাব উঠিয়া গিয়াছে, তখন মনে করিবে যে, তাহারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার অস্থায়ী জীবন ক্রয় করিয়া লইয়াছে। আয় আল্লাহ! তুমি আপন মহিমা দ্বারা আমাদের উপর রহম কর।

অপরকে দেখিয়া আমলে উৎসাহিত হওয়া

অনেক সময় মানুষ হয়ত এমন কতক লোকের সঙ্গে রাত যাপন করার সুযোগ হয়, যাহারা হয়ত তাহাজ্জুদের সময় উঠিয়া নামাজ পড়ে বা তাহাদের কতক হয়ত সারা রাতই নামাজ পড়ে। কিংবা কেহ কেহ হয়ত রাতের সামান্য সময় নিদ্রা গ্রহণের পর অবশিষ্ট সময় পুরাপুরি নামাজে রত থাকে। এখন সকলকে এবাদত করিতে দেখিয়া এই ব্যক্তির মধ্যেও হয়ত আগ্রহ পয়দা হয় যে, আমিও তাহাদের মত এবাদত করিব। ইতিপূর্বে হয়ত তাহার রাত জাগরণের মোটেও অভ্যাস ছিল না। এখন অন্য মানুষের দেখাদেখি এই ব্যক্তিও

নিজের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া রাতের কিছু অংশ বা গোটা রাত নামাজ পড়িতে লাগিল। অনুরূপভাবে কোন সময় হয়ত রোজাদারদের সঙ্গে এক সাথে থাকার সুযোগ হইল এবং তাহাদের দেখাদেখি এই ব্যক্তিও রোজা রাখিতে শুরু করিল। অথচ এই রোজাদারদের সংস্রবে না আসিলে সে হয়ত কিছুতেই রোজা রাখিত না। সাধারণতঃ এই জাতীয় আমলের উপর রিয়ার হুকুম লাগানো হয় এবং বলা হয়– এই ধরনের আমল বর্জন করা ওয়াজিব। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ধরনের আমলকে পুরাপুরি রিয়া বলা যাইবে না। বরং ইহা একটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়।

প্রতিটি মুসলমানের অন্তরেই রোজা-নামাজ, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি এবাদতের প্রতি কিছু না কিছু আগ্রহ অবশ্যই থাকে। কিন্তু কোন প্রতিবন্ধকের কারণে হয়ত সেই আগ্রহ বাস্তবায়িত হইতে পারে না। যেমনঃ নফসানী খাহেশাতের প্রাবল্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততা কিংবা নিছক গাফলতের কারণেই হয়ত মনের সেই আগ্রহ পুরণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু কোন কোন সময় হয়ত অপর কাহাকেও এবাদত করিতে দেখিয়া মনের সেই গাফলত ভাব ও কর্মব্যস্ততা দূর হইয়া এবাদতের প্রতি আগ্রহী হইয়া উঠে।

মানুষ যখন নিজ বাড়ীতে অবস্থান করে, তখন যেই সমস্ত প্রতিবন্ধকের কারণে মন এবাদতের প্রতি আগ্রহী হয় না, সেইগুলির উদাহরণ– হয়ত নরম বিছানায় শুইয়া আরাম করিতেছে, বিবি-বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প-গুজবে বিনোদনরত, ব্যবসার হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত ইত্যাদি। কিন্তু মানুষ যখন প্রবাসে থাকে, তখন আর এইসব ব্যস্ততা ও প্রতিবন্ধক থাকে না। তখন হয়ত এমন কিছু উপাদান জুটিয়া যায় যে, উহার ফলে নেক আমলের প্রতি মনে আগ্রহ পয়দা হয়। যেমন সে হয়ত দেখিল, সঙ্গের লোকেরা গভীর মনোযোগের সহিত আল্লাহর এবাদত করিতেছে। এখন প্রবাসের এই নিরিবিলি সময়ে তাহার আশেপাশেও যেহেতু নফসের খাহেশাতে লিপ্ত হওয়ার বিশেষ কোন উপাদানও মওজুদ নাই; সুতরাং সঙ্গীদের এবাদত দেখিয়া তাহার মনেও এবাদতের প্রতি আগ্রহ পয়দা হওয়া স্বাভাবিক। বরং এই সময় সঙ্গের লোকেরা এবাদতে অগ্রগামী হইয়া গেলে নিজেকে সে হতভাগ্যই মনে করিবে। তো এই জাতীয় এবাদত রিয়ার কারণে হয় না। বরং এবাদতের প্রতি নির্ভেজাল আগ্রহ এবং দ্বীনী জযবার কারণেই হইয়া থাকে।

অনেক সময় মানুষ নূতন কোন জায়গায় গেলে ঘুম আসে না। তখন সে এই অবসরটিকে গনীমত মনে করিয়া এবাদতে নিমগ্ন হয়। নিজের বাড়ীতে হয়ত ঘুমের চাপের কারণে কিংবা অন্য কোন প্রতিবন্ধকের কারণে তাহাজ্জুদের পাবন্দি করা সম্ভব হয় না। অবশ্য বাড়ীতে থাকা অবস্থায় যদি কোন কোন সময়

তাহাজ্জুদ পড়িয়া লওয়া হয়, তবে হয়ত এইভাবেও উহার প্রতি আগ্রহ পয়দা হইয়া অপরাপর প্রতিবন্ধকগুলিও দূর হইয়া যাইতে পারে। অনুরূপভাবে বাড়ীতে থাকিয়া (নফল) রোজা রাখাও কষ্টকর হয়। কেননা, ঘরে বিবিধ প্রকার সুস্বাধু খাবারের আয়োজন থাকে– যাহা ত্যাগ করিয়া রোজা রাখিতে মন চাহে না। তবে বাড়ীতে যদি মামুলী ধরনের খাবার থাকে, তবে হয়ত রোজা রাখিতে বিশেষ কষ্ট হইবে না। সফরের হালাতে যেহেতু মানুষ বাড়ী ঘরের সহজলভ্য নেয়ামতসমূহ হইতে বঞ্চিত থাকে, এই কারণে তখন তাহার পক্ষে সহজে রোজা রাখা সম্ভব হয়। এই রোজাকে রিয়ার কারণে বলা হইবে না, বরং ইহা দ্বীনী জযবার কারণেই রাখা হইতেছে। কেননা, নফসের খাহেশাত হইল রোজার জন্য প্রতিবন্ধক। আর এই খাহেশাত দ্বীনী চেতনার উপর প্রবল থাকে। তো মানুষ যখন নফসের এই খাহেশাত হইতে মুক্ত থাকে তখন তাহার দ্বীনী চেতনাও প্রবল হয়।

এদিকে শয়তান কিন্তু এই সময়ও বসিয়া থাকে না। বরং এই সময় সে মানুষকে এই বলিয়া আমল হইতে ফিরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে যে, এইভাবে মানুষের দেখাদেখি আমল করিলে তাহা রিয়ার মধ্যেই গণ্য হইবে। তুমি যখন ঘরে একাকী থাকিতে তখন তো এইরূপ এবাদত করিতে না। কিন্তু এখন কেন করিতেছ? এখন মানুষকে দেখাইবার জন্যই এবাদত করিতেছ। সুতরাং তোমার এই এবাদত সুস্পষ্ট রিয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। অর্থাৎ শয়তান এইভাবেই মানুষকে কুপরামর্শ দিয়া কেবল তাহার নিয়মিত এবাদতের মধ্যেই সীমিত রাখিতে চেষ্টা করে এবং অতিরিক্ত কোন এবাদত করিলে উহাকে রিয়া সাব্যস্ত করিয়া উহা হইতে তাহাকে বিরত রাখার প্রয়াস চালায়।

আরেকটি অবস্থা হইল, মানুষ অনেক সময় অপর কাহাকেও এবাদত করিতে দেখিয়া তাহার নিন্দার ভয়ে এবং অলসতা ও গাফলতির অপবাদ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু অতিরিক্ত এবাদত করিতে চায়। বিশেষতঃ তাহার সম্পর্কে যদি এইরূপ পরিচিতি থাকে যে, "এই ব্যক্তি রাত জাগিয়া এবাদত করে" তবে তো সে কিছুতেই তাহার এই সুনাম ক্ষুণ্ন হইতে দিতে চাহিবে না। বরং উত্তরোত্তর নিজের এই সুনাম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছু অতিরিক্ত এবাদত অবশ্যই অব্যাহত রাখিবে। অথচ মানুষের চিরশত্রু শয়তান এই অবস্থায় মানুষকে নামাজের প্রতি উৎসাহিত করিয়া বলে যে, তুমি নামাজ পড়িতে থাক কেননা, তুমি প্রকৃত অর্থেই একজন মোখলেস বান্দা এবং রিয়া হইতে মুক্ত। তুমি তো কেবল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িতেছ। ইতিপূর্বে তুমি বিবিধ প্রতিবন্ধক ও কর্ম ব্যস্ততার কারণেই রাত জাগরণ করিতে পার নাই। এখন তোমার সেইসব ব্যস্ততা না থাকার কারণেই নামাজ পড়িতেছ। তোমার ইচ্ছা ইহা নহে যে, মানুষ যেন তোমাকে এবাদত করিতে

দেখিতে পায়। অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেই শয়তান মানুষকে এবাদত হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করিয়াছে এখন সেই শয়তানই তাহাকে এবাদতের প্রতি উৎসাহিত করিতেছে।

এখন এই ফায়সালা কেবল অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন আল্লাহওয়ালাগণই করিতে পারেন যে, এই অতিরিক্ত নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পড়া হইতেছে, না বান্দাকে দেখাইবার জন্য পড়া হইতেছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে উহার ফায়সালা করা সম্ভব নহে। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি নিশ্চিত ভাবে জানা যায় যে, রিয়ার কারণেই এই নামাজ পড়া হইতেছে, তবে অতিরিক্ত নামাজ না পড়াই ভাল। চাই তাহা এক রাকাতই হউক। কেননা, এবাদতের মাধ্যমে মানুষকে খুশী করা, আল্লাহর নাফরমানী বটে। পক্ষান্তরে অতিরিক্ত নামায যদি এই কারণে পড়া হয় যে, ইতিপূর্বে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে যেই প্রতিবন্ধক ছিল এখন তাহা দূর হইয়াছে কিংবা অপরকে এবাদত করিতে দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া বা নেক কাজে প্রতিযোগিতার জযবায় যদি এই নামাজ পড়া হয়– তবে অবশ্যই পড়িবে। এই শেষোক্ত অবস্থাটির লক্ষণ হইল– নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তুমি যদি এমন কোন জায়গা হইতে তাহাদিগকে দেখিতে, যেখান হইতে তাহারা তোমাকে দেখিতে পায় না– তখনো তুমি এই নামাজ পড়িতে কি-না। যদি সেই অবস্থায়ও নামাজের প্রতি মনের আগ্রহ দৃষ্ট হয়, তবে অবশ্যই নামাজ পড়িবে। কেননা, এই ক্ষেত্রে এখলাসের সহিত আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যেই নামাজ পড়া হইতেছে। পক্ষান্তরে এই অবস্থায় নামাজ পড়িতে যদি কষ্ট অনুভব হয়, তবে নামাজ বর্জন করিবে। কেননা, এই নামাজের উৎস হইল রিয়া। মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশেই এই নামাজ পড়া হইতেছে।

অনেক সময় জুমুআর দিন বেশ জাঁকজমকের সহিত মসজিদে যাওয়া হয়। অথচ অন্য কোন দিন এইভাবে মসজিদে যাওয়া হয় না। এখন জুমুআর দিন এইভাবে মসজিদে যাওয়া এই কারণেও হইতে পারে যে, উহার মাধ্যমে সে মানুষের প্রশংসা কুড়াইতে চাহে। কিংবা উহার কারণ ইহাও হইতে পারে যে, জুমুআর দিন মানুষ যেহেতু আগ্রহের সহিত দলে দলে মসজিদে যাইতেছে, আল্লাহর প্রতি মানুষের এই মনোযোগ দেখিয়া হয়ত তাহার মনের অলসতা দূর হইয়া তদস্থলে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ ও জযবা পয়দা হইল। আবার অনেক সময় এইরূপও হইতে পারে যে, মানুষের আগ্রহ দেখিয়া তাহার অন্তরেও দ্বীনী জযবা পয়দা হইল এবং উহার পাশাপাশি এই খাহেশও পয়দা হইল যে, মানুষ যেন মসজিদে যাইতে দেখিয়া তাহাকেও আবেদ ও জাহেদ মনে করে এবং তাহার প্রশংসা করে। এই ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, অন্তরে কোন্ অবস্থাটি প্রবল। যদি দ্বীনী জযবা প্রবল হয়, তবে নিছক এই কারণে আমল বর্জন করা যাইবে না যে, অন্তরে প্রশংসাপ্রীতিও বিদ্যমান। বরং এই ক্ষেত্রে নফসকে এইভাবে বুঝাইবে

যে, এবাদতের মাধ্যমে মানুষের প্রশংসা কুড়াইবার খাহেশ করা ভাল নহে। কেননা, উহার ফলে এবাদতের ছাওয়াব নষ্ট হইয়া যায়।

বর্ণিত ওয়াসওয়াসাসমূহের চিকিৎসা

উপরে নফসানী ও শয়তানী খাহেশাত সমূহের বিবরণ উল্লেখ করা হইল। এইসব অবস্থা হইতে আত্মরক্ষার উপায় হইল, এইরূপ ক্ষেত্রে নিজের চিন্তাকে বিপরীতমুখী করিয়া মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিবে যে, মানুষ যদি আমার বাতেনী নেফাক ও ত্রুটিসমূহ জানিতে পারে এবং আমার পিছনের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়, তবে তাহারা আমার উপর কি পরিমাণ ঘৃণা পোষণ করিবে? তো আমার বাস্তব অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়ার পর মানুষের নিকটই যদি আমি এতটা ঘৃণার পাত্রে পরিণত হই, তবে রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমার অবস্থা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? তিনি তো সর্বজ্ঞ এবং সকল কিছু জানেন ও বুঝেন। মানুষের এমন কোন গোপন অবস্থা নাই যাহা তিনি অবগত নহেন।

কথিত আছে যে, একবার হযরত জুন্নুন মিসরী (রহঃ) জিকিরের আওয়াজ শুনিয়া কম্পিত অবস্থায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এই সময় অপর এক ব্যক্তিও তাঁহার অনুকরণে দাঁড়াইয়া উঠিল। হযরত জুন্নুন মিসরী (রহঃ) লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন–

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ

অর্থঃ "যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাজে দণ্ডায়মান হন।"

(সূরা আশশোয়ারাঃ আয়াত ২১৮)

উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করায় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিলঃ হে শায়েখ! আল্লাহ পাক আপনার দণ্ডায়মানের অবস্থা এবং উহার কারণ সম্পর্কে অবগত। সুতরাং কি কারণে আপনি এইরূপ লৌকিকতা করিতেছেন? এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বসিয়া পড়িল।

এইসব হইল নেফাকপূর্ণ আমল। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) বর্ণিত হাদীস–

تعوذوا بالله من خشوع النفاق

অর্থঃ "নেফাকের খুশু ও বিনয় হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর।"

(বায়হাকী)

এই ধরনের অবস্থা হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা ও এস্তেগফার করা উচিৎ। কেননা, এইসব অবস্থা কখনো ভয়, গোনাহের স্মরণ এবং গোনাহের উপর অনুশোচনার কারণে হইয়া থাকে। আবার রিয়ার কারণেও হইয়া থাকে।

উপরে যেইসব ওয়াসওয়াসার কথা উল্লেখ করা হইল, মানুষের অন্তরে উহা প্রায় পাশাপাশি অবস্থান করে এবং একটির সঙ্গে অপরটির সাদৃশ্যতাও পরিদৃষ্ট হয়। এই কারণে যখনই তোমার অন্তরে কোন খেয়াল বা ওয়াসওয়াসা আসে, তখনই তুমি নিজের অন্তরের অবস্থা যাচাই করিয়া দেখিবে যে, এই খেয়াল বা ওয়াসওয়াসা কি কারণে এবং কোথা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। যদি আল্লাহর জন্য হইয়া থাকে, তবে হইতে দাও এবং সেই সঙ্গে অন্তরে ভয়ও পোষণ করিতে থাক। কেননা, মানবাত্মায় রিয়া এমনই সঙ্গোপনে আসিয়া আক্রমণ করে যে, অনেক সময় উহার উপস্থিতি অনুভবও করা যায় না। এমনও হইতে পারে যে, তুমি যেই আমলটি এখলাসের সহিত শুরু করিয়াছ, পরবর্তীতে উহাতে রিয়া আসিয়া যুক্ত হইল। সুতরাং এই কথা চিন্তা করিয়া অন্তরে সর্বদা ভয় পোষণ করিতে থাক যে, আল্লাহ পাক তোমার প্রতিটি কথা, কর্ম ও তোমার মনের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। সুতরাং তোমার আমলে যদি সামান্যতম রিয়ারও সংমিশ্রণ ঘটে তবে তোমাকে তাহার আজাবের শিকার হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে তুমি সেই ঘটনাটিকেও স্মরণে আনিতে পার যেই ঘটনায় হযরত আইউব (আঃ)-এর খেদমতে আগত তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, হে আইউব! আপনি কি ইহা জানেন না যে, বান্দার এমন আমল বাতিল হইয়া যাইবে যাহা দ্বারা সে আপন আত্মাকে প্রতারিত করিত? আর সে কেবল নিজের গোপন আমলেরই বিনিময় প্রাপ্ত হইবে।

জনৈক বুজুর্গ এইরূপ দোয়া করিতেনঃ আয় আল্লাহ! আমি এই বিষয় হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি যে, লোকেরা আমার ভয়ের অবস্থা অবগত হয় আর আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হন। হযরত আলী ইবনে হোসাইন এইরূপ দোয়া করিতেনঃ আয় আল্লাহ! আমি এই অবস্থা হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি যে, (১) মানুষের নজরে আমার বাহ্যিক অবস্থা উত্তম হয়, আর আপনার নিকট আমার বাতেনী অবস্থা মন্দ হয়। (২) আমি এমন সব আমলের হেফাজত করি, যাহা মানুষকে দেখাইবার জন্য করা হইয়াছে আর এমন সব আমল বরবাদ করিয়া দেই, যাহা আমার জন্য করা হইয়াছে। (৩) মানুষের জন্য আমার উত্তম আমল সমূহ জাহির করি, আর নিকৃষ্ট আমল সমূহ লইয়া আপনার খেদমতে হাজির হই। (৪) নেক আমল সমূহের মাধ্যমে মানুষের নৈকট্য প্রার্থনা করি এবং বদ আমল সমূহ লইয়া আপনার দরবারে হাজির হই। আর আমার উপর আপনার গজব নাজিল হয়। আয় আল্লাহ! আমাকে এইরূপ রিয়া ও মোনাফেকী আচরণ হইতে হেফাজত করুন।

উপরে বর্ণিত হযরত আইউব (আঃ)-এর খেদমতে আগত তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তি তাঁহাকে ইহাও বলিয়াছিল যে, হে আইউব! আপনি কি ইহা জানেন না যে, যেই সকল লোক তাহাদের প্রকাশ্য আমলের হেফাজত করে, আর গোপন

আমলকে বরবাদ করিয়া দেয়, তাহাদের চেহারা সেই কঠিন সময়ে মলিন হইয়া যাইবে যখন তাহারা আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হইবে।

উপরে রিয়ার অনিষ্ট এবং উহার বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। মানুষের উচিৎ রিয়ার যাবতীয় অনিষ্ট সম্পর্কে ওয়াকেফ হইয়া এই বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে– রিয়ার সত্তরটি দরজা আছে। তো এই সর্বনাশা রিয়া এমনই সূক্ষ্ম যে, অনেক সময় উহার উপস্থিতি অনুমানও করা যায় না। এমনকি রিয়ার চলন-পিপীলিকার চলন হইতেও নীরব ও গোপন। সুতরাং উহার উপস্থিতি টের পাইতে হইলে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। বরং আমরা তো বলি, কঠিন মোজাহাদা ও সর্বোচ্চ সতর্কতার পরও যদি উহার উপস্থিতি অনুভব করা যায় তবুও তাহা গনীমত বটে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এইসব বিপদ হইতে হেফাজত করুন।

এবাদতের আগে-পরে ও এবাদতের সময় মানুষের কর্তব্য

একজন মোমেনের অন্যতম কর্তব্য হইল, নিজের যাবতীয় এবাদতের ব্যাপারে কেবল আল্লাহ পাকের অবগতিতেই সন্তুষ্ট থাকা। বস্তুতঃ আল্লাহর অবগতিতে কেবল এমন ব্যক্তিগণই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, যাহারা আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজেদের সর্ববিধ কামনা-বাসনা কেবল আল্লাহর পক্ষ হইতেই পূরণ হইবে– এমন বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে যাহারা গায়রুল্লাহকে ভয় করে এবং তাহাদের পক্ষ হইতে পাওয়ার আশা করে, তাহারা অবশ্যই নিজেদের আমল মানুষকে দেখাইতে আগ্রহী হইবে। সুতরাং কেহ এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলে নিজের আকল ও ঈমানের সাহায্যে উহাকে খারাপ মনে করা উচিৎ। কেননা, উহার ফলে আল্লাহর অসন্তুষ্টির আশংকা রহিয়াছে। বিশেষতঃ কখনো যদি কোন কঠিন ও দুরূহ এবাদত সম্পন্ন করা হয়– যাহা সচরাচর মানুষের পক্ষে করা সম্ভব হয় না, তবে সেই ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতার সহিত আপন নফসের হেফাজত করিতে হইবে। কেননা, এইরূপ জবরদস্ত এবাদত সম্পন্ন করার পর নফস ইহা কামনা করিতেই পারে যে, আমার এই এবাদত সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা উচিত। কেননা, সে মনে করিবে, জনসাধারণ হয়ত আমার এই মহান এবাদত ও খোদাভীতির কথা জানিতে পারিলে ভক্তি-শ্রদ্ধায় তাহারা আমাকে সেজদা করিতে শুরু করিবে। সুতরাং আমার এই এবাদত গোপন রাখা ঠিক হইবে না। মানুষ যদি আমার এই এবাদতের কথা জানিতে না পারে, তবে কেমন করিয়া তাহারা আমার কদর বুঝিবে?

মোটকথা, এইসব ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতার সহিত মজবুত থাকিতে হইবে। আমলের মূল্য যথাস্থানে হইবেই। দুনিয়াতেও উহার মূল্য আছে। কিন্তু

পরকালে আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যেই নেয়মত পাওয়া যাইবে, উহার সহিত দুনিয়ার মূল্যের কোন তুলনাই হইতে পারে না। তদুপরি পরকালের প্রাপ্তি হইবে চিরস্থায়ী। একবার পাওয়ার পর উহা আর কখনো শেষ হইবে না। বরং উত্তরোত্তর উহা বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে। এদিকে আল্লাহ পাকের আজাব ও গজবও বড় কঠিন। যাহারা মানুষের নিকট এবাদতের বিনিময় প্রত্যাশা করিবে, তাহারা সেই আজাবের শিকার হইবে। মানুষের নিকট এবাদত প্রকাশ করিয়া যদি তুমি আত্মতৃপ্তি লাভ কর, তবে তোমার এই এবাদত বরবাদ হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ পাকের নিকট উহার কোন বিনিময় পাইবে না। মনকে এইভাবে বুঝাইবে যে, মহা মূল্যবান এবাদতের বিনিময়ে মানুষের তুচ্ছ প্রশংসা ক্রয় করা কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে? অথচ মানুষের হাতে এমন কোন ক্ষমতাও নাই যে, সে মানুষের রিজিক দিবে বা মানুষকে মারিয়া ফেলিবে। অর্থাৎ এই সমস্ত বিশ্বাস অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল করিয়া লইবে যেন মনে কখনো এইরূপ হতাশা আসিতে না পারে যে, আমাদের পক্ষে কি আর পরিপূর্ণ এখলাসের সহিত আমল করা সম্ভব ? ইহা হইল মনের হতাশা। অন্তরে কখনো এই ধরনের খেয়াল ও হতাশা পয়দা হইলে উহার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করিবে না এবং এইসব ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া কখনো এখলাস বর্জন করিবে না। বরং এইরূপ মনে করিবে যে, যাহারা মোত্তাকী ও খোদাভীরু তাহাদের তুলনায় যাহারা মোত্তাকী নহে, তাহাদের আমলেই এখলাসের প্রয়োজন বেশী। কারণ, পরহেজগারদের নফল আমল যদি বাতিলও হইয়া যায়, তবুও তাহাদের ফরজ আমল তো যথাস্থানে ঠিকই থাকিবে। কিন্তু যাহারা মোত্তাকী নহে, তাহাদের তো ফরজ আমলও ত্রুটিপূর্ণ হয়। তাহাদের এই ত্রুটি নফল আমল দ্বারা পূর্ণ করা হইবে। যদি নফল আমল সঠিক না হয়, তবে ফরজ আমল ত্রুটিপূর্ণই থাকিয়া যাইবে। এই কারণেই যাহারা মোত্তাকী নহে, তাহাদের আমলে এখলাসের প্রয়োজন বেশী।

নফল দ্বারা ফরজের ক্ষতিপূরণ

হযরত তামীম দারী হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

يحاسب العبد يوم القيامة - فان نقص فرضه قيل انظروا هل له من
تطوع اكمل به فرضه و ان لم يكن له تطوع اخذ بطرفيه فالقى في النار

অর্থঃ "কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের সময় যদি ফরজের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখা যায়, তবে হুকুম হইবে যে, তাহার কোন নফল আমল আছে কি-না দেখ। যদি কোন নফল আমল থাকে তবে উহা দ্বারা ফরজের ত্রুটি পূরণ করা হইবে। যদি কোন নফল আমল পাওয়া না যায়, তবে হাত-পা ধরিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।" (ইবনে মাজা)

ইহা দ্বারা জানা গেল, যাহাদের আমলে এখলাস ও রিয়ার মিশ্রণ থাকে, তাহাদের পক্ষেই অধিক আমলের প্রয়োজন হইবে, যেন নফল আমল দ্বারা তাহাদের ত্রুটিপূর্ণ ফরজ আমলের ক্ষতিপূরণ করা যায়। কেননা, এইসব লোকেরা কেয়ামতের দিন ত্রুটিপূর্ণ ফরজ আমল ও প্রচুর গোনাহ লইয়া হাজির হইবে। সুতরাং তাহাদের ফরজ আমলের ত্রুটির ক্ষতিপূরণ এবং গোনাহের কাফফারা নফল আমলের এখলাস ছাড়া সম্ভব নহে। পরহেজগার ও মোত্তাকীগণ নিজেদের পারলৌকিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও দরজা বুলন্দির জন্য এখলাসের উপর মেহনত করিবে। তাহাদের নিকট যদি নফল এবাদতের ভাণ্ডার নাও থাকে, তবুও তাহারা এই পরিমাণ কল্যাণ লইয়া হাজির হইবে যাহা তাহাদের গোনাহের তুলনায় বেশী হইবে এবং উহার ফলে তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। সুতরাং নফল এবাদতের নিরাপত্তা এবং উহা ছহী ও যথার্থ হওয়ার লক্ষ্যে অন্তরে সর্বদা এই ভয় পোষণ করিতে হইবে যেন এবাদতসমূহ আল্লাহ ব্যতীত অপর কেহ অবগত হইতে না পারে।

মোটকথা, আমল হইতে ফারেগ হওয়ার পরও এই চেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে যেন এই আমলের কথা অপর কেহ জানিতে না পারে। উহার উপায় হইল, আমল সম্পাদনের পর কাহারো সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা না করা। উহার পরও অন্তরে এই ভয় পোষণ করিবে যে, আমার অজান্তে এবং অতি সঙ্গোপনে আমার আমলে রিয়ার সংমিশ্রণ হইয়া গেল কি-না। মনে করিবে, এতসব সংশয়-সন্দেহ ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনার পর আমার আমল কবুল হইবে কি-না তাহা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। এমনও হইতে পারে যে, আল্লাহ পাক আমার মনের গোপন নিয়ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং উহার ফলেই তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আমার আমল প্রত্যাখ্যান করিয়া দিয়াছেন। এই ভয় ও সংশয়-সন্দেহ আমলের সময় ও আমলের পরে হওয়া উচিৎ– আমলের শুরুতে নহে। আমলের শুরুতে বরং নিজের এখলাস সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হইবে যে, আমি শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যেই আমল করিতেছি এবং এই আমলের পিছনে আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আমলের শুরুতে এখলাসপূর্ণ নিয়ত এই কারণে জরুরী যেন আমল সঠিক হয়। আমল শুরু হওয়ার পর যখন এই পরিমাণ সময় অতিবাহিত হইবে, যেই সময়ের মধ্যে কোনরূপ অসাবধানতা ও ভুল হওয়া সম্ভব, তখনই আশংকা করা সমীচীন হইবে যে, এই ফাকে আমার আমলে কোনরূপ রিয়া বা আত্মপ্রীতি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, যার ফলে হয়ত আমার আমল বাতিলও হইয়া যাইতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রেও ভয়ের তুলনায় এবাদত কবুল হওয়ার আশা

প্রবল হওয়া উচিৎ। কেননা, এবাদতের মধ্যে তো এখলাস অবশ্যই আছে। এখন রিয়ার কারণে উহা বাতিল হইয়া গিয়াছে কি-না এই বিষয়ে সন্দেহ। অর্থাৎ এবাদত বাতিল হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত নহে। সুতরাং নিশ্চিত বিষয়ে আশাবাদী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই আশাবাদের কারণেই এবাদত ও মোনাজাতে তৃপ্তি অনুভূত হয়। কেননা এখানে এখলাস নিশ্চিত এবং রিয়াতে সন্দেহ। এই সন্দেহের কারণে সৃষ্ট 'ভয়' সন্দেহযুক্ত বিষয়টির কাফ্ফারাও হইয়া যাইতে পারে।

মানুষের উপকার করা এবং মানুষকে দ্বীনের এলেম শিক্ষা দানের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও ছাওয়াবের আশা করা উচিৎ। কেননা, যেই ব্যক্তির উপকার করা হইবে, তাহার মনখুশী হইবে এবং সেই ব্যক্তিকে দ্বীনের এলেম শিক্ষা দেওয়া হইবে, সে ঐ শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করিবে। এইগুলি ছাওয়াবের কর্ম বটে। এখানে সতর্কতার বিষয় হইল এই উভয় ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর নৈকট্য ও ছাওয়াবের আশা করা উচিত। শিক্ষার্থী বা উপকৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা, প্রতিদান বা প্রশংসাপ্রাপ্তির আশা করা উচিৎ নহে। কেননা, এইরূপ করিলে আমলের ছাওয়াব বরবাদ হইয়া যাইবে।

শিক্ষার্থীদের দ্বারা কোন কাজ আদায় করা বা তাহাদের দ্বারা খেদমত করানো, মানুষকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে পথে তাহাদিগকে সঙ্গে রাখা কিংবা কোন প্রয়োজনে তাহাদিগকে কোথাও পাঠানো– ইত্যাদির অর্থ হইতেছে, সে যেন তাহার শ্রমের বিনিময় আদায় করিয়া লইয়াছে। এখন আর উহার ছাওয়াবের আশা করা নিরর্থক। অবশ্য উস্তাদ যদি শাগরিদের পক্ষ হইতে কোন কিছু প্রত্যাশা না করে এবং শাগরিদ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উস্তাদের খেদমত করে, তবে আশা করা যায়, ছহী নিয়তের কারণে উস্তাদ ছাওয়াব পাইবেন। তবে শর্ত হইল, শাগরিদের পক্ষ হইতে খেদমতের অপেক্ষায় না থাকা এবং সে যদি খেদমত না করে, তবুও তাহার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ না করা। কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ এইরূপ শর্তসাপেক্ষেও এই ধরনের খেদমত বর্জন করিয়া চলিতেন।

কথিত আছে যে, একবার জনৈক বুজুর্গ উস্তাদ পথ চলার সময় কেমন করিয়া এক কূপের ভিতর পড়িয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে আশ পাশের লোকেরা তাহাকে উদ্ধারের জন্য ছুটিয়া আসিয়া কূপের ভিতর রশি ফেলিল। কিন্তু কূপের ভিতর হইতে বিপন্ন বুজুর্গ সকলকে কসম দিয়া বলিলেন, যেই ব্যক্তি আমার নিকট পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করিয়াছে বা একটি হাদীসও শিক্ষা করিয়াছে, সে যেন এই রশি স্পর্শ না করে। অর্থাৎ তিনি আশংকা করিতেছিলেন, শাগরিদদের পক্ষ হইতে এই খেদমত গ্রহণের কারণে যেন শিক্ষাদানের ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইতে না হয়।

হযরত শাকীক বলখী বলেন, একবার আমি হযরত সুফিয়ান ছাওরীর খেদমতে একটি কাপড় হাদিয়া পেশ করিলাম। কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না। আমি আরজ করিলাম, হে আবু আব্দুল্লাহ! যাহারা আপনার নিকট হাদীস পাঠ করে আমি তো তাহাদের দলভুক্ত নহি। তবুও কী কারণে আপনি আমার হাদিয়া গ্রহণ করিতেছেন না? জবাবে তিনি বলিলেন, আমি জানি যে, তুমি আমার নিকট হাদীস পড় না, কিন্তু তোমার ভাই তো পড়ে। সুতরাং আমার আশংকা হইতেছে যে, এই হাদিয়ার কারণে হয়ত আমার মন তোমার ভাইয়ের প্রতি অন্যদের তুলনায় কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়িতে পারে।

একবার হযরত সুফিয়ান ছাওরীর খেদমতে এক ব্যক্তি একটি টাকার থলি লইয়া আসিল। লোকটির মরহুম পিতা ছিলেন হযরত সুফিয়ানের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তিনি মাঝে মধ্যে হযরত সুফিয়ানের নিকট আসা যাওয়া করিতেন। হযরত সুফিয়ান ছাওরী লোকটির পিতার খুব প্রশংসা করিলেন এবং তাহার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করিলেন। পরে লোকটি সেই টাকার থলেটি হযরত সুফিয়ানের খেদমতে পেশ করিয়া বলিল, এই টাকা আমি পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি এই টাকার কিছু অংশ আপনাকে হাদিয়া হিসাবে দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি ইহা গ্রহণ করুন এবং আপনার পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করুন। হযরত সুফিয়ান ছাওরী উপস্থিত ঐ হাদিয়া গ্রহণ করিলেন। কিন্তু লোকটি চলিয়া যাওয়ার পরই নিজের ছেলেকে পাঠাইয়া সেই লোকটিকে ডাকাইয়া আনাইয়া বলিলেন, ভাতিজা! তুমি এই থলিটি ফেরৎ লইয়া যাও। আমি কিছুতেই ইহা গ্রহণ করিতে পারিব না। কেননা, তোমার পিতার সঙ্গে আমার মোহাব্বত ছিল আল্লাহর ওয়াস্তে– যাহা একটি উত্তম আমল এবং উহার বিনিময়ে আমি ছাওয়াব প্রাপ্তির আশা করিতেছি। কিন্তু এই হাদিয়া গ্রহণের ফলে এমনও হইতে পারে যে, আমার অকৃত্রিম মোহাব্বতের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ জড়াইয়া পড়িবে এবং আমি ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইব।

হযরত সুফিয়ান ছাওরীর ছেলে মোবারক বলেন, লোকটি তাহার টাকার থলি লইয়া চলিয়া যাওয়ার পর আমি পিতার খেদমতে আরজ করিলাম, আপনি ঐ হাদিয়া ফিরাইয়া দিলেন কেন? ইচ্ছা করিলে তো আপনি উহা গ্রহণও করিতে পারিতেন। আপনার ঘরে ছেলেমেয়ে, পরিবার-পরিজন ও ভ্রাতাগণ আছে। তাহাদের প্রতি কি আপনার কোন দয়ামায়া নাই? জবাবে হযরত সুফিয়ান ছাওরী বলিলেন, বেটা মোবারক! তোমরা ভোগ করিবে আর আমি জবাবদিহি করিব, ইহা কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে? ইহা দ্বারা জানা গেল যে, কাহারো দ্বারা যদি অপর কেহ হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়, তবে আল্লাহ পাকের নিকটই উহার ছাওয়াব

প্রত্যাশা করা উচিৎ। একজন তালেবুল এলেমেরও কর্তব্য, কেবল আল্লাহ পাকের নিকটই ছাওয়াব ও মর্যাদা প্রার্থনা করা।

অনেক সময় তালেবুল এলেম হয়ত মনে করে, ভালভাবে আল্লাহর এবাদত করিলে উস্তাদের নেক নজর এবং তাঁহার ফয়েজ ও বরকত অধিক হাসিল হইবে এবং লেখাপড়ায়ও উন্নতি হইবে। এই ধারণা সঠিক নহে। বরং মানুষকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবাদত করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নিশ্চিত। পক্ষান্তরে এলেম হাসিল করিতে পারিলেই উপকৃত হওয়া নিশ্চিত নহে। অর্থাৎ উস্তাদ হইতে হাসিলকৃত এলেম দ্বারা যেমন উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তদ্রূপ উহা দ্বারা উপকৃত না হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। সুতরাং একটি সন্দেহযুক্ত উপকারের আশায় নিশ্চিত ক্ষতির শিকার হওয়া কখনো বুদ্ধিমানের কাজ হইতে পারে না। তো একজন তালেবুল এলেমের কর্তব্য হইল, আল্লাহর জন্য এলেম হাসিল করিবে এবং তাহার জন্যই এবাদত করিবে। উস্তাদের খেদমতও আল্লাহর ওয়াস্তেই করিবে। এই নিয়তে উস্তাদের খেদমত করিবে না যে, উহার ফলে তাঁহার সুদৃষ্টি হাসিল করা যাইবে। এবাদতের মাধ্যমে যদি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাসিল করিতে হয়, তবে নিয়তের পরিশুদ্ধি আবশ্যক।

বান্দাকে হুকুম করা হইয়াছে যেন আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো উদ্দেশ্যে এবাদত করা না হয়। অনুরূপভাবে পিতামাতার সেরা যত্নও এই নিয়তে করা ঠিক নহে যে, এই সেবাযত্নের মাধ্যমে তাঁহাদের সুদৃষ্টি অর্জন করা যাইবে। বরং উহাকে আল্লাহ পাকের নির্দেশ মনে করিয়াই করিতে হইবে। মনে করিবে– পিতামাতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত।

সংসার বিরাগী আবেদ ও সূফী-সাধকগণের কর্তব্য, প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ রাখা এবং এবাদত-বন্দেগী প্রশ্নে তাঁহার অবগতিতেই সন্তুষ্ট থাকা। এমন ধারণা করা ঠিক নহে যে, আমার এবাদত ও মোজাহাদা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকেও অবহিত করিতে হইবে যেন তাহারা আমাকে ইজ্জত করিতে পারে। এইরূপ ধারণাই অন্তরে রিয়ার বীজ বপন করিয়া দেয় এবং পরবর্তীতে উহা পত্র পল্লবিত হইয়া মানুষের আমলকে বরবাদ করিয়া দেয়। একজন আবেদ যখন জানিতে পারে যে, তাহার এবাদত-বন্দেগী ও তপস্যার কথা সাধারণ মানুষ জানিতে পারিয়াছে, তখন নির্জনে কঠিন এবাদত করিয়াও সে এক অনাবিল আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। এই পর্যায়ে তাহার মোজাহাদা ও সাধনার কষ্ট সহজ হইয়া যায়। অর্থাৎ এই পর্যায়ে সে এবাদত-বন্দেগী ও সাধনার সুকঠিন পর্যায়গুলি যে কেমন করিয়া অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা সে অনুভবই করিতে পারে না।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম বলেন, আমি মা'রেফাত শিক্ষা করিয়াছি

জনৈক রাহেবের নিকট হইতে। এই রাহেব বা খৃষ্টধর্মযাজকের নাম ছিল সুমআন। এক দিন আমি সেই রাহেবের এবাদতখানায় গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এখানে কতদিন যাবৎ অবস্থান করিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি ক্রমাগত সত্তর বৎসর যাবৎ এখানে অবস্থান করিতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি খাবার হিসাবে কি গ্রহণ করেন? এই প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব না দিয়া তিনি পাল্টা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উদ্দেশ্যে আমাকে এইসব প্রশ্ন করিতেছ? আমি বলিলাম, নিছক কৌতুহলের কারণেই আমি প্রশ্ন করিতেছি। আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। এইবার তিনি বলিলেন, তবে শোন, আমি বিগত সত্তর বৎসর যাবৎ প্রতি দিন কেবল একটি ছোলাবুট খাইয়া দিন গুজরান করিতেছি। প্রতি রাতে শয়নকালে এই একটি মাত্র বুট ছাড়া খাবার হিসাবে আমি আর কিছুই গ্রহণ করি না। হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম বলেন, বৃদ্ধ রাহেবের কথা শুনিয়া আমি অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এমন কি লাভবান হইয়াছেন যে, উহার বিনিময়ে সারা দিন মাত্র একটি ছোলাবুট খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন? জবাবে তিনি বলিলেন, আমার এই এবাদতখানার আশেপাশে যাহারা বসবাস করে, তাহারা বৎসরে একবার এখানে আসিয়া আমার এবাদতখানাকে সাজাইয়া গুছাইয়া পরিপাটি করিয়া দিয়া যায় এবং তাহারা আমাকে অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। এবাদত করিতে করিতে যদি আমার মনে কখনো কোন অলসতা আসে, তখন বৎসরের ঐ একদিনের ইজ্জত ও সংবর্ধনার কথা স্মরণ করিতেই আমার সারা বৎসরের কষ্ট প্রশমিত হইয়া আনন্দে ভরিয়া যায়। অতঃপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে একত্ববাদে বিশ্বাসী! (তুমি আমার পথ অনুসরণ করিও না) তুমি বরং এক মুহূর্তের মেহনতের মাধ্যমে অনন্ত জীবনের সুখ ও ইজ্জত হাসিল কর।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম বলেন, রাহেবের উপরোক্ত নসীহত আমার জন্য এলেম ও মা'রেফাতের দরজা খুলিয়া দিয়াছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি এতটুকুই জিজ্ঞাসা করিবার ছিল, না আরো কিছু জানিতে চাও? আমি বলিলাম, আপনি যদি আরো কিছু বলেন, তবে আমি উপকৃত হইব। তিনি বলিলেন, আমার সঙ্গে এই এবাদতখানার নীচের কক্ষে চল। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে গিয়া তিনি বিশটি ছোলা বুটের একটি পুরিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এইগুলি লইয়া তুমি উপরে যাও, সেখানে কৌতুহলী জনতা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রাহেবের কথা মত আমি উপরে ফিরিয়া আসিলাম। আমাকে দেখিয়াই সকলে জিজ্ঞাসা করিল, রাহেব তোমাকে কি দিয়াছে? আমি বলিলাম, তিনি নিয়মিত যেই খাদ্য গ্রহণ করেন তাহা আমাকে দান করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তাহারা পূর্বাধিক

ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া বলিল, আমরা রাহেবের প্রতিবেশী এবং তাঁহার একান্ত ভক্ত। সুতরাং আমরাই উহার অধিক হকদার। তুমি উহা আমাদিগকে দিয়া দাও। আমি বলিলাম– না, এমনি দিব না, আমি উহা বিক্রি করিব। তাহারা উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে আমি বিশ দিনার চাহিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বিশ দিনার দিয়া আমার নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়া লইল। অতঃপর আমি সেই বিশ দিনার লইয়া বৃদ্ধ রাহেবের নিকট ফিরিয়া গেলে ঘটনা শুনিয়া তিনি বলিলেন, তুমি বিশ দিনার চাহিয়া ঠকিয়াছ। তুমি যদি বিশ হাজার দিনার দাবী করিতে, তবে তাহারা উহাই দিতে সম্মত হইত। হে একত্ববাদে বিশ্বাসী! ইহা সেই ব্যক্তির ইজ্জত, যে আল্লাহর এবাদত করে না; আর যেই ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহর এবাদত করে তাহার ইজ্জত ও সম্মান কি হইতে পারে তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তুমি তোমার রবের এবাদত করিতে থাক এবং এদিক সেদিক আনাগোনা করিও না।

উপরোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইল, মানুষ যখন নিজের সম্মান ও খ্যাতির কথা জানিতে পারে, তখন নির্জনে মোজাহাদার শত কষ্টের ভিতরও এক প্রকার আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। আবার ক্ষেত্র বিশেষ এই খ্যাতির কথা সে অজ্ঞাত থাকে। যাহাই হউক, এইরূপ অবস্থা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে। উহা হইতে নিরাপদ থাকার আলামত হইল, এবাদতের সময় আবেদের নজরে মানুষ ও জীব-জানোয়ার সমান হওয়া এবং কোন কারণে যদি মানুষ তাহার প্রতি বীত শ্রদ্ধ হইয়া পড়ে তবে বিরক্তবোধ না করা। মনে সামান্য বিরক্তির উদ্রেক হইলেও নিজের বিবেক ও ঈমানের সাহায্যে উহাকে দমন করিতে হইবে। এমতাবস্থায় নিজেকে এইভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যেন মানুষ দেখিতে পাইলেই এবাদত ও সাধনায় নিবিষ্টতা বৃদ্ধি না পায় এবং মানুষের অবগতির কারণে মনে আনন্দও না আসে। যদি সামান্য আনন্দও অনুভূত হয়, তবে মনে করিতে হইবে, ইহা মনের দুর্বলতার লক্ষণ। এই ক্ষেত্রে যদি ঈমান ও আকলের সাহায্যে এই অনিষ্টকে দমন করার চেষ্টা করা হয়, তবে আশা করা যায় এই চেষ্টা বৃথা যাইবে না।

মানুষ যখন আবেদকে দেখিতে পায় তখন এবাদতে অধিক নিমগ্ন হওয়া এবং ক্রমাগত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এবাদত করিতে থাকা যেন মানুষ বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যায়– এই পন্থা উত্তম ও গ্রহণীয় হইতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু শয়তান বসিয়া থাকিবে না। বরং সে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করিবেই। অনেক সময় এবাদতে খুশু-খুজু ও নিমগ্নতা প্রকাশ করার ইচ্ছা মনে গোপন থাকে। অথচ এই সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এইরূপ বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করে যে, মানুষের সঙ্গে অধিক মিলামিশা আমার পছন্দ নহে এবং এই কারণেই আমি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এবাদতে নিমগ্ন থাকিয়া মানুষের সংশ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিতেছি।

অর্থাৎ বিলম্বের কারণে যেন লোকেরা বিরক্ত হইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার এই দাবী সত্য নহে। এই দাবীর সত্যতা এইভাবে যাচাই করা যাইতে পারে যে, মানুষের সঙ্গ হইতে পরিত্রাণের জন্য সে এবাদতের এই নিমগ্নতাকেই মাধ্যম বানাইল কেন? উহার জন্য তো এই উপায়ও অবলম্বন করা যাইত যে, সে হয়ত খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল বা মানুষের সম্মুখে গোগ্রাসে আহার করিতে লাগিল কিংবা অসঙ্গত ভঙ্গিমায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এইসব আচরণ দেখিয়াও তো মানুষ বীত শ্রদ্ধ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিবে। সে এইসব পন্থা গ্রহণ করিল না কেন? অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যদি এবাদতে খুশু-খুজু জাহির করার পন্থা বর্জন করিয়া শেষোক্ত পন্থা সমূহ মানিয়া লয় তবে মনে করা যাইবে যে, সে তাহার দাবীতে সত্য এবং এবাদতে নিমগ্নতা প্রমাণের ক্ষেত্রে তাহার লোক দেখানো উদ্দেশ্য নাই। পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তি যদি মানুষের আনাগোনা ও সমাগম দূর করার জন্য দীর্ঘ এবাদতে নিমগ্ন থাকার পদ্ধতির উপরই অধিক জোর দেয় তবে ইহা মনে করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না যে, মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা কুড়ানোই তাহার আসল উদ্দেশ্য। এই অবস্থা হইতে কেবল সেই ব্যক্তিই নিরাপদ থাকিতে পারে যেই ব্যক্তি অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া লইয়াছে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত অপর কাহারো অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই এবং এইরূপ চিন্তা করিয়া যদি এবাদত করে যে, ভূপৃষ্ঠে কেবল আমিই এবাদত করিতেছি এবং আমাকে দেখার মত দুনিয়াতে দ্বিতীয় কোন মানুষ নাই। এইরূপ ব্যক্তির অন্তরে প্রথমতঃ মাখলুকের কোন ধারণাই পয়দা হইবে না এবং হইলেও উহা হইবে নেহায়েতই দুর্বল যাহা দূর করা কষ্টকর হইবে না।

উপরোক্ত অবস্থাটির লক্ষণ হইল– মনে কর, এক ব্যক্তির দুইজন বন্ধু আছে। একজন বিত্তবান এবং অপরজন গরীব। এখন তাহার ঘরে যদি বিত্তবান বন্ধুটি আগমন করে, তবে সে যেন গরীব বন্ধুটির আগমনের তুলনায় অধিক আনন্দিত না হয়। অবশ্য বিত্তবান বন্ধুটির মধ্যে যদি অতিরিক্ত কোন বৈশিষ্ট্য থাকে তবে তাহা ভিন্ন কথা। যেমন তিনি হয়ত ভাল আলেম বা মোত্তাকী ইত্যাদি। এই হিসাবে যদি গরীব বন্ধুর তুলনায় বিত্তবান বন্ধুকে অধিক ইজ্জত করা হয়, তবে এই ইজ্জত হইবে অর্থবিত্তের কারণে নহে; বরং এলেম ও তাকওয়ার কারণে। যেই ব্যক্তি বিত্তবান মানুষকে দেখিয়া অধিক খুশী হয়, সেই ব্যক্তি রিয়াকার বা অর্থ-লোভী। কেননা, সে যদি রিয়াকার ও লোভী না হইত তবে গরীব মানুষকে দেখিয়াই অধিক খুশী হইত। কারণ, গরীব ও নিরন্ন মানুষকে দেখিলে পরকালের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং গরিবী হালাত ও দৈন্য দশার প্রতি মোহাব্বত পয়দা হয়। পক্ষান্তরে মালদার ও বিত্তবানদিগকে দেখিলে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ এবং অর্থবিত্তের প্রতি মোহাব্বত পয়দা হয়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর মজলিসে দুনিয়াদার ও

বিত্তবানদিগকে নেহায়েত অবহেলার নজরে দেখা হইত। তাঁহার মজলিসে বিত্তবানদের বসিবার স্থান ছিল সকলের পিছনে এবং গরীবদের আসন ছিল সকলের সামনে। তিনি নিজেও এইরূপ বলিতেন, হায়! আমিও যদি গরীবদের দলভুক্ত হইতাম।

অবশ্য কোন মালদার ও বিত্তবান ব্যক্তি যদি তোমার নিকটাত্মীয় হয় বা তাহার সঙ্গে যদি তোমার কোন ঘনিষ্ঠতা থাকে কিংবা তোমার উপর যদি তাহার কোন হক থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রে তাহাকে অতিরিক্ত ইজ্জত করাতে কোন দোষ নাই। তবে শর্ত হইল, কোন গরীব ব্যক্তির সঙ্গেও যদি তোমার এই জাতীয় সম্পর্ক থাকে তবে তাহাকেও অনুরূপ ইজ্জত-একরাম করিতে হইবে। কেননা, আল্লাহ পাকের দরবারে তো গরীব-মিসকীনদের সম্মানই বেশী। এখন তুমি যদি কোন মালদারকে বেশী ইজ্জত কর, তবে উহার অর্থ দাঁড়াবে, তুমি তাহার সম্পদের প্রতি লালায়িত হইয়া তাহার সঙ্গে রিয়াসুলভ আচরণ করিতেছ।

এদিকে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে যদি কোন ভেদাভেদ না করিয়া তাহাদিগকে একই সঙ্গে বসিতে দাও, তবে এই ক্ষেত্রে এইরূপ আশংকা রহিয়াছে যে, তুমি গরীবদের তুলনায় ধনীদের সম্মুখে হেকমত ও বিনয় অধিক প্রকাশ করিবে। ইহা গোপন রিয়া কিংবা গোপন লোভের পরিণতি। যেমন হযরত ইবনে ছাম্মাক (রহঃ) তাহার বাঁদীকে বলিয়াছিলেন, "ইহার কারণ কি তাহা আমি বলিতে পারিব না যে, আমি যখন বাগদাদ আসি, তখন আমার জ্ঞান ও হেকমতের দরজা খুলিয়া যায় এবং আমি আনর্গল হেকমতের কথা বলিতে পারি।" হযরত ইবনে ছাম্মাকের এই কথা শুনিয়া তাহার বাঁদী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, লোভের কারণেই তখন আপনার জবান তেজ হইয়া যায়। বাঁদীর এই উক্তি ছিল যথার্থ। অর্থাৎ ইহা একটি বাস্তব সত্য যে, ধনী লোকদের সম্মুখে মুখের গতি যতটা সচল হয় এবং তাহাদের সম্মুখে যেই পরিমাণ বিনয় প্রকাশ করা হয়, সেই তুলনায় গরীবদের সামনে কিছুই করা হয় না।

রিয়া প্রসঙ্গে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও প্রতারণা এত অধিক ও ব্যাপক যে, লিখিয়া উহার বিবরণ শেষ করিবার মত নহে। উহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার একমাত্র উপায় হইল, অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত আর যাহা কিছু আছে সব বাহির করিয়া দেওয়া এবং সারা জীবন নফসের বিপদ ও বিপর্যয়ের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকা। স্মরণ রাখিও, নফসের খাহেশাত দ্রুত নিঃশেষ হইয়া যাইবে। সুতরাং এই ক্ষণস্থায়ী খাহেশাতের জন্য নিজেকে কঠিন আজাবে নিপতিত করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। তোমার পক্ষে সঠিক ও সুস্থ জীবন যাপনের উপমা যেন এইরূপ- মনে কর, এক বাদশাহ শারীরিকভাবে অসুস্থ। জীবনের সমস্ত খাহেশাত ও কামনা-বাসনা তাহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে এবং

সেইসব চাহিদা পূরণ করার উপায়-উপকরণও তাহার হাতের কাছেই মওজুদ। কিন্তু বাদশাহ এমনই এক ব্যাধিতে আক্রান্ত যে, তিনি যদি নিষিদ্ধ খাবার ও মনের চাহিদা পূরণে এক কদমও অগ্রসর হন, তবে তাহার স্বাস্থ্যের চরম ক্ষতিসাধন কিংবা তাহার জীবন বিপন্ন হওয়ারও ঝুঁকি রহিয়াছে। তিনি ইহাও জানেন, যদি চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সকল বিষয়ে পরহেজ করিয়া চলা হয়, তবে জীবনও রক্ষা পাইবে এবং রাজত্বও বহাল থাকিবে। এই কারণেই তিনি চিকিৎসকের কথা মানিয়া চলেন এবং নিয়মিত তিক্ত ঔষধ সেবন করেন। চিকিৎসকের ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বল্প আহারের ফলে যদিও তাহার দেহটি দুর্বল হইয়া পড়িতেছে কিন্তু এই নিয়ম পালন ও ঔষধ সেবনের ফলে তিনি আক্রান্ত ব্যাধি হইতেও মুক্তিও পাইতেছেন। এই পর্যায়ে যদি কোন নিষিদ্ধ খাবার খাইতে ইচ্ছা হয় তখন যেন তাহার ব্যাধিসমূহ মূর্তিমান হইয়া তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে- যার পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু। এই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার যাবতীয় ধন-সম্পদ ও রাজত্বও শেষ হইয়া যাইবে। আর তাহার এই পরিণতি দেখিয়া শত্রুগণ যারপর নাই আনন্দিত হইবে। মোটকথা, এই ব্যক্তির নিকট যখনই তিক্ত ঔষধ সেবন কষ্টকর বলিয়া মনে হইবে, তখনই সে ঐ সুস্থ জীবনের কথা স্মরণ করিবে যাহা এই ঔষধ সেবনের মাধ্যমে হাসিল হইবে।

যেই মোমেন বান্দা পরকালের অন্তহীন সুখের জীবন কামনা করে, সে এমন প্রতিটি বিষয়ই পরহেজ করিয়া চলিবে যাহা পারলৌকিক জীবনের জন্য বরবাদীর কারণ হইতে পারে। অর্থাৎ, মোমেন ব্যক্তি পার্থিব জীবনের এমনসব আনন্দ ও সুখ-সম্ভোগ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে যাহা পারলৌকিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে। অতঃপর কেবল সেই যৎসামান্য অবস্থার উপরই তুষ্ট থাকিবে যাহা তাহার জন্য হালাল করা হইয়াছে। শীর্ণ দেহ ও শারীরিক দুর্বলতা, পেরেশানী, ভয় এবং মানুষের সংশ্রব হইতে বিচ্ছিন্নতাকে সে এই কারণে পছন্দ করিবে যে, উহার বিপরীতে মানুষের সঙ্গে মিলামিশা করিয়া আনন্দ-ফুর্তিতে লিপ্ত হইলে আল্লাহর গজবের শিকার হইতে হইবে। এই কারণে সে দুনিয়ার যাবতীয় আনন্দ ও স্বাদ-সম্ভোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আখেরাতের মুক্তি কামনা করিবে। মোমেনের অন্তরের এই ভয় ও আশাই তাহাকে পার্থিব সুখ হইতে বিরত থাকার শক্তি যোগায়। কেননা, মোমেন বান্দার অন্তরে শেষ পরিণতির একীন বদ্ধমূল এবং সে মনে করে মানুষের চিরস্থায়ী সুখ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যেই নিহিত। সে ইহাও জানে যে, আল্লাহ পাক পরম করুণাময় ও মেহেরবান। যেই বান্দা তাঁহার মর্জি অনুযায়ী জীবন যাপন করিবে, তাহাকে তিনি সাহায্য করিবেন এবং তাহার সঙ্গে অনুগ্রহ ও দয়াসুলভ আচরণ করিবেন। তিনি ইচ্ছা করিলে মানুষকে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট হইতে নিরাপদও রাখিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আপন হেকমত ও ইনসাফ দ্বারা মানুষের ইচ্ছা ও

সততার পরীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহেন

মানুষ যখন আল্লাহ পাকের রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে মেহনত-মোশাক্কাত ও সাধনার পথ বাছিয়া লয়, তখন সে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে পরিপূর্ণ সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই পর্যায়ে সর্ব প্রকার দুঃখ-কষ্ট তাহার নিকট সহজ মনে হয় এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে সে সবর করার শক্তি প্রাপ্ত হয়। আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদত-বন্দেগী তাহার নিকট একটি প্রিয় আমলে পরিণত হয়। এমন কি এবাদত বন্দেগী ও মোনাজাতের মধ্যে সে এমন এক অনাবিল আত্মসুখ অনুভব করে যে, উহার মোকাবেলায় দুনিয়ার যাবতীয় সুখ-সম্ভোগ তাহার নিকট একেবারেই তুচ্ছ মনে হয়। মহান করুণাময় আল্লাহ পাক তাঁহার প্রিয় বান্দার কোন মেহনতই বৃথা যাইতে দেন না এবং কোন প্রার্থীকেই তিনি খালী হাতে ফিরাইয়া দেন না। বরং তিনি তো বলেন, আমার দিকে যে এক বিঘত আগাইয়া আসিবে আমি তাহার দিকে এক হাত আগাইয়া যাইব। নেক লোকেরা আল্লাহ পাকের সাক্ষাতের জন্য যেই পরিমাণ আগ্রহী হয়, আল্লাহ পাক তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তদাপেক্ষা অধিক আগ্রহী হন। প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ তাহাদের মেহনত মোশাক্কাত এবং এখলাস ও সততার পরিচয় দিবে; অতঃপর তাহারা দেখিতে পাইবে, মহান করুনাময় আল্লাহ পাক তাহাদের সঙ্গে কতটা সদয় আচরণ করেন।

এখন আমি এই প্রসঙ্গটি শেষ করিতেছি। দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

।। **আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে সমাপ্ত** ।।